উপদেশনা
দেবীপদ ভট্টাচার্য
সম্পাদনা
শিশির মজুমদার

এস, ব্যানার্জী এণ্ড কোং
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক। এস, ব্যানার্জী
এস, ব্যানার্জী এণ্ড কোং
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলাকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক। মণীন্দ্রমোহন বসাক
সারদা প্রেস
১০ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই করেছেন
এম, শর্মা বুক বাইণ্ডার্স
৪০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ। প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রকাশ। ৩১ ভাদ্র ১৩৬৭, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

মূল্য। ৩০·০০

প্রকাশকের নিবেদন
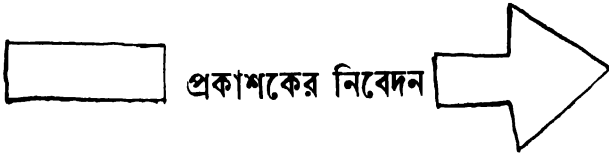
একই সূত্রে গাঁথা বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের ফুলের সমাহার।

লেখক সুধীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ঐ ফুল হইতে পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে সুস্বাদু ফলে—এই **উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র**।

ফলের নানা স্বাদ, রং এবং আকার। পছন্দও যার যার অভিরুচি অনুযায়ী—তাই বিচারভার দিলাম সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর।

এই ফুল আহরণ করিতে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন প্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীশিশির মজুমদার, তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া আর ঋণ-মুক্ত হইতে চাইনা।

সর্বোপরি যে উৎসাহ এবং পরামর্শ পাইয়াছি শ্রদ্ধেয় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মহোদয়ের নিকট তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
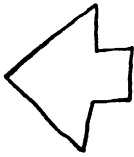
সংকলন প্রসঙ্গে কিছু কথা

'উত্তরকাল ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি শরৎচন্দ্রের ১০৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হলো বটে কিন্তু এই গ্রন্থের মূল পরিকল্পনা আজ থেকে ছ'বছর আগে—শরৎ জন্মশতবার্ষিকী সময়ে। বলাই বাহুল্য, তখন কলকাতাসহ ভারতবর্ষের নানা শহরে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। নানা পত্র-পত্রিকায় এবং সংকলিত গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের পুনর্মূল্যায়ন বিশেষভাবে নজরে পড়েছে। সে সময়ে ছাপা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার শরৎ-রচনাবলীর নূতন সংস্করণ। বস্তুতঃ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর পরে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এমন উত্তাল ঢেউ আর দেখা যায়নি। তখন দমবন্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে আচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক মানস শরৎ শতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল হয়তো।

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায়ও সে সময়ে শরৎ-শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলাও পিছিয়ে ছিল না। সেই জেলার উৎসব কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি আলোচনাচক্র—সাম্প্রতিককাল ও শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার।

বস্তুত এই সংকলনের উৎস ওই আলোচনাচক্র। এই বিষয় ও আলোচক নির্বাচনে সেদিন যিনি পশ্চিম দিনাজপুর শরৎ-শতবার্ষিকী সমিতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য, বর্তমান সংকলনের রচনা ও লেখক নির্বাচন তাঁরই উপদেশনায় পরিকল্পিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সংকলনে মন্মথ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল রায়, মানিক মুখোপাধ্যায়, ও ডঃ শুভংকর চক্রবর্তীর প্রবন্ধ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শরৎ শতবার্ষিকী সমিতি আয়োজিত আলোচনাচক্র উপলক্ষে লিখিত। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য-এর নিবন্ধ যুগান্তর পত্রিকায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, তপন সিংহ ও নবনীতা দেবসেনের নিবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সংকলনভুক্ত রচনাটি তাঁর 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ স্মরণীয়। গোপাল হালদারের নিবন্ধটি তাঁর 'বাংলা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি' গ্রন্থটি থেকে গৃহীত। এই নিবন্ধটি আজ থেকে ৩৭ বছর আগে লিখিত হলেও এখনও এর মূল্য অম্লান। 'শরৎ সম্পুট ' সংকলন গ্রন্থ থেকে ডঃ নির্মল দাশের নিবন্ধটি গৃহীত হলেও বর্তমান সংকলনে এর অনেকাংশ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। তারাপদ লাহিড়ী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী এবং তরুণ অধ্যাপক ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যাযের প্রবন্ধ এই সংকলনের জন্যই বিশেষভাবে লেখা।

এতদসত্ত্বেও একথা দীনতার সঙ্গে স্বীকার্য যে শরৎ-উত্তরকালীন পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন এই সংকলনে সম্ভব হয়নি। তবুও এই পরিকল্পনা একটি শুভ সূচনা বলে মনে করি। আমি সর্বোপরি শ্রদ্ধাবনত ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের কাছে। তাঁরই জন্য আমি এমন একটি গ্রন্থ সংকলন সম্পাদনার সুযোগ পেযে ধন্য। আজ থেকে ছ' বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ থাকাকালীন যেমন পরামর্শ তাঁর কাছে পেযেছি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়ভার থাকা সত্ত্বেও এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যাপারেও তেমনি উপদেশ লাভে আমি বাধিত। আমি কৃতজ্ঞ এই সংকলনের সুধী লেখকদের কাছে। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

শরৎচন্দ্রের ১০৬তম জন্মদিনে এই গ্রন্থটি প্রকাশের পুণ্য ও গুরুদায়িত্ব যিনি বহন করেছেন, বলাই বাহুল্য, তিনি প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় প্রকাশক সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমার নমস্কার জানাই। তাঁর পুত্র বন্ধুবর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই গ্রন্থ প্রকাশনায়-ও আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। সুমুদ্রণী, সারদা প্রেস ও জাগরণী প্রেসের সকল কর্মচারীবৃন্দকেও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই—তাঁরা সকলেই এই গ্রন্থ-মুদ্রণ বিষযে পরিশ্রম করেছেন। ইম্প্রেসন হাউসের রবিধন দত্তকেও ধন্যবাদ জানাই অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ছেপে দেওয়ার জন্য। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের জন্য বন্ধুবর প্রণবেশ মাইতিকে প্রসঙ্গতঃ ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়াও অনেকের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি যা এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা গেল না বলে দুঃখিত।

শরৎ-উত্তরকালের পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হলে, বুঝব আমার শ্রম সার্থক।

শিশির মজুমদার

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র ঐতিহ্য ও উত্তরকাল

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন একজন লেখক যাঁকে প্রথম দর্শনেই বাঙালী পাঠক ভালোবেসেছিল এবং সে ভালোবাসা অদ্যাবধি স্তিমিত হয়নি ; বরং তা বর্ধিত হয়েছে। শুধু বাঙালী পাঠক বললে ঠিক বলা হয় না, কেননা ভারতবর্ষের সব কটি প্রধান ভাষায় তাঁর উপন্যাস অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ সৌভাগ্য অন্য কোনো ভারতীয় কথাসাহিত্যিকের লাভ হয়নি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যাঁরা উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই অকুণ্ঠস্বরে স্বীকার করেছেন শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁদের অপরিশোধ্য ঋণ। শরৎচন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ঔপন্যাসিকের সম্পর্কে এই মন্তব্য খাটে না।

শরৎচন্দ্র একজন খাঁটি বাঙালী লেখক এবং তাঁর লেখক জীবন প্রকৃতপক্ষে পঁচিশ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২-১৩ সালে। তার আগে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ সালে। গল্পগুলি বের হবার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আসন পাতা হয়ে গেল বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে। শরৎচন্দ্রের আগমন আকস্মিক কিন্তু বিজয়ীর বেশে। শুধু সাহিত্যসেবার দ্বারা জীবনে যশ ও অর্থ তিনিই প্রথম লাভ করেন—একথা তিনি নিজেই ঘোষণা করে গেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র কিসের জোরে জিতে নিলেন অগণিত পাঠক-হৃদয়? তাঁর নিজের ব্যক্তি-জীবনের পরিপার্শ্বের অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল। তাঁর জীবনের বঙ্কিম পথযাত্রায় ডোম বেদে সাপুড়ে চাষী সন্ন্যাসী কুলত্যাগিনী নারী—সবাই এসেছে। এত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল সমকালীন কোনো বাঙালী শিল্পী জীবনের ঝাঁপিতে তুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন 'অভিজ্ঞতা ব্যতীত সৃষ্টি নাই'। এই

অভিজ্ঞতা অবশ্যই শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনগত। শরৎচন্দ্র নিজের ভবঘুরে জীবনে গাঢ় অন্ধকারের খনিতেও নেমেছেন, সহসা-লব্ধ হীরকখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে ঝুলিতে পুরেছেন।

শিল্পীর এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রধানত চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদি প্রাণ পায় এবং পাঠক তাকে সাগ্রহে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু নদীতে নেমে অবগাহন না করলে পূর্ণ তৃপ্তি নেই। শরৎচন্দ্র ডুব দিয়েছিলেন বাঙালী সমাজের নরনারীর স্বচ্ছ ও পঙ্কিল জীবন-তটিনীতে, ভরেছিলেন নিজের শিল্পীমনের ঘট। এত সাদা-কালো মেশানো অভিজ্ঞতা তাঁর সময়ে অন্য কোনো ঔপন্যাসিকের জীবনে ছিল না।

এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল শরৎচন্দ্রের উদার সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী দীনবন্ধুর সর্বব্যাপী সহানুভূতির উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি, দুটিই মিলেছিল। স্বভাবধর্মে তিনি ছিলেন ভাবপ্রবণ পরদুঃখকাতর। এইজন্য হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতোৎসারিত এই সহানুভূতি, এই সম্প্রীতি কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে নেই। তাঁর বহু সকরুণ দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো রয়েছে। মানুষের প্রতি—বিশেষ করে দুঃখকষ্ট-লাঞ্ছিত, পথভ্রষ্ট, আশারিক্ত মানুষের প্রতি যে সাশ্রু দরদ তাঁর লেখায় অধিক মাত্রায় রয়েছে, তার জন্যেই তিনি এত বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে প্রিয় শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার মেয়েটি শরৎচন্দ্রের অলিখিত গল্প 'বাসি ফুলের মালা'র এলোকেশীকে জিতিয়ে দেওয়ায় তাঁকে 'মহদাশয়' বলেছে এবং তাকে নিয়েই একটি গল্প লিখতে অনুরোধ করেছে। এটা আসলে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা। সাম্প্রতিক-পূর্ব যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের লেখায় দুঃখের মূল্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার রৌদ্রে স্নাত সহধর্মিতার নিটোল অশ্রুবিন্দু অমূল্য মুক্তাফলে পরিণত হয়েছে। ভাবাবেগপ্রবণতা ও নয়নের জল সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম সেই সৎসাহিত্য গোষ্ঠীরই ধারক।

অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ব্যতীত সৃষ্টি নেই ঠিকই, কিন্তু সৃষ্টির ভাষা, প্রকাশ মাধ্যম, চরিত্রসৃজনের দুর্লভ যাদু সহসা কারো করায়ত্ত হয় না। পূর্বতন মহৎ শিল্পীদের শোণিতধারা অনুজদের ধমনীতে বহমান—এই ঐতিহ্যবাদের সাক্ষ্য শরৎচন্দ্রে বিদ্যমান। যে সম্মানের উচ্চপদে শরৎচন্দ্র দ্রুত

আরোহণ করেছেন, তার পিছনে ছিল তাঁর অধ্যয়ন ও স্বীকরণশক্তি। 'সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি'—একথা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। এই গুরু—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল—

> উপন্যাসে সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তা তখন ভাবতে পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধহয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি এমন নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পর পড়লেন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'। এই বই প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে। বইটি শরৎচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—

> 'ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল।...... কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম।'

শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীর মধ্যে যেন বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী-হীরা শৈবলিনী এসে মিশেছে। এই কিরণময়ীর মধ্যে বিনোদিনী এবং উপেন্দ্রের মধ্যে বেহারীর ছায়াও সুস্পষ্ট। উপেন্দ্রের কিরণময়ীকে উপেক্ষা ও দিবাকরকে নিয়ে কিরণময়ীর আরাকানে পলায়ন, 'চোখের বালি'রই অনুকরণ। 'গৃহদাহ' (১৯২০) অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' মনে পড়ায় যদিও দুটি পৃথক জাতের রচনা।

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে' সাধারণ মানুষের কান্নাহাসি প্রথম প্রতিবিম্বিত এবং ছোটগল্পের শিল্পরূপ রবীন্দ্রনাথই গড়েছেন। পরবর্তীকালের সকলেই 'গল্পগুচ্ছ' থেকে রস ও রূপ গ্রহণ করেছেন। তবে শরৎচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক পথে গিয়েছিলেন, কেননা তাঁর মানসিকতা ছিল ভিন্ন গোত্রের।

'মনুষ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, সূর্যের আলো যেমন পাহাড়ের চূড়ায় পড়ে ক্রমে মাটিতে এসে পৌঁছয়, আমাদের সাহিত্যও সেই নিয়মে আজ মহাভারতের নায়ক থেকে মাটির সামান্য দরিদ্র মানুষে এসে পৌঁচেছে। সে কাজ রবীন্দ্রনাথই করেছেন তাঁর বহু ছোট গল্পে— সেই ধারাকে বহন করার কৃতিত্ব বহুলাংশে শরৎচন্দ্রের প্রাপ্য। আবার তিনিই অনুপ্রাণিত

করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের কথাসাহিত্যিকদের। 'কল্লোল', 'কালি কলম'-এর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

'আমার প্রথম জীবনের গল্পগুলি সবই কথ্য ভাষায় লেখা। আর ঠিক সেই সময়ে পড়লাম শরৎচন্দ্রের গল্প। দুর্দমনীয় সে ভাষার আকর্ষণ। শুধু ভাষা নয়, যেমন অপরূপ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তেমনি অনন্যসাধারণ তাঁর রস-বোধ। আরম্ভ করলাম শরৎচন্দ্রের অনুসরণ।'

তারাশঙ্করের প্রথমকালের রচনা 'চৈতালী ঘূর্ণি' কিংবা 'নীলকণ্ঠ'-এ রাঢ়ের চাষীর যে বিশ্বস্ত চিত্র ফুটেছে, যে-চাষী জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ভূমিহীন চাষীতে রূপান্তরিত, তারই পূর্বাভাস অবশ্যই শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে। অথবা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে' গল্পে পতিতাকন্যা বাতাসীর প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা দাক্ষায়ণীর যে মমতা, সংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠার যে প্রবণতা, তা কি শরৎচন্দ্রকে মনে পড়ায় না? তারাশঙ্করের 'রাইকমল' কিংবা বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' কি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বকে চোখের সামনে ধরে দেয় না? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী স্বীকার করেছেন যে তিনি শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস থেকে পেয়েছিলেন তাঁর জোর। উন্মাদিনী কিরণময়ীর মধ্যে মনোবিকলনের সূত্রটি তিনি বোধকরি খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' কি সম্ভব হতো যদি 'শ্রীকান্ত' রচিত না হতো? সম্ভব হতো কি 'কালকূট'-এর রচনা? 'শংকর'-এর 'সুলেখা' বা 'পাপি বিশোয়াস' কি শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দেশবিভাগ, শরণার্থীদের মিছিল ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দুর্যোগ-রাত্রি শরৎচন্দ্র দেখে যান নি। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে বাঙালী মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের হ্রাস ও অবনমন তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। সাম্প্রতিককালের ঔপন্যাসিকদের বৃহদংশের অবক্ষয়ী দৃষ্টি এবং নৈতিক মূল্যমান নিয়ে চোরাকারবারও তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

দেশ-কাল পার হয়ে চলাই সাহিত্যের ধর্ম। শরৎসাহিত্য স্ব-কালকে স্বদেশকে অতিক্রম করতে পেরেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসায়।

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাদাঁল লিখেছিলেন তিনি তাঁর পৃষ্ঠে বহন করেছেন সেই দর্পণ যার বুকে ছায়া ফেলে আকাশের নীল আর পথের কর্দম।

শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, কি জীবনে কি সাহিত্যে। তাই প্রেমচাঁদের মতো স্মরণীয় শিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্য থেকে লাভ করেন তাঁর প্রেরণা—দৃষ্টি ফেরান অত্যাচারিত মানুষের দিকে। আজ শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করবার সার্থকতা সেখানেই।

শরৎসাহিত্যের সাক্ষ্য

গোপাল হালদার
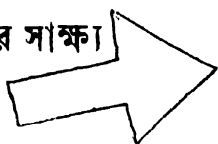
সাহিত্যে আকস্মিক ব্যাপার অনেক সময়ে ঘটে। বাঙলা সাহিত্যে একটা বড় আকস্মিক ব্যাপার বোধহয় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। হঠাৎ কোথা হইতে যে তিনি উদিত হইলেন তাহা যেন কেহই ভাবিয়া পাইল না। অবশ্য অনেকে আজ বলিতে চেষ্টা করেন—শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব তেমন আকস্মিক নয়। 'কুন্তলীন পুরস্কারের' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আগেই স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন গল্প ও উপন্যাসও তিনি আবির্ভাবের আগেই বসিয়া লিখিতেছিলেন। এ সবই হয়ত সত্য কথা। কিন্তু তাহার এই সত্যটা অপ্রমাণিত হয় না যে, শরৎচন্দ্র যেদিন বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সেদিন সাহিত্যিক সমাজে কেহই তাঁহার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হইয়াছিল, তাঁহার উদয় অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। সত্য কথা বলিতে গেলে মানিতে হয়, শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক সমাজ প্রথম সংবর্ধনা জানান নাই, তাঁহাকে প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী পাঠক-সমাজ। তখনকার দিনের সাহিত্যিকরা প্রথম দিকটায় ভাবিয়া পান নাই—শরৎচন্দ্রকে লইয়া কি করা যায়। ততক্ষণ পাঠক—সাধারণ তাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া স্বাগত করিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে সাহিত্যিকদের আর করিবার ছিল কি? শরৎচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। তারপরে তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতেও সাহিত্যিক সমাজের দ্বিধা রহিল না। কিন্তু তবু কথাটা সত্য—শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ছিল তাঁহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত, এবং সকলের নিকট আকস্মিক।

শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক-সমাজ এত সহজে গ্রহণ করিতে পারিল—আর বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিপদে পড়িলেন, ইহার পিছনেও কারণ ছিল। আর তাহা বুঝিবার মত। শরৎচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তাঁহার আশ্চর্য সৃষ্টিশক্তির প্রমাণ লইয়া। এই প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ইহা একেবারেই স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়! পাঠক এক মুহূর্তে মানেন—এইতো মানুষ, আমাদের মত মানুষ, হাসিকান্না, সবলতা-

দুর্বলতা, সত্য মিথ্যা, সব লইয়া আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই বন্ধু, 'জায়া পুত্র পরিবার,'—তাহারাই সকলে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের পাতা হইতে কথা কহিয়া উঠিল। এমন জীবন্ত চিত্রকে স্বীকার না করিয়া উপায় আছে?

কিন্তু পাঠক-সাধারণ যত সহজে শরৎচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লইল সাহিত্যিক সমাজ তত সহজে তাঁহাকে স্বীকার করিতে পারিলেন না কেন? সৃষ্টির অমোঘ স্বাক্ষর তাঁহারাও নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু বাধা পাইতেছিলেন কোথায়? সেই কথাটিই বুঝিবার মত।

যে কারণে তখনকার বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজের পক্ষে শরৎচন্দ্রকে প্রথমেই অকুন্ঠিত চিত্তে গ্রহণ সম্ভব হয় নাই, সেই কারণেই আবার তখনকার বাঙালী পাঠক-সাধারণের পক্ষে শরৎচন্দ্রকে সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এই কথাটা হইতেই পরিষ্কার—তখনকার বাঙালী পাঠক-সমাজ ও তখনকার বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে একটা ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল। সাধারণ পাঠক বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের লোক—তখনো তাহাই ছিলেন, আজও তাহাই আছেন। বলিতে পারি, সাধারণ পাঠক আসলে বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের লোক। উভয়েই কম বেশি ইংরেজ শাসনের ও ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফল। কিন্তু বাঙালী পাঠক-সাধারণ পুরাতন সমাজ ও পুরাতন জীবন-যাত্রাকে অনেকটা মোহ ও মায়ার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কার্যক্ষেত্রে তাঁহারাও অবশ্য ইংরেজি আমল ও একালের ধনতন্ত্রের আদর্শকে মানিয়াই চলিতেন। কিন্তু পুরাতন সমাজকে নিজেরা ভাঙিয়া গড়িবার সুযোগ আমরা স্বাভাবিকভাবে পাই নাই। আমাদের প্রাচীন সমাজ ও জীবনযাত্রাকে প্রবল আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিতেছিল বহিরাগত পাশ্চাত্ত্য জীবন-যাত্রা;—উহা ধনিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদেরই প্রকাশ। তাই, আমরা নূতন জীবনযাত্রাকে মোটেই স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। বরং এই কারণে পুরাতন জীর্ণ জীবনযাত্রাকেই অনেক মিথ্যা মোহ দিয়া বড় করিয়া দেখিতে চাহিতাম। সাম্রাজ্যবাদের অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় এমনিতর ভুল ঘটনা স্বাভাবিক। অথচ আমরা ইংরেজি শাসন ও ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার মারফতে ধনিকতন্ত্রের ব্যপকতর আদর্শ ও গভীরতর সত্যের সম্বন্ধেও সচেতন হইতেছিলাম। না হইয়া উপায় ছিল না—মিল্ পড়িয়াছি, কোঁৎ পড়িয়াছি; ফরাসী বিপ্লবের মুক্তিবাণীও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। এরূপস্থলে 'মানুষের অধিকার',—প্রাদেশিকতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা,—এইসব

সত্যেরও মূল্য বুঝিতেছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন সমাজের টানও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। এমন কি, আমাদের নূতন প্রাদেশিকতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধও সেই পুরাতনকেই সময়ে সময়ে মোহের আবরণে ঘিরিয়া মোহন ও বড় করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। বাঙলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনও উহার দৃষ্টান্ত। সে আন্দোলনের একটা দিকে ছিল যেমন স্বদেশী-শিল্প গড়া; অর্থাৎ দেশীয় ধনতন্ত্রের গঠনের চেষ্টা; আর একটা দিকে ছিল তেমনি পুরাতনের পুনঃ প্রবর্তন, 'হিন্দু জাতীয়তা' গড়া, অর্থাৎ পুরাতন সামন্ততন্ত্রের জীবনাদর্শকে টিকাইয়া রাখা। সাধারণ পাঠকও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলেন—তাঁহার মনের একটা অংশে অনেক মোহ জমিয়া ছিল তাঁহার পুরাতন সমাজের জন্য। কিন্তু তখনকার বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দ এই পুরাতনের মোহ হইতে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন নূতন জীবনযাত্রার পক্ষপাতী—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রধান উদগাতা। সমস্ত লেখকই আসলে এই পক্ষে থাকিবার কথা—ইহাই ছিল 'উন্নতির পথ'। গত শতাব্দীতে এই প্রগতির ধারার নাম ছিল 'উন্নতির', 'সংস্কারের'বা 'রিফর্মে'র' আন্দোলন। কিন্তু এই 'সংস্কার' চেষ্টাটা সাম্রাজ্যবাদের আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে আসে নাই; আসিলে উহা আসিত সমাজ-বিপ্লবের চেষ্টা রূপে। এখন আসিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদের ছাড়-পত্র লইয়া একটা 'সংস্কার আন্দোলন' বা 'রিফর্ম মুভমেণ্ট' রূপে। এই জন্যই উহা শিক্ষিত-সাধারণের নিকটেও অনেক সময়ে ঠেকিয়াছিল 'বিলাতিয়ানা'বলিয়া। তাই, বঙ্কিম এই 'সংস্কার' আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিতেছেন, বিবেকানন্দও তাহাকে বড় বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু কথাটা এই—মন্দগতি হইলেও উহার মুখ ছিল জীবন্ত কালের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার সমস্ত সৃষ্টি এই জীবন্ত কালের দিকেই বাঙালী পাঠককে আগাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। পাঠক-সাধারণ অবশ্য তাহাতে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছিল; কারণ, সৃষ্টির তাগিদ সেদিকে, কালের গতি সেদিকে। কিন্তু পুরাতনের মোহও তাহাদের রহিয়া গিয়াছে। বরং রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা এবং তখনকার সংস্কারক দলের এই সক্রিয়তা ও প্রাধান্য পাঠকের মনের একটি কোণে এক বিক্ষোভ ও বিরোধিতারই সৃষ্টি করিতেছিল। সেই বিরোধের আবেগটুকুকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অবশ্য রক্ষণশীল কেহ কেহ সাহিত্যক্ষেত্রেও করিতেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলেরা এক্ষে চাহিয়াছিলেন মূলত সৃষ্টি-গতির বিপক্ষে যাইতে;

দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টিরও তেমন শক্তি ছিল না। কাজেই বাঙালী পাঠক-সাধারণের, মানে বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মনের একটি কোণে যে এক ন্যায্য-অন্যায্য বেদনা ও বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা কোথাও রূপ পাইতেছিল না। বরং রবীন্দ্রনাথের অনুগত সাহিত্যিক-সমাজ যতটা পুরাতন সমাজকে 'সংস্কার' করিবার জন্য উদ্যত ততটা সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন না। সে সমাজকে রবীন্দ্রনাথও যতটা আপনার বলিয়া জানিতেন ততটুকু আপনার বলিয়া মানিতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সে দিনে তাঁহারাই ছিলেন 'হাই-ব্রো।' অর্থাৎ মোটামুটি বলিতে পারি—বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন সংস্কারবাদীর প্রাধান্য, অথচ সেই সংস্কারবাদীরা ততটা সৃষ্টিতে সার্থক নন,—আর বাঙালী পাঠক-সমাজে তখনো পুরাতন সমাজের জন্য মোহ ও মমতা রহিয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল এমনিতর বাঙালী সমাজে। তাহার প্রথম দান—'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বউ', 'বড় দিদি'র মত সৃষ্টি। এক নিমেষে বাঙালী পাঠক-সমাজ দেখিলেন—এই সৃষ্টিতে মানুষই শুধু জীবন্ত হয় নাই, একেবারে তাঁহাদেরই আপনার মানুষ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন সমাজেরও পিছনে তো একটা করুণ মানবীয় সত্য ছিল, সাধারণ বাঙালীরা তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না ;—শরৎচন্দ্র যেন সেই সত্যটিকেই একেবারে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। এই তো বিন্দু—তাহার আপন সন্তান নাই। আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের হিসাব লইলে তাহার মাতৃত্বের পরিতৃপ্তির পথ কোথায়? বড় জোর কোনো 'অনাথাশ্রমে', কোনো 'সি-এস-পি-সি-এ'র প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু আমাদের অতি-পচা সামন্ত-সমাজের সেই অতি-পচা একান্নবর্তী পরিবারে তো তাহার মাতৃ-হৃদয়ের পরিতৃপ্তির একটা পথ ছিল। আর শুধু কি পরিতৃপ্তির পথ ছিল? সেখানে সন্তানহীনা বিন্দুরও মা হিসাবে দাবী আছে, দায়িত্ব আছে ; এমন কি মা হিসাবেই অধিকারও পর্যন্ত আছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ তো ধনিকতন্ত্রের রাজত্ব ; অর্থাৎ ধনিকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, শতকরা পঁচানব্বুই জনের ব্যক্তিত্বের খর্বতা,—এই কথা হয়ত তখনো আমরা বুঝি নাই। কিন্তু তখনো বুঝিতে-ছিলাম পুরাতন সামন্ত-সমাজে, একান্নবর্তী আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে, যাহা আছে সবই কেবল ভুল আর অন্যায় নয়—সেই জীবনের স্বপক্ষেও দুই-

একটি কথা বলিবার আছে। যে সেই সমাজ সত্যই দেখিয়াছে, সে তাহাও মর্মে মর্মে জানে। যে সেই সমাজেরই একজন—আমাদেরই একজন—সে-ই তাহা প্রকাশও করিতে পারিবে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল। আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী,—বাঙালী "পাঠক-সাধারণ", Common Reader,—এক নিমিষে আমরা বুঝিলাম—নূতন স্রষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে, আর সেই নূতন স্রষ্টা আমাদেরই আপনার লোক। তৎকালীন বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দের হয়ত ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়াছিল—সংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতা পুষ্ট হইতেছে। নূতন সৃষ্টির এই অভ্রান্ত পরিচয়ে তাঁহাদের প্রাণেও আনন্দ সঞ্চারের কথা। তাহা সঞ্চার হইয়া থাকিলেও সেই ভ্রূকুটিকে তখন উহা মুছিয়া দেয় নাই, সেই ললাটকে তখন উদ্ভাসিত করিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাবে এই জন্যই বাঙালী সাধারণ পাঠক এতটা উল্লসিত হইয়া উঠেন। যে কথাটি বলিবার ছিল, সে কথাটি বলা হইল। শরৎচন্দ্র প্রথম উপস্থিত হইলেন এই কথাটি বলিয়া—না, এ পচ-ধরা বাঙালী সমাজেও মানুষ আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে, ক্ষতি আছে, বেদনা আছে, কিন্তু মানুষও তবু এইখানে ঠাঁই পায়, ফুটিয়া উঠিতে পারে। 'হালদার গোষ্ঠীর' সামন্ত-জীবনের কাঠামো ভাঙিয়া না বাহির হইলে বনোয়ারীলাল ফুটিতেই পারে না। কিন্তু 'নিষ্কৃতির' মুখুজ্জে পরিবারের মানুষগুলি সকলকে জড়াইয়া থাকিয়াও মানুষ হইয়া উঠে—ইহা কি কম সত্য?

অথচ ইহাও অর্ধসত্য। আর তাহা আমরাও জানিতাম, শরৎচন্দ্রও জানিতেন। যেই কথাটি আমাদের প্রাচীন সমাজের স্বপক্ষে বলিবার ছিল, তাহা বলা শেষ হইতে না-হইতেই শরৎচন্দ্রের ঘোষণাবাণী তাই জ্বলন্ত অক্ষরে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তখনো 'সংস্কারকের' বাঁধা-বুলিতে প্রাচীন সমাজকে তিনি আঘাত করিলেন না--বিপ্লবীর মতই তিনি দুর্বার শক্তিতে আঘাত করিলেন। 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' হইতে একেবারে 'গৃহদাহ' পর্যন্ত বলিতে পারি শরৎচন্দ্রের এই স্পর্দ্ধিত বিদ্রোহের ধারাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার নূতন গল্পে ('সবুজপত্রের' পাতায়), লেখায়, ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'সবুজপত্রে' বাঙালী-জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে চরম প্রচার চালাইতেছিলেন। (তাই সমাজ ও সাহিত্যেরও ইতিহাসে বঙ্কিমের

'বঙ্গদর্শন' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার নামে যুগ-চিহ্নিত করা যায় না— 'কল্লোলে'র নামে ত না-ই, 'পরিচয়ে'র নামেও সম্ভবত না —প্রসঙ্গক্রমে তা স্মরণীয়)। কিন্তু 'সবুজপত্রের' সেই মন্ত্র আমাদের সাধারণ পাঠকদের যতটুকু স্পর্শ করুক না করুক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে আমরা সম্পূর্ণ অভিনন্দন করিতেছিলাম। তাহার কারণ কি? প্রধান কারণ, উহা সৃষ্টি; মানুষের স্বীকৃতি উহা আদায় করিবেই—সেই জীবন্ত নর-নারীকে আমরা ঠেকাইয়া রাখিব কি করিয়া? দ্বিতীয় কারণ, সত্যই আমরা যতই পুরাতন সমাজের প্রতি মমতা পোষণ করি না কেন, আমরাই বেশি করিয়া জানি উহা কত পচা-ধরা, কত ঘুণধরা, কত মিথ্যা। আধুনিক-কালকে আমরাও কার্যত বা চিন্তায় একেবারে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহি নাই। আমরাও বুঝিতেছিলাম—তাহা অচলায়তন; আমরাও চাহিতেছিলাম 'মানুষের অধিকার', মানুষের মানুষ হিসাবে মর্যাদা লাভ। অর্থাৎ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজও আসলে পুরাতন সমাজের অসামঞ্জস্য বুঝিয়াছিল—যতই সে বলিতে চাহুক যে, 'সে-পুরাতন সমাজেও মানুষের বিকাশের অবকাশ ছিল।' সেই কথাটি বলা হইলেই তাহার আপত্তি চুকিয়া গেল। তাহার পরেই সেই দাবী করে—'কিন্তু এই প্রাচীন সমাজের অসামঞ্জস্যে আমার যে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বলিবে না? ইহাই তো মূল সত্য।' শরৎচন্দ্র তাহা বলিতে অগ্রসর হইলে সাধারণ পাঠক যেন আরও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পুরাতন সমাজের যেরূপ নীতি আর বিন্যাস তাহাতে মানুষ টিঁকিবে কি করিয়া? তাহার ছাঁচে-ঢালা সমাজে ছাঁচের মতই গড়িয়া উঠিতে হইবে। বিজলী কোথাকার নর্তকী, সে আবার বদলাইবে কি করিয়া? চন্দ্রমুখী পতিতা, সে পতিতাই থাকিবে। পিয়ারী সে আবার রাজলক্ষ্মী হইবে কোন্ অধিকারে? সাবিত্রী মেসের ঝি, সে-ও আবার ভালোবাসিবার দাবী করে নাকি? অভয়ার স্বামী বেদমন্ত্রের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিল বলিয়াই কি অভয়ার পক্ষেও সেই পবিত্র বিবাহ-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে? পুরুষকে অবশ্য এই সমাজ কার্যত খানিকটা স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু তবু তাহার সনাতনী আদর্শে দেবদাস, শ্রীকান্ত, সতীশ, দিবাকর—ইহারা কে উৎরাইতে পারে?

কথা এই—সেই প্রাচীন জীবনযাত্রা ও জীবনাদর্শের উপর শরৎচন্দ্রের মত এমন অমোঘ আঘাত, 'সংস্কার-পন্থীরা'ও করিতে পারেন নাই, অথচ নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ তাহাদের সহ্য করিতে চাহে নাই। তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের

এই বিদ্রোহকে সেই সমাজ স্বাগত করিল কি করিয়া? ইহার দুইটি কারণ পূর্বে বলিয়াছি—এক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি; দুই, মূলত নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও এই বিদ্রোহেচ্ছা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনবোধ, ব্যক্তির মর্যাদাবোধ। কিন্তু আরও কারণ ছিল—তাহারও ইঙ্গিত পূর্বে করা হইয়াছে—উহা শরৎচন্দ্রের সহিত এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের বা সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধের কথা; আর উহাই শরৎচন্দ্রের নিজের দৃষ্টিক্ষেত্রের কথা, তাঁহার দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের কথা। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিমাত্র আমাদের মনে হইল—আমরা আত্মীয়ের মুখ দেখিলাম, ইনি 'হাই-ব্রো' বা 'সংস্কারক' জাতীয় সাহিত্যিক নন। যাঁহারা পাদ্রিদের কথায় আমাদের সমাজকে নিজের বলিতে লজ্জা পান, ইনি তাঁহাদের কেহ নন। এই সমাজেরই তিনি একজন, তিনি তাহা প্রাণ দিয়া স্বীকার করেন, প্রাণ মিশাইয়া আমাদের ভালোবাসেন; আর আমাদের প্রাণও তাই জয় করিয়া লন। মানুষের হৃদয় জয় করিবার এই অস্ত্র লইয়া শরৎচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, আর তাই তাঁহার এই সমাজকে ভাঙিবার অধিকার,—আপন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার—অস্বীকার করিবে কে? বরং অস্বীকার যাহারা করিতে চাহিল, আমরা—সাধারণ পাঠকেরা—তাহাদেরই অস্বীকার করিয়া ফেলিলাম। এই সব পতিতা স্ত্রীলোক আর চরিত্রহীন পুরুষ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎবাবুর বাড়াবাড়ি যে সুনীতির পরিচায়ক নয়, সুরুচিরও পরিচায়ক নয়—ইহা বলিবার লোকের অভাব হয় নাই। এ বিষয়ে 'রক্ষণশীল' কর্তৃপক্ষ, আর 'সংস্কারপন্থী' কর্তৃপক্ষ দুইই ছিলেন একমত—সকল দলের কর্তৃপক্ষের চক্ষেই বিদ্রোহ একটা অশুভ, তাই অশোভন ব্যাপার। কিন্তু আমরা তাহাদের কথায় কান দিলাম না। শরৎচন্দ্র বলিতেছিলেন—এই পতিতা আর চরিত্রহীন, ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে অস্পৃশ্য হইবে কেন? ইহাদের সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ ইহারা সমাজের মানুষ, জীবনপ্রবাহে সন্তরণশীল 'চরিত্র', জীবন-সংগ্রামে আহত, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ, ক্লেশবদ্ধ মানুষ, আর সবার উপরে 'মানুষ'—সত্য-মিথ্যা, ভুল-ভ্রান্তি, বেদনা-আনন্দ ভরা মানুষ। 'মানুষ'—হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়া শরৎচন্দ্র যেন এই কথাটাই স্বীকার করিতে চাহিলেন—'ইহারা মানুষ'। বলিতে চাহিলেন সেই অতি পুরাতন কথা—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এইটিই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিক্ষেত্র—এবং তাঁহার এই প্রেমময় দৃষ্টিকেই বলিতে পারি তাঁহার দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। 'মানুষের অধিকার' তিনিও ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাহা পুঁথি পড়িয়া নয়, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়াও নয়। 'ব্যক্তি-সত্তার' স্বপক্ষে তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ; কারণ তিনি হৃদয় দিয়া মানুষকে চিনিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে মহিমা, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে বেদনা। শরৎচন্দ্র যে পুঁথি পড়িয়াও ইহা না জানিতে পারিতেন তাহা নয়,—'নারীর মূল্যের' কথা মনে রাখিলেই বুঝিব সেদিক দিয়াও তাঁহার বিচার-সামর্থ্য ছিল। কিন্তু তিনি আপনার স্বাভাবিক প্রেমের বলে মানবতা-বোধের বিকাশেই মানুষের এই রূপ উপলব্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন,—এই কথা বলাই বোধহয় আরও ঠিক হইবে।

□

জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বোধকরি আজও অপরাজেয়। সোজা-সুজি নাটক লিখব বলে তিনি কোনও নাটক লেখেননি। নিজের তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ শেষ। তাঁর বহু জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরম সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়েছে। মাত্র তিনখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি থেমে গেলেন কেন এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরাসরি নাটকই বা লিখলেন না কেন, সে কথাও তিনি নিজেই প্রকাশ করে গেছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর লেখা একটি চিঠি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি অনিবার্য মনে করছি :

"আমি নাটক লিখিনা, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তাহলেও, আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলছি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়। এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপার জন্য পাবলিসারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্তত, শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এই জায়গাটার অ্যাকশন কম, দর্শক নেবে না, কিংবা এই বই অচল, ও তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তারা বিশেষজ্ঞ। টাকা দেনেওয়ালা দর্শকদের নাড়ী নক্ষত্র তাদের জানা। সুতরাং এ বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মনে আমার দ্বিধাবোধ করে।"

নাটক লেখার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রকে তৎকালে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে সব সমস্যা পরবর্তীকালেও বিদ্যমান ছিল এবং আজও

আছে। স্মর্তব্য, শিশিরকুমারের সময়েই নাট্যাভিনয়ে নাট্য প্রযোজক অথবা প্রয়োগকর্তা নাট্যকারের গুরুত্ব অর্জন করেন। তৎপূর্বে নাট্য শিক্ষক থাকতেন বটে কিন্তু নাট্যকারের গুরুত্ব তাঁকেও মানতে হত। তারও পূর্বে নাট্য শিক্ষক পরিচিত ছিলেন, মোশান মাষ্টার নামে। এক কথায় বলা যায়, প্রাক্ শিশির যুগের নাট্যকারের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। শিশিরকুমারের সময় থেকেই বলা চলে শুরু হয় নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োগকর্তার সামগ্রিক আধিপত্য। শরৎচন্দ্রের মত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের পক্ষে এই আধিপত্য দুঃসহ হলেও শিশিরকুমারের অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর বিমুগ্ধ আস্থা ছিল বলে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু হৃষ্ট মনে নয়। এ সম্বন্ধে আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অন্তরঙ্গ বন্ধু অবিনাশ ঘোষাল একদিন দেখা করতে এলে তিনি বলে উঠলেন—

'কাল শিশির এমনি মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছে যে, রাতে ভাল ঘুমই হল না। ওর মাথায় ঢুকেছে জীবানন্দকে শেষ দৃশ্যে মেরে না ফেললে ড্রামাটিক এফেক্ট হবে না। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে জীবানন্দকে মারার কোন সার্থকতা নেই। কত বোঝালুম বইয়ের যেটা 'মেসেজ' সেটা জীবানন্দর বেঁচে থাকাতে যেমন পরিস্ফুট হয় মরলে তা হয় না। ও প্রায় আমার হাত ধরে ওর এই অনুরোধটা রাখতে বলেছে।....কি মুস্কিলেই যে পড়েছি সে আর কি বলব।... যে সংসারে কিছুই পেলে না, বা যার পাবার সব আশা ফুরিয়ে গেছে, এমন লোক বাঁচল কি মরল, উপন্যাস বা নাটকে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু শেষ জীবনে জীবানন্দ যা পেয়েছে তা তার এতদিনের বঞ্চিত জীবনকে শুধু ভরিয়েই তুলেছে তা নয়—তা তাকে মানুষের মত বাঁচবার একটা প্রেরণা দিয়েছে তবে সে মরবেই বা কেন, আর তাকে মেরে ফেলার সার্থকতাই বা কি? ড্রামাটিক এফেক্টের জন্য একটা উদ্ভট কিছু করলেই তো হবে না—থিয়েটারের লোকগুলো সবাই সমান। এরা শুধু বোঝে সস্তার ড্রামাটিক এফেক্ট।'

কিন্তু পরিচালনা বা প্রযোজনা এক জিনিষ আর নাটক লেখা বা কোন উপন্যাসকে নাট্যায়িত করা আর এক জিনিষ! প্রয়োগকর্তা শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'গৃহদাহ' অভিনয় করতে ইচ্ছুক হয়ে শরৎচন্দ্রকেই নাট্যরূপ দিতে সম্মত করেন। শরৎচন্দ্র মাত্র দুটি অংক লিখে বিশেষ অসুস্থতা নিবন্ধন যখন আর অগ্রসর হতে পারছেন না, তখন

শিশিরকুমারই নাছোড়বান্দা হয়ে বাকী নাট্যরূপটা তিনি নিজেই দেবেন এই প্রস্তাব করায় শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেন, এর ফল ভাল হবে না, এ বড় শক্ত বই। শিশিরকুমার তা মানলেন না, শরৎচন্দ্রের দেওয়া দুটি অঙ্ক নিয়ে তিনি চলে যান এবং অসম্পূর্ণ নাট্যরূপকে সম্পূর্ণ করে নিয়ে নবনাট্য মন্দিরে 'অচলা' নাম দিয়ে গৃহদাহ-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। বিজ্ঞাপনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল—'শরৎচন্দ্রের অচলা শিশির প্রতিভায় সচলা দেখে যান।'

অবিনাশ ঘোষাল এরপর শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—'অচলা' আপনার কেমন লাগল ?

শরৎচন্দ্র বললেন ঃ ও আমি দেখিনি, আর দেখবও না।

অবিনাশ বললেন ঃ কেন ?

শরৎচন্দ্র বললেন ঃ আমার অচলার শেষের আকার লোপ করে দিয়েছে।

অবিনাশ বললেন ঃ কে বলেছে ?

শরৎচন্দ্র বললেন ঃ এমন সব লোক বলেছে যাঁদের মতের উপর আমার বিশ্বাস আছে। শিশিরকে তখন আমি বারবার বলেছিলাম, দু'অঙ্ক নিয়ে যেও না—ও তোমরা করতে পারবে না। আমার কথা শুনলো না। আমার চেনা লোক যারা দেখতে গিয়েছিল তারা সবাই একবাক্যে এর নিন্দা করেছে।

অবিনাশ বললেন ঃ নাটক তো শুনলাম চার অংকর হয়েছে। এটা করলে কে ?

শরৎচন্দ্র বললেন ঃ তা আমি জানি না।

অবিনাশ বললেন ঃ আমার খবর হচ্ছে ; শিশিরবাবুর অনুরোধে 'বাঙলা' সাপ্তাহিক পত্রিকার যতীন রায় বাকী দু অংক করেছে।

হায়রে, শিশিরকুমার দুই অঙ্কের পরবর্তী অংশটা শরৎচন্দ্রকে একবার দেখিয়ে নিলে বোধহয় এমন একটা বিপর্যয় ঘটত না।

আমি মনে করি পরিচালকের কাজ হচ্ছে—রাঁধুনির কাজ ! মাছ বা মাংস, আনাজ তেল ঘি নুনমসলা সবই না হয় ভালো মিলল। কিন্তু তবু দেখা যায় ভালো ব্যঞ্জন হয় না। রাঁধুনি সব কিছু বেছে নিয়ে পরিমাণ মত মিলিয়ে মিশিয়ে মাপ মত ঝাল দিয়ে নামিয়ে নিলে তবেই না ব্যঞ্জনটি রসাল হবে। 'অচলা' নাটকটির ক্ষেত্রে মূল মাংসটাই ছিল—ভেজাল। আর তার জন্য দায়ী ছিলেন স্বয়ং রাঁধুনি, আর তাই ব্যঞ্জনটি উৎরোয় নি। কিন্তু 'অচলা' অচল হলেও শিশির-কুমারের যাদুস্পর্শেই ষোড়শী, রমা, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস,

বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি নাটকগুলি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শিশির-কুমারের পরেও শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত হয়ে ১৯১৮ সালের ১৫ই আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। যদিও এই নাট্যরূপ শরৎচন্দ্রের প্রীতিপ্রদ হয় নি। কিন্তু সেই থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের সিংহদ্বারটি শরৎ কাহিনীর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯৫৬ এর ১লা আগস্ট তারিখে 'অমৃত' পত্রিকার শরৎ শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় রচিত "শরৎ কাহিনী মঞ্চে ও পর্দায়" নামক তথ্যপূর্ণ একটি মূল্যবান প্রবন্ধে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত শরৎচন্দ্রের নাট্যায়িত কাহিনীগুলির একটি বিস্তারিত ইতিবৃত্ত এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। প্রখ্যাত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'পথের দাবী' উপন্যাস দুইটির যে নাট্যরূপ দেন তা মঞ্চ সাফল্য লাভ করলেও বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কারণ শরৎ কাহিনীকে তিনি নাট্য প্রযোজনার অজুহাতে পরিবর্তন করেছিলেন। মূল কাহিনীকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে পরিবর্তন করা পরলোকগত স্রষ্টার প্রতি অবিচার রূপে অনেকেই গণ্য করে-ছিলেন। শচীনদা আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ছিলেন, তা সত্ত্বেও আমিও এটাকে অবিচারই মনে করি। নাট্যরূপ দিতে গেলে কিছুটা রদবদল অবশ্যই আবশ্যক হয়। কিন্তু তাই বলে কাহিনীর মূল কাঠামোকে বদলানো অনেকটা খোদার উপর খোদকারী মনে হয়—বিশেষতঃ, স্রষ্টা যদি পরলোকগত থাকেন। কাহিনীকার নিজে যদি এই পরিবর্তনের অনুমতি দেন, সেখানে কিছু বলার থাকে না। একথা শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে আরও বেশী খাটে এই জন্য যে, তিনি অন্যের হাতে তার রচনার অদল বদল সম্পর্কে বিশেষ স্পর্শকাতর ছিলেন। অবিনাশ ঘোষালের লেখা শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা বই থেকে আবার একটু উদ্ধৃত করছি—

বললুম : তা বটে ; তবে আপনি যদি নাটক করেন তাহলে তা নিয়ে শিশিরবাবুর সঙ্গে কথা কওয়া যেতে পারে।

তিনি বললেন : শিশিরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ আছে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে যা কিছু শুনি, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি তো তা বরদাস্ত করব না। অনেকের কাছে আমি শুনেছি, শিশির যে নাটক অভিনয় করে তার সব কিছু ছেঁটে ফেলে নিজের পার্টকে বড় করে তোলে।

বললুম : আপনার নাটক সম্বন্ধে কি আর তিনি তা করতে সাহস

পাবেন ?

এর উত্তরে তিনি যা মন্তব্য করলেন আমি আর তা এখানে উল্লেখ করতে চাই না, কারণ শিশিরবাবু আজ স্বর্গত।

তবে অবশ্য একথাও বলব, শরৎচন্দ্র এক হিসাবে এ-বিষয়ে সৌভাগ্যবানই ছিলেন। কারণ তাঁর কাহিনী মঞ্চাভিনয়ের জন্য যাঁরা নাট্যায়িত করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সুখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। চরিত্রহীন-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যোগেশ চৌধুরী। পথের দাবী আর দেবদাস-এর নাট্যরূপদাতা শচীন সেনগুপ্তর কথা পূর্বেই বলেছি। বিপ্রদাস-এর নাট্যরূপদাতা ছিলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, শ্রীকান্ত, পরিণীতা প্রভৃতি বহু শরৎ কাহিনী নাট্যায়িত করে দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বলে থাকেন, 'রঙ্গমঞ্চের তাস খেলায় শরৎ কাহিনী তুরুপের তাস'। আমি বলব শরৎ কাহিনী এইসব সার্থক নাট্যায়নের জন্যেই সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘরের জিনিস হয়ে দাঁড়ায়,—শুধু মুদ্রিত পুস্তকের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের এত বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকেই যায় শরৎচন্দ্রের মত বিরাট প্রতিভা সরাসরি কোন নাটক লেখেননি কেন ? কেন লেখেন নি তা আমি এই প্রবন্ধে তাঁর নিজের কথাতেই তুলে ধরেছি। ব্যাপারটা সত্যই দেশের পক্ষে, জাতির সাহিত্যের পক্ষে একটি চরম দুর্ভাগ্য।

শরৎচন্দ্র সরাসরি নাটক না লেখাতে নাট্যক্ষেত্রে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে, তাঁরই দেওয়া তিনটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ। যথা, বিজয়া ('দত্তা'র নাট্যরূপ), রমা ('পল্লীসমাজে'র নাট্যরূপ) এবং ষোড়শী ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ)। আর এ ছাড়া পেয়েছি বহু খ্যাতনামা নাট্যকারদের দেওয়া তাঁর বহু জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই কয়েকটি নাট্যরূপই শরৎ প্রতিভার নিদর্শন, এবং একমাত্র এই নাট্যসম্পদই আমরা তাঁর নাট্য-উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

শরৎ উপন্যাসে নাটকীয়তা একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। স্বল্পায়তন নাটকে এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের সময় ও সুযোগ মেলে না। উপন্যাসকে নাটকায়িত করতে গেলে এই বিপদ। শরৎ কাহিনীর অনবদ্য সংলাপ নাটকের সংক্ষেপিত অঙ্গে পূর্ণ

মর্যাদা পায় না। শরৎচন্দ্রের কাহিনীবিন্যাস বিলম্বিত লয়ে বাঁধা থাকে। নাটকে এই বিলম্বিত লয়ের স্থান নেই। জীবন সংঘাতের দ্রুতগতি বিন্যাসই নাটকের প্রাণশক্তি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে ঐ জীবন-সংঘাত রূপায়িত করার যে প্রস্তুতি আবশ্যক তিন ঘণ্টার নাটকে তার স্থান হওয়া দুরূহ। শরৎচন্দ্র নিজেও স্বীকার করে গেছেন যে, 'উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নাই।' বলাবাহুল্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপগুলি এইসব সাংগঠনিক অসুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ তথাপি জনপ্রিয়তায় অভিষিক্ত হয়েছে; আগেও হয়েছে এখনও হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণই হচ্ছে শরৎচন্দ্রের সেইসব কাহিনীরই নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে যা বহু পঠিত এবং বহুল সমাদৃত। দর্শকের মনে পূর্ব থেকেই কাহিনীর সমগ্রতা অধিষ্ঠিত থাকায় নাট্যরূপের ত্রুটিবিচ্যুতি রসোপলব্ধিতে বিশেষ অন্তরায় হয় না। যদিও সুবিখ্যাত শরৎ সাহিত্য সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, 'শরৎচন্দ্র নাট্য প্রয়োজনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপন্যাসের কাহিনীকে নূতনভাবে সন্নিবেশিত করেন নাই। সেজন্য তাঁহার নাটকের দৃশ্যগুলি উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির সংলাপাশ্রিত রূপ হইয়াছে মাত্র; নাটকের রসঘন অবিচ্ছেদ্য অংশ হইতে পারে নাই। একমাত্র ষোড়শী ব্যতীত তাঁহার অপর কোনো নাটকে উচ্চাঙ্গের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।' শিশির অভিনয়দীপ্ত ষোড়শী আমাদের নাট্য সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সন্দেহ নাই।

শরৎ কাহিনীগুলি যে যুগের, সে যুগ আজ আর নেই। সে পল্লীসমাজ নেই, সে জমিদার ও জমিদারী নেই, পারিবারিক ও সামাজিক নারী নির্যাতন, বিধবা ও পতিতা নারী নিগ্রহ আজ আর সে চরম স্তরে নেই। জাতীয় পরাধীনতাও আজ নেই।

বর্তমান যুগে যে প্রগতি পরিলক্ষিত হয়, তার মূলে শরৎ সাহিত্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। আজও আমরা শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ দেখতে অনাগ্রহী নই, কারণ ঐসব নাট্যরূপের একটা ঐতিহাসিক মূল্য দাঁড়িয়ে গেছে। জাতীয় প্রগতি এবং সামাজিক বিবর্তন ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। শরৎ নাটকের ভাব-বিপ্লবের মধ্যে তারই কয়েকটি ধাপ অবশ্যই আছে এবং সার্থকভাবেই আছে, যা অতিক্রম করে আমরা বর্তমানের দুয়ারে এসে পোঁচেছি। যুগস্রষ্টা শরৎচন্দ্র আমাদের চির নমস্য।

শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার ঃ চলচ্চিত্রে

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
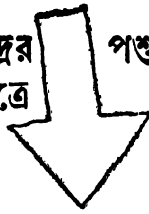
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র কোন একটি বাঙলা ছবি সম্পর্কে তাঁর যৌবনদীপ্ত, অনুকূল অভিমত দিতে গিয়ে বর্তমানের বাঙলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বলেছেন, "বাংলা চলচ্চিত্রে আর যাই কিছু থাকুক, যৌবন নেই। এখানে যৌবন মৃত। পঞ্চাশোর্ধ বুড়ো খোকা খুকুরা নেচে কুঁদে প্রেমের নামে ন্যাকামি করে। আর যৌবন বাংলা ছবিতে হয় ভ্রূ কুঁচকে হাবিজাবি ভারি ভারি মিথ্যে কথা বলবে কিংবা হিন্দির অনুকরণে 'বা-বা' ক'রে কোমর দুলিয়ে ভুল ছন্দে নাচবে।"

ঠিক জানিনা, আমাদের যুবক ছাত্রটি পঞ্চাশোর্ধ বুড়ো খোকা খুকু বলতে বাংলা ছবির কোন্ কোন্ নায়ক নায়িকাকে ইঙ্গিত করেছেন; কারণ, আমি তো জানি, আমাদের সবচেয়ে বয়স্ক এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা এখনও পর্যন্ত পঞ্চাশে পেঁৗছোননি। কিন্তু ও-কথা থাক। আমাদের যুবক ছাত্রটির যে মন্তব্য আমাকে সচকিত করেছে, সেটি হচ্ছে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রে যৌবন নেই। এখানে নাকি, যৌবন মৃত!

আমি নিজে যৌবন প্রাপ্তির বেশ কয়েক বছর আগে থাকতেই চলচ্চিত্রের দর্শক। তখনও বাঙলা চলচ্চিত্রের জন্মই হয়নি এবং কল্‌কাতার বায়োস্কোপ গুলিতে হিন্দি ছবিরও আবির্ভাব ঘটেনি। এমন কি বিদেশী ছবিগুলিও—কাহিনী চিত্র হ'লেও—দৈর্ঘ্যে ৬,০০০ ফুটের বেশী ছিল না। সেই ১৯১৪ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত আমি এক নাগাড়ে চলচ্চিত্রের দর্শক। ছবি দেখার ব্যাপারে আমার কোন ক্লান্তি নেই। আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন, আমিও এককালে যুবক ছিলুম; বলতে পারেন, বেশ দুরন্ত যুবকই ছিলুম। কিন্তু আমি বহু চেষ্টা করেও মনে করতে পারছিনা, আমি কানো দিন কোনো কাহিনী চিত্রে যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Feature Film, তাতে—যৌবনকে খুঁজিবার চেষ্টা করেছিলুম। আমি বরাবরই চেয়েছি ছবিতে ভালো গল্পকে, ভালো নাটককে খুঁজতে, ভালো অভিনয় দেখতে।
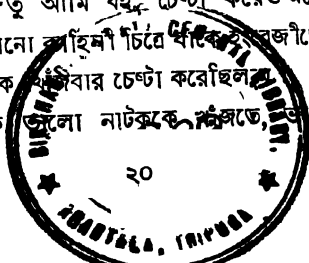
ধরুন, Romeo Juliet এ Romeo র ভূমিকায় প্রৌঢ় Leslie Howard কেও দেখে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর অভিনয়গুণে। কাজেই যৌবন খোঁজবার জন্য চলচ্চিত্র দেখা আমার কাছে একটা খুবই নতুন জিনিস। এতকাল Generation gap বলে একটা কথা শুনতুম বটে, কিন্তু ঠিক বুঝতুম না। এবার যেন বুঝতে পারছি কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ।

কিন্তু মজা এই, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক ছাত্রটির বাঙলা ছবি সম্পর্কে যৌবনহীনতার অপবাদকে যেন প্রচন্ড উপেক্ষা প্রদর্শন করেই বাঙালী দর্শকরা সম্প্রতি ভীড় জমিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র লিখিত "দত্তা" উপন্যাসের তৃতীয় বাঙলা চলচ্চিত্রায়নটি দেখবার জন্যে। অবশ্য এই ভীড় করার জন্য বেচারা দর্শকরা কয়েকজন অতি বুদ্ধিমান, চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে অতিরিক্ত সমালোচক দ্বারা নিন্দিত ও তিরস্কৃত হয়েছেন। বেচারাদের অপরাধ, তাঁদের মতে, এতদিন ধরে এত চলচ্চিত্র দেখবার পরেও চলচ্চিত্র জিনিসটা ঠিক কি, তা' তাঁরা বোঝেন না কেন? "দত্তা" ছবিটি যে শাস্ত্রমতে আদৌ চলচ্চিত্রই নয়, এ বুদ্ধি তাদের গজায়নি কেন? অবশ্য এরও ওপর আরও গুরুতর অভিযোগ ঐ অতিবিজ্ঞ সমালোচকদের আছে। শরৎচন্দ্র লিখিত "দত্তা" কাহিনীটি'কে এবং ঐ সঙ্গে তাঁর লিখিত সকল গল্প উপন্যাসকে আজকের দর্শক তথা পাঠকরা সহ্য করেন কি করে? "দত্তা"র প্রেমকাহিনী তো তিনি লিখেছেন মাত্র কোমলকান্ত রোমান্টিক মধুর রসসৃষ্টির জন্যে। বেচারা শরৎচন্দ্র! তিনি কেন "দত্তা"য় প্রেমকে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের সার্থক প্রেক্ষাপট ও মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করেননি, তার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। ১৯১৮ সালে "দত্তা" প্রকাশিত হবার সময়ে তিনি নাকি পাঠককে খুশী করার জন্য তাঁদেরই পছন্দসই চরিত্র বানাচ্ছিলেন। লোকরঞ্জনকর চলতি কালের সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী নির্মাণে ক্লান্তিবোধ করেন নি; কারণ ফরমাসের গড়া জিনিস বানাবার মাল-মশলা হাতে ছিল তাঁর প্রচুর।

কবি বলেছেন: অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ! এর এই রস নিবেদনের ঠাঁইটি যে মানুষের হৃদয়, তার মস্তিষ্কমাত্র নয়, এই তথ্যটি সম্ভবত উপরি-লিখিত বুদ্ধিজীবী সমালোচক প্রবরদের জানা নেই। তাঁদের হয়ত এ তথ্যও জানা নেই যে, শরৎচন্দ্র হচ্ছেন পৃথিবীর সেই বিরল লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম, যিনি তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশের দিনটি থেকেই যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন, সেই জনপ্রিয়তা তাঁর জীবিতকালে উত্তরোত্তর

বর্ধিত হয়ে তাঁর মৃত্যুর ৩৮ বছর পরে—তার জন্মের শতবর্ষ পরে একেবারে আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে এবং এই জনপ্রিয়তা মাত্র বাঙালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষিত সমাজ তাঁর মতো সাহিত্যিক জন্মগ্রহন করেছেন ব'লে ভারতীয় হিসেবে গর্ব অনুভব করেন। তাঁর হিন্দী জীবনীকার শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপ্রভাকর তাঁকে "আওয়ারা মসীহা" অর্থাৎ ভবঘুরে পরিত্রাতা নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, "শরৎচন্দ্র ভারতকে সবসে বড়া উপন্যাসকার থে, জিনকা সাহিত্য ভাষাকী সভী সীমাএঁ লাংঘকর সচ্চে মানোমে অখিল ভারতীয় সাহিত্য হো গয়া। উন্হে বঙালমে জীতনী খ্যাতি ঔর লোকপ্রিয়তা মিলী, উতনী হি হিন্দীমে তথা গুজরাতী, মলয়ালম্ তথা অন্য ভাষাওঁমে মিলী। উনকী রচনাএঁ তথা রচনাওঁকে পাত্র দেশ ভরকী জনতাকে মনোজীবনকে অঙ্গ্ বন গয়ে।" আমার জিজ্ঞাসা, এই ধরণের পরিচিতি আজ পর্যন্ত ক'জন সাহিত্যিকের অদৃষ্টে জুটেছে?

· সাহিত্যের সাময়িক জনপ্রিয়তা হয়ত তাঁর ভালোত্বের মাপকাঠি নাও হ'তে পারে। কিন্তু যদি কোন রচনা একাদিক্রমে অন্তত পঞ্চাশ বছর ধ'রে তার জনপ্রিয়তাকে শুধু অক্ষুণ্ণই রাখেনা, ক্রমবর্ধিত করে, তা হ'লে সে ক্ষেত্রে কি বুঝতে হবে? শরৎ জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পঞ্চাশ হাজার শরৎ রচনাবলীর গ্রাহকের অভাব তো হয়নি, বরং প্রকাশকরা পরে চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন।

শরৎ সাহিত্য অবলম্বনে গঠিত চলচ্চিত্রগুলির অভাবনীয় জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করুন। নির্বাক যুগের কথা এখানে তুলব না। কিন্তু ১৯৩১ সালে স্থাপিত নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ছবি "দেনা পাওনা" থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সালে তোলা "দত্তা" পর্যন্ত প্রায় যে পঞ্চাশ খানি ছবি উঠেছে বাঙলা ভাষায়, তাদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকখানিই আর্থিক সাফল্য-লাভে অর্থাৎ জনপ্রিয়তালাভে অসমর্থ হয়েছে। এবং এই অসাফল্যের জন্যে, আমি বলব, শরৎ সাহিত্য আদৌ দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছেন ঐ অসফল ছবির নির্মাতারা। কয়েকটি বাল্য রচনা ছাড়া শরৎচন্দ্র লিখিত প্রতিটি কাহিনীই কি চরিত্র-চিত্রণে, কি পরিস্থিতি-রচনায়, কি সংলাপগঠনে এমনই অনবদ্য যে, কাহিনীগুলিকে যদি যথাযথভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত করা যায়, তাহলেই তাদের সার্থকতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এই যে বললুম যথাযথভাবে 'প্রতিফলিত করা' এই কাজটি সামান্য নয়। আমার

প্রযোজিত ও পরিচালিত "স্বামী" ছবি দেখে বাঙলা চলচ্চিত্র জগতের একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী আমাকে বলেছিলেন, বাজে কিছু ঢোকাবার চেষ্টা না ক'রে শরৎচন্দ্রকে পাতার পর পাতা সাজিয়ে গেছেন—ভালো হবে না? আমি মনে মনে হেসেছিলুম বুঝেছিলুম ভদ্রমহিলা 'স্বামী' গল্পটি ভালো ক'রে মন দিয়ে পড়েনওনি। নইলে তিনি নিশ্চয়ই ধরতে পারতেন শরৎচন্দ্রের সৌদামিনী যেখানে স্বামীর হৃদয়হীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে গভীর রাত্রে স্বেচ্ছায় নরেনের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিল নরেন কোথায় নিয়ে যাবে, তা না জেনেই, আমি সেখানে ঐ বীতশ্রদ্ধ সৌদামিনীর স্বামীগৃহ ত্যাগের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খাড়া করেছিলুম। সৌদামিনী তার মায়ের বাড়ী পুড়ে যাবার খবর সংবলিত পোষ্টকার্ডটি যথাসময়ে তার হাতে না দেবার জন্যে স্বামীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। তাই মধ্যরাত্রে নরেনের সঙ্গে স্বামীগৃহ ত্যাগ করবার সময়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরেন তাকে তার মায়ের সেই পোড়া বাড়ীতে পৌঁছে দেবে। এই পরিবর্ত্তন আমি করেছিলুম, পাছে সাধারণ দর্শক স্বেচ্ছায় কুলত্যাগিনী সৌদামিনীকে ক্ষমা করতে না চায়, যদিও সদুর উদারচেতা স্বামী ঘনশ্যাম তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

ঠিক এই ধরণেরই ভুল করেছিলেন আরও দু'জন বিখ্যাত শিল্পী আমার পরিচালিত 'অরক্ষণীয়া' ছবিতে অভিনয় করবার সময়ে। আমার পরিচালিত অপরাপর ছবির মতো এই ছবিটিতেও আমার নিজের তৈরী সংলাপ অনেক ছিল। কিন্তু ঐ রকম একটি সংলাপ বলবার সময়ে একজন সুখ্যাতা অভিনেত্রী বারে বারে ভুল করছিলেন বলে তাঁর সহাভিনেতা—একজন প্রচুর নামকরা অভিনেতা তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "উহুঁ! ভুল করলে চলবেনা, এ যার তার ডায়ালগ নয়, স্বয়ং শরৎচন্দ্রের।" এবং ঐ বিখ্যাতা অভিনেত্রীটি তাঁর এই অমোঘ বাণী সশ্রদ্ধচিত্তে মেনেও নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি তাঁদের দুজনের এ ভুল ভেঙে দিইনি।

এই দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করলুম মাত্র এইটুকুই বোঝাবার জন্যে যে, শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে যথাযথ চিত্রিত করবার অর্থ হচ্ছে, তাঁর রচনার মূল ভাব, সারমর্মটিকে—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় spirit—ছবির মধ্যে এমন করে বজায় রাখতে হবে, যাতে প্রতিটি লোকেরই মনে হয়; হ্যাঁ, এটি শরৎচন্দ্রের রচনাই বটে, শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি ও বক্তব্য ঠিক ঠিক ফুটে উঠেছে ছবিটির

মাধ্যমে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র-সৃষ্টির মূল নীতিগুলিও মেনে চলতে হবে; যেমন, কাহিনীকে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে এমন ভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে কাহিনীটিকে গতিশীল মনে হয় এবং কাহিনী অন্তর্গত নাটকটিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে, যাতে দর্শকচিত্তে জাগ্রত উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে ছবির শেষের দিকে একটা তুঙ্গে উঠতে পায়। যেখানে তা হবেনা, সেখানে ছবি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ধরুন, আমারই পরিচালিত ছবি—মামলার ফল। এখানে শরৎচন্দ্রের কাহিনীর সারমর্মটিকে বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়নি। কারণ, আমার তৈরী চিত্রনাট্য শুনে বহু অভিজ্ঞ সপার্ষদ প্রযোজক বললেন, পশুপতিবাবু, কাহিনীটাকে Two mothers and a son এর গল্প ক'রে তুলুন, দেখবেন কি রকম Success হয়। জবাবে আমি বললুম, এই কাহিনীটা যদি Two mothers and a son এর Story হত, তাহ'লে শরৎচন্দ্রই তা করতেন; কিন্তু তিনি তা করেন নি, তিনি দেখিয়েছেন, একজন সৎমা যেখানে সপত্নীপুত্রকে নিজের ক'রে নিতে পারল না, সেখানে নিঃসন্তান জেঠাইমার অপত্যস্নেহ মৃত জায়ের সন্তানের প্রতি অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়ে "মামলার ফল" অর্থফলপ্রসূ হ'তে পেলনা।

বারে বারে, ফিরে ফিরে শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীগুলি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে; শুধু বাঙলাতেই নয়, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, মালয়লম প্রভৃতি ভারতের বহু ভাষাতেই। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে শরৎকাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রের অসামান্য জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ নিদর্শনের কথা আমাদের কানে এসেছে। বছর দুইয়েরও কিছু আগে অন্ধ্ররাজ্যের হায়দ্রাবাদের একটি চিত্রগৃহে তেলেগু ভাষায় তোলা "দেবদাস"- ছবিটির পুনঃ প্রদর্শন শুরু হয় রবিবারে মর্ণিং-শোতে। পুরোনো ছবির রবিবারের প্রাতঃ প্রদর্শনী সাধারণত দু'তিনটে রবিবারের বেশী চলেনা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তেলেগু "দেবদাস"-এর পুনঃ প্রদর্শনী চলেছিল পুরো একটি বছর—বাহান্ন সপ্তাহের বাহান্ন রবিবার। পুনঃ প্রদর্শনীর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান একটি অনন্য রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে।

শরৎচন্দ্রের রচনাগুলির মধ্যে, মনে হয়, বিপ্রদাস, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন এবং মহেশ ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য রচনাই সবাক চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হ'তে বাকী নেই। বিপ্রদাস রূপান্তরিত হতে পায়নি সুদীর্ঘ দিন

ধরে বইটির চিত্রস্বত্ব নিয়ে মামলা চলার ফলে, চরিত্রহীনেরও চিত্রস্বত্ব কোনও প্রযোজকের কাছে নাকি আটক আছে। মহেশকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার প্রতি অনেকের লোভ থাকলেও গরুকে দিয়ে অভিনয় করানো বেশ কিছুটা কসরৎ সাপেক্ষ ব'লে সহসা কেউ ওদিকে এগুচ্ছেন না। এবং 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল চরিত্রকে পর্দায় প্রতিফলিত করা রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার—তাই নয় কি?

সত্যিই 'কমল'-এর মতো চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে বিরল। 'একদিন যাকে ভালোবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়'—একথা যে নারীর মুখ দিয়ে বেরোয়, তাকে অনেকেই দূরে রাখতে চেষ্টা করবেন। কমল জোর গলায় বলে, "আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েচে এ মরেচে।"—এমন বলা যে মেয়ে বলতে পারে, তার অগ্নুজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকাতে আমাদের ভয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, শরৎচন্দ্র তো লিখেছিলেন যথার্থভাবে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশটা বছর। এবং তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা তো হয়েছে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামের চারপাশ, বিহারের ভাগলপুর, মজঃফরপুর ও তাদের সন্নিহিত অঞ্চল এবং বর্মামুলুকের প্রধানত রেঙ্গুন শহর থেকে। এবং তিনি তো নিজেই বলেছেনঃ এত বেশী আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা আর কারো লেখায় পাবে না।··বানানো গল্প লিখতে আমার মন ওঠে না। জীবনে যা দেখেছি, যা দেখে থাকি,—আমি তাই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চাই। —তাই, আশ্চর্য হয়ে ভাবি, কমলকে তিনি পেলেন কোথায়? এযে একেবারেই অনন্যা! আমাদের বাঙালীর ঘরের কথা ছেড়েই দি; পৃথিবীতে এমন কোন্ সমাজ আছে, যেখানে কমলের মতো মেয়ে মাথা তুলে শুধু ঘুরেই বেড়ায় না, পদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা সসম্মানে পূজিত হয়?

জানি, শরৎচন্দ্র যে-সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত লেখনী ধারণ করেছিলেন, সে-সমাজ আজ প্রায়শ অন্তর্হিত। তিনি অভয়ার মুখ দিয়ে যে-কথা বলিয়েছিলেন সে-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। আজ সেই সমাজ কোথায়, যে-সমাজ নারীর পান থেকে সামান্য চূণ খসাও সহ্য

করতনা, তার কঠিন শাস্তি বিধান করত। বাঙালী হিন্দু সমাজের বহু বিধানের বিরুদ্ধেই তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ; এমন কি—বাল্যবৈধব্যের বিরুদ্ধেও। তিনি বলেছেন : "যে লোকটা মারা গেছে, তারই স্মৃতি বুকে রেখে সংসারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বারব্রত, তপজপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে জীবনের রস-কষ, সমস্ত মধুকে পুড়িয়ে ভষ্ম ক'রে ফেলার মধ্যে যে কি বাহদুরি আছে, তা' আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। একটা মরে যাওয়া লোকের জন্য প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনকে মরুভূমি, নিষ্ফলা করতে হবে, এ-বিধানের কোনই অর্থ হয় না।" চোখের সামনে তিনি দেখেছেন, তাঁর বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টের বাল্যবিধবা ভগ্নী নিরুপমা দেবীকে কঠোর বারব্রত, তপজপের মধ্যে ডুবে থেকে সংসারের সহজ আনন্দের প্রতি মুখ ফিরিয়ে থাকতে। কত বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সাহিত্যের কমলবনে প্রবেশ ক'রে উত্তরকালে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখিকা হিসেবে খ্যাতিলাভ করতে।

শরৎচন্দ্র গত হয়েছেন ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছর আট-নয় মাস আগেই। তিনি ভাগ্যবান যে হিরোশিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোম ফেলার মনুষ্য সভ্যতাবিরোধী কাজ দেখেননি, দেখেননি মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের ফলে ৫০ লক্ষ বাঙালীর অপমৃত্যু, দেখেননি ১৯৪৬ এ ভারতে অনুষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান হত্যালীলা, দেখেননি তাঁর ভারত মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ এবং দেখেননি দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে কোটী কোটী মানুষের মনুষ্যত্বহীন হওয়ার চরম দুর্গতি। কিন্তু অপর দিকে দুঃখ রয়ে গেল যে, তিনি দেখে যেতে পারলেন না ভারত শাসনের ব্যাপারে যে ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের অন্ত ছিলনা, মনে ছিল অনির্বাণ জ্বালা, সেই ইংরাজকে শেষ পর্যন্ত ভারত ছেড়ে চ'লে যেতে হয়েছে, আর দেখে যেতে পেলেননা, যে বাঙালী হিন্দু সমাজের শত শত অনুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত লেখনী নিত্য গরল উদ্গিরণ করেছে, স্মার্ত রঘুনন্দনের কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ সেই বল্লালী সমাজ আজ কি শহরে, কি গ্রামে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, তার পরিবর্ত্তে সেখানে স্থান ক'রে নিতে চলেছে শাশ্বত মনুষ্য সমাজ, যা সকল বাধানিষেধের গন্ডী পেরিয়ে অদূর ভবিষ্যতে একটি উদার আন্তর্জাতিক রূপ নিতে চলেছে। অতি বুদ্ধিমান মস্তিষ্কসর্বস্ব সাহিত্য সমালোচকদের বিচক্ষণ মতকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই আন্তর্জাতিক সমাজসৌধের চূড়ায় বাঙালী, তথা ভারতীয় জনসাধারণ যে পতাকাকে উড্ডীন করবে, তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে শরৎচন্দ্র।

নতুন করে পেতে হলে

তপন সিংহ

প্রায় বিশ বছর আগে একটি ছবি দেখেছিলাম। নাইটস অব ক্যাবিরিয়া। পরিচালনা করেছিলেন ফেড্রিকো ফেলিনি। একটি বারবনিতার জীবন। ছবির শেষ দৃশ্য দেখতে দেখতে চমকে উঠেছিলাম। এ যে শরৎচন্দ্রের কথা! বারবনিতাটি চলেছেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দুঃখে দুঃসহ বেদনা বিধুর হৃদয়ে শান্তি-জল স্পর্শের জন্যে। হাজার হাজার মোমবাতি—দূরে পাহাড়ে আধো আলোয় গীর্জা—মৃদু ঘন্টাধ্বনি সর্বত্র সকাতর সকরুণ ব্যাপ্তি—শরৎচন্দ্রের সমাজে অনাদৃত, উপেক্ষিত বহু চরিত্রের সমাপ্তি যেমন কাশী বা বৃন্দাবনের পথে।

বাংলা ছবিতে শরৎচন্দ্রের অনুপ্রবেশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু অনুপ্রবেশ বললে ভুল হবে, বলা যায় আবির্ভাব। তার আগের যুগে বেশীর ভাগ ছবিতে দেখা যেত নারদ বেশে ইন্দুবালা আকাশ পথে উড়ে চলেছেন আর বীণাগঞ্জিত মঞ্জু ভজনে দর্শক হৃদয় রঞ্জিত হয়েছে। কিংবা চড়চড় করে ধরণী দ্বিধা হলেন এবং সীতা অন্ধকারের অন্তরেতে অন্তর্হিত হলেন।

শরৎ সাহিত্য বাংলা ছবির মোড় ঘুরিয়ে দিল। আর এমনভাবে বাংলা ছবির বুকের ওপর চেপে বসলো যে অর্ধ শতাব্দী গতান্তেও তার প্রভাব থেকে আজো আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আজ লড়াই তকরারের যুগ। এক-দিকে সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্ছবি অন্য দিকে সমান্তরাল সিনেমা। বাংলা ছবি শুধু সাহিত্যাশ্রয়ীই নয় একেবারে শরৎ-সাহিত্যাশ্রয়ী। বাঙ্গালী পাঠক এবং দর্শক এমনভাবে তাঁকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে যার নজির পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে শুনিনি। পৃথিবীর কোন সাহিত্যিকের মোট একান্নটি লেখার মধ্যে সাতচল্লিশটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এমন কথাও শুনিনি। একবার একজন প্রবীণ অভিনেতা একজন চিত্রপরিচালককে বলেন—'এই গরমে আর দাড়ি-টাড়ি পরিয়ে কেন কষ্ট দিচ্ছ ভাই। দাড়ি ছাড়াও তো রাসবিহারী হতে পারে। তাছাড়া রাসবিহারীর দাড়ি থাক বা না থাক ছবি তোমার

চলবেই। এমনকি তুমি যদি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে শরৎ-চন্দ্রের গল্পটি দর্শকদের পড়ে শোনাও তাতেও চলবে।' বেশীর ভাগ শরৎ সাহিত্য দিয়ে তৈরী ছবিগুলি উঁচুমানের হয়নি। প্রযোজক ভেবেছেন হাতে যখন শরৎচন্দ্র তখন খরচ বাড়িয়ে লাভ কি? পরিচালক ভেবেছেন বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন কি, যখন শরৎচন্দ্রের গল্প মানে গল্প এবং চিত্রনাট্য দুইই। কিন্তু মজা হলো এই নিচুমানের ছবি দেখার জন্যে নগরে গ্রামে হাটে গঞ্জে হাজার হাজার দর্শক ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একটিই নাম—শরৎচন্দ্র। এই নাম মাহাত্ম্যে আজকের বার বার তিন বারের 'দত্তা' সগৌরবে চলেছে দুর্বার গতিতে।

এই অসাধারণ সাফল্যের পিছনে আছে শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টি। চরিত্র-গুলি কতটা রক্তমাংসের তা হয়তো তর্ক সাপেক্ষ এবং তিনি হয়তো খুব কাছে থেকে অনুবীক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। একটু দূরে থেকে মমতা ভরা স্বপ্ন ঘেরা কাব্যিক সুষমামন্ডিত একটি মন অপার করুণা নিয়ে দেখেছেন, আঘাত করেছেন, ভালবেসেছেন, ক্ষমা করেছেন। বিহ্বল দর্শক সেই চরিত্র-গুলিকে অন্তরের অন্তরতম কোণে গ্রহণ করে শতধারায় অশ্রুবর্ষণশেষে নিজেকে গ্লানিমুক্ত করেছেন।

প্রেমের গল্পে দত্তা, পরিণীতা, অনুরাধা, গৃহদাহ, স্বামী প্রভৃতির চিরন্তন ত্রিভুজের তিনটি বাহু বাংলা ছবিকে তিন দিক থেকে বেঁধে রেখেছে। স্বভাবতই 'সমান্তরাল' এতে কুপিত। কিন্তু চিরন্তন ত্রিভুজের দাপটের কাছে সমান্তরাল এখনও স্তিমিত।

শরৎচন্দ্র তুরুপের তাসের মত কিছু চরিত্রের মিছিল দিয়ে গেছেন যা ভাঙ্গিয়ে বা যা নকল করে বাংলা ছবি বেঁচে আছে। যেমন কোনও আপন-ভোলা সৎপ্রাণ চরিত্র—বড়দিদির সুরেন্দ্রনাথ, বামুনের মেয়ের প্রিয়বাবু, বিন্দুর ছেলের যাদব প্রভৃতি। এই ধরনের চরিত্রের কত শত নকল যে বেরিয়েছে—শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, সাহিত্যেও তার হিসেব নেই। দেবদাস নিজেই তো একটা ইনস্টিটিউশান। একটি মেরুদন্ডহীন মদ্যপ যুবকের মৃত্যুতে একদিন আসমুদ্র হিমাচল বেদনায় বিমূঢ় হয়ে কেঁদেছে। এমন নজিরও আছে যে বহু বঙ্গপুঙ্গব নিষিদ্ধপল্লীতে গেছেন চন্দ্রমুখীর খোঁজে। চিরকালের পুরাতন ভৃত্য ধর্মদাস, রতন, বেহারী, আর একটি সংযোজন। নিরাসক্ত উদাসী নায়ক যাকে চট করে নায়িকার চোখে পড়ে এঁরা তো সবাই

শ্রীকান্তের অযোগ্য শিষ্য। নারী চরিত্রের কথা বলতে গেলে পিতামহ ব্রহ্মার মত পাঁচটি মুখের দরকার। যদি বলি আজ পর্যন্ত কোন অতি আধুনিক পরিচালকও কোন চরিত্রই তৈরী করতে পারেননি যা রাজলক্ষ্মী, বিজয়া, বিন্দু, মেজদিদি, অচলা, ভারতী, চন্দ্রমুখী, সবিতা, পিয়ারী বাঈজী, কমল, সাবিত্রী, কিরণময়ী প্রভৃতি আরো অজস্র চরিত্রের একটা না একটার সঙ্গে মিল আছে। এই নানামুখী চরিত্রের মিছিলের আবেদন বাঙালী ছাড়াও সর্ব-ভারতীয়দের মধ্যেও সমান। একজন ভারতীয় হিসেবে সবাই বোধহয় কোথায় যেন একটা একাত্মতা পান ; তাই দেবদাস, পরিণীতা, রামের সুমতি, মেজদিদি, গৃহদাহ হিন্দির বাজারে সমান ভাবে আদৃত এবং কত শত যে নির্লজ্জ অনুকরণ হয়েছে বা এখনো হচ্ছে তার হিসেব নেই।

এবার একটি কথা সবিনয় নিবেদন করতে চাই পাঠক নিজগুণে ক্ষমা করবেন। শরৎ সাহিত্য কি সত্যিই বিস্মৃত? তাহলে তাঁর জন্মের শতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সব নিঃশেষ কেন? কেনই বা শরৎচন্দ্রের বই-এর চলচ্চিত্র-স্বত্বর দাম আজও সব চেয়ে বেশী? এর একটিই যুক্তি—শরৎ-সাহিত্য বিস্মৃত নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, শরৎ-সাহিত্য নিয়ে ভাল চলচ্চিত্র তৈরী হয়নি, অন্ততঃ কিছু বুদ্ধিজীবী যাঁরা সিনেমাকে নতুন মিডিয়াম নিয়ে ভাবেন তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি। আমার মনে হয় নতুন আঙ্গিকে শরৎ-সাহিত্য নিয়ে নতুনভাবে কাজ করার অবকাশ আছে। ধরুন দেবদাস যদি আবার নতুন করে করা যায় যেখানে পার্বতী থাকবে না—দেবদাসের আত্মীয় পরিজন-বর্গ থাকবে না সমাজের কোন বাধাও থাকবে না শুধু থাকবে একটি সেট—চন্দ্রমুখীর বারোয়ারী ঘর। বহু মানুষের আনাগোনা—হঠাৎ একটি দুর্বল চরিত্রের ছেলে একদিন এলো। চন্দ্রমুখী নিজেকে নিঃশেষ করে তাকে সব কিছু দিল যদিও ছেলেটি আর একজনকে ভালবাসে—তারপর ছেলেটি একদিন চলে গেল। ধরুন আর একটি চরিত্রের কথা যাঁর নাম ব্রজবাবু, রেণুর বাবা। একজন পুরুষত্বহীন স্বামী। স্ত্রী সবিতা পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হয়েছেন। ব্রজবাবু কিন্তু সবিতাকে ভুলতে পারেনি। অর্থাৎ রেণুর বাবা রেণুর কুলত্যাগিনী মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ কি সত্যিকারের শ্রদ্ধা না নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার অকুণ্ঠ প্রয়াস। ব্রজবাবুকে নায়ক করে যদি একটি ছবি করা যায়? জানিনা একটি পুরুষত্বহীন মানুষকে নিয়ে, তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব, তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এদেশে কোন ছবি হয়েছে কিনা। আমার ইচ্ছে

'রামের সুমতি' নিয়ে একটি শিশুদের জন্যে ছবি করি। যেখানে রামের বদলে তার ভাইপো শিশু গোবিন্দ হবে নায়ক। বাড়িতে রামকে নিয়ে বড় তুফান অশান্তি সবটাই কিন্তু গোবিন্দের কাছে মজার ব্যাপার, শুধু মা যখন তাঁর দেওর রামের প্রতি বেশী স্নেহ দেখান তখন খুব হিংসে হয় খুব রাগ হয়—তখন সে শত্রুপক্ষের সেনাপতি দিদিমার দিকে যোগ দেয়। চরিত্রহীনের কিরণময়ীকে নায়িকা করে ছবি করলে কি রকম হয়? সতীশ, সাবিত্রী, উপেনের অতি নাটকীয়তা বর্জন করে নির্ভেজাল কিরণময়ীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্তর্লোকের সমীক্ষায় নতুন দরজা খুলে দেওয়া যেতে পারে।

হাটেমাঠে ঘাটে ক্যামেরা ঘুরিয়ে, আধো নীরব আধো নীরস শব্দযোজনা করে, আধা তথ্যচিত্রের নামে নতুন ধরনের ছবির দিন শেষ হয়ে এসেছে। পৃথিবীতে অতি আধুনিক ছবি হল চরিত্র সমীক্ষা—তাও নেগেটিভ ইনভেস্টিগেশন। জীবন শুধু সচেতনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বলে অবচেতন মনের সমীক্ষা নিয়েও কাজ চলেছে। এখন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শরৎ সাহিত্যের চরিত্রগুলির নতুন সমীক্ষা করলে কেমন হয়। ঝড় উঠবে, লড়াই তকরার শুরু হবে, সে তো ভালই! এটা তো তর্ক-বিতন্ডার যুগ।

শরৎচন্দ্র বনাম উত্তরকাল

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

এক

শরৎচন্দ্রের সহজ, স্বাভাবিক, বিস্ময়কর, প্রয়াসবর্জিত রীতি এবং তাঁর হৃদয়ের পরমাশ্চর্য অকৃত্রিমতা,—বোধ হয়, তাঁর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর সমকাল ও উত্তরকালের বাংলা কথাসাহিত্যের কথা ভাবতে গেলে পাঠকের মনে এই দুটি বৈশিষ্ট্যই সর্বাধিক মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণ গৌরবের মধ্যে বাস করে তিনি নিজস্ব যে স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন, তার তুলনা মেলে না। একথা ঠিকই যে, রবীন্দ্র-শরতের সমকালে আরো অনেক শক্তিধর গল্পকার ও ঔপন্যাসিক এসেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জুড়ি মেলে না। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে "শরৎচন্দ্রের উত্তরকাল" কথাটা আজো একটু 'অনির্দিষ্ট মনে হয়, কারণ, জগদীশ গুপ্ত বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব, অন্নদাশঙ্কর, প্রবোধকুমার সান্যাল ইত্যাদি অনেকেই রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সমকালীন। তাঁরা উত্তরকালীন নন। আরো উত্তরবর্তী জাতক যাঁরা, তাঁরাও শরৎ-উদ্দীপিত—বিচিত্রভাবে,—কেউ আনুগত্যে, কেউ বা প্রতিবাদে।

সতীনাথ ভাদুড়ী, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, সন্তোষ কুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য এবং আরো সব প্রিয় লেখক-লেখিকারাই বরং শরৎ-পরবর্তী। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীকেও শরৎ-পরবর্তী বলতে হয়, কিন্তু মনে-প্রাণে তিনিও তা নন। এইরকম আরো অনেক লেখক লেখিকার নাম মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, কিন্তু এই নিবন্ধের দায়িত্ব অন্য রকম। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী লেখকদের নামের তালিকা সরবরাহ করা এই রচনার অভিপ্রায় নয়। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস, সংস্কার, আশ্রয়বোধ বা নিরাশ্রয়তা, —তাঁর নারীর জগৎ, তাঁর পুরুষের জগৎ, তাঁর নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা, —তাঁর ভাষা-রীতি ইত্যাদি পরিস্থিতি থেকে নতুনতর পরিস্থিতির ব্যবধানের

দিকটিই বিবেচ্য—এবং সে-সবও এখানে যথাসাধ্য বীজাকারে প্রদেয়। এখানে সেই প্রয়াসই আসল কথা।

শরৎচন্দ্রের জীবনীর ব্যাপারে বিতর্কের অন্ত নেই। নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় তাঁর একাধিক নাটিকায় শরৎ-জীবন রূপায়িত করেছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, ইন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী প্রমুখ অনেকেই তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা জানিয়েছেন—তুলসীচরণ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এঁরাও তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন, তবে এঁদের শরৎ-প্রাসঙ্গিক খুব বিস্তৃত রচনা বিশেষ কিছু নেই। সুভাষ-চন্দ্রের প্রতি অশেষ স্নেহ ছিল তাঁর এবং চিত্তরঞ্জন দাশের গুণমুগ্ধ ছিলেন তিনি।

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যে শরৎ-সমালোচনায় প্রথম ও বিশেষ অধিকারী পথিকৃৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনের স্থূল-সূক্ষ্ম সব ঘটনা শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জানতেন না। তিনি একজন প্রতিভাধর, বহুপরিচিত অনতিজ্ঞাত-অন্তর্জীবনের মানুষ!

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় অনেকদিন থেকে শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনা খুঁজে খুঁজে দেখছেন। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের শরৎ-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড বইখানির শেষদিকে শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত
জীবনী ছাপা হয়েছে—যাতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর (৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩) তারিখে তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের কথাই বলা হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে দেবানন্দপুর গ্রামে প্যারীপণ্ডিতের (বন্দ্যো-পাধ্যায়) পাঠশালায় দু-তিন বছর অধ্যয়ন, তারপর দেবানন্দপুরেই সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য-এর ইস্কুলে প্রবেশ অর্থাৎ আনুমানিক আট বছর বয়সে ঐ দ্বিতীয় ইস্কুলে প্রবেশ ও সেখানে—কেউ বলেন "বছর তিনেক" কেউবা আরো একটু বেশি অর্থাৎ আনুমানিক চৌদ্দ বছর পর্যন্ত, সেখান থেকে পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়-এর নতুন কর্মস্থলে বিহারের ডিহিরির অদূরে শরৎচন্দ্রের মাতুলালয় ভাগলপুরের গাঙ্গুলী-বাড়ীতে অবস্থান এবং সেখানকার "দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে" ভর্তি হওয়া, অতঃপর—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তিতে উত্তীর্ণ শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের জেলা স্কুলে সেকালের সপ্তম শ্রেণীতে (একালের ক্লাস ফোর) ভর্তি হন বলা হয়েছে। একালের 'ক্লাস

'ফোর' কথাটি ঠিক নয়। একালে মানে কোন্ কালে? একালে যাকে 'ক্লাস ফোর' বলা হয়, সে কি প্রাথমিক শ্রেণীর ইস্কুলে বিদ্যমান? জেলা ইস্কুলে হয়তো তা ছিল এবং প্রাথমিক-শ্রেণীতে যাই থাক, সেকালের হাই-স্কুলের সর্বনিম্ন ক্লাস ছিল সাধারণতঃ অষ্টম শ্রেণী—এখন যার নাম 'ক্লাস থ্রী'। উত্তরোত্তর সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম শ্রেণীক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে পরিশেষে প্রবেশিকা দিতে হোতো সে-সময়ে।

শরৎচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সেভেনথ্ ক্লাস থেকে' ডবল প্রমোশন পেয়ে 'ফিফ্থ্ ক্লাসে' উঠেছিলেন—এ খবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয় জানতেন না, কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এসব কথা নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় দুর্গাচরণ এম, ই, স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইহার কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্রের পিতা সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কিছুকাল পরে ভাগলপুরে আবার তাঁহার পিতার ডাক পড়িল। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে টি; এন, জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইলেন। এখান হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে পরীক্ষাদানকালে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কুলে পড়িবার সময় ১৭ বৎসর বয়স হইতেই তিনি গল্প-উপন্যাসাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যসভাও পরিচালিত হইত। সভার মুখপাত্র ছিল 'ছায়া' নামে একখানি হাতে লেখা কাগজ।"

না, ভাগলপুরের স্কুলে ডবল প্রমোশনের কাহিনীটি গোপালবাবু কোন্ সূত্রে পেয়েছেন জানা যায় নি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিংবদন্তীবর্জিত জীবনী নেই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে তাঁর ১৫ বছর ৩ মাস বয়সের কথাও এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে অনুল্লেখিত। শরৎচন্দ্রের ছোট মামা বিপ্রদাস ভাগলপুরের মহাজন গুলজারীলালের কাছ থেকে টাকা ধার করে নাকি ইস্কুলের বেতন ও পরীক্ষার ফী-এর টাকা দিয়েছিলেন, এই খবরটুকুও পাওয়া গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ এসব দেন নি। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অর্থকষ্ট একটি সুপরিচিত সংবাদ। এই প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ

নিষ্প্রয়োজন। পিতা মতিলাল 'ঘরজামাই' বলে নিন্দিত হতেন, এ খবরও সুপরিচিত লোকশ্রুতি। অতএব নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই তাঁকে ভাগলপুরে কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল এবং অনেক কষ্টে সেই স্বল্পস্থায়ী কলেজ-জীবন পেরিয়ে দু' বছর পরে এফ, এ, পরীক্ষার ফী জমা দেওয়া গেল না বলেই তিনি স্কুল কলেজ ছেড়ে, মানুষের পরিণততর বৃহৎ জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কলেজ ছাড়ার আসল কারণ কী শুধু অর্থাভাব? অন্য কিংবদন্তীও শোনা যায়।

ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের কুমারবাহাদুরের প্রসঙ্গ তাঁর জীবনীর একটি বিশেষ স্মরণীয় তথ্য বলে মনে হোতো। উপেন্দ্রনাথ প্রমুখের বইয়ে এ-প্রসঙ্গের গুরুত্ব স্বীকৃত ব'লে মনে হয়েছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তিনিও জায়গা পান নি। তবে, সে ভাগলপুরের আডডার উৎসাহী সদস্য রাজেন মজুমদারের নাম আছে, কারণ রাজেন-ই যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় এসেছিলেন, সেকথা কি ভোলা যায়? শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই লেখক-শরৎচন্দ্রের মধ্যে এক ধরনের নিরাশ্রয়বোধ কাজ করেছে। আর্থিক কষ্ট, স্নেহের অভাব—প্রতিভার বিষাদ সবই ছিল। এসবের পূর্ণ বিবরণ কি সম্ভব? উত্তরকালের বাংলা কথাকারদল অল্পবিস্তর অনুরূপ অভিজ্ঞতার ফসল। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভাবজীবনের এ-মিল অবশ্যই ধর্তব্য। তবে কল্লোলের বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য অবশ্যই মসৃণতর জীবনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের জননী ভুবনমোহিনী দেবী লোকান্তরিতা হন। মতিলাল অতঃপর তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই ভাগলপুরেরই খঞ্জরপুর এলাকায় একটি মাটির বাড়িতে উঠে যান। হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলে শরৎচন্দ্রের বড়ো বোন অনিলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল তার আগেই। এই পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং ইতিমধ্যে ভাগলপুরেই শরৎচন্দ্রের কিছু কৈশোরক আকর্ষণ ঘটেছিল বিভূতিভূষণ ভট্টর বালবিধবা বোন নিরুপমা সম্বন্ধে। কিন্তু এই অতিপ্রচারিত ঘটনাটিও বিতর্কাতীত নয়। নিরুপমা তাঁকে কতোটা আকর্ষণ করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের আয়ুষ্কালের মধ্যেও সে বিষয়ে যেমন কিছু কিছু লোকশ্রুতি ছিল, পরেও তেমনি ঘটেছে—তবে তাঁর জন্ম শতবর্ষের আলোচনায় সে-প্রসঙ্গ একটু বেশি জোর দিয়ে বলা হয়েছে। রাধারাণী দেবী অনেক কথা

বলেছেন, যদিও অনুরূপা তাঁর জীবনের শেষদিকে এ-সবের প্রতিবাদ করেছিলেন।

নিরুপমার 'অন্নপূর্ণার মন্দির' শরৎচন্দ্র সংশোধন করেছিলেন। তবে নিরুপমা আমাদের লেখিকাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন বিশেষ শক্তিময়ী লেখিকা ছিলেন। তাঁর উত্তরজীবনের রচনাগুলিই তার প্রমাণ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য সেকালে অসম্ভব ছিল। উত্তরকালে সে ঘটনা তো ইতিহাসের অতিক্রান্ত প্রসঙ্গ। শরৎ-নিরুপমা রোমান্স উর্বর অলস মস্তিষ্কের কল্পনা বলেই আমার বিশ্বাস—যদিও রাধারাণী দেবীর মতামত সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অনস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের শুরুতেই লেখেন—'আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।' শরৎচন্দ্রের উপর তবু নির্ভর করা যায়—কারণ, নিজের জীবনের সব ঘটনাই তিনি জানতেন। নিরুপমাতেই তাঁর প্রথম স্মরণীয় নারী-পূজা ঘটেছিল, নাকি আরো আগে আরো দৃষ্টান্ত ছিল, সে সবই পৃথক পৃথক ব্যক্তির কল্পনা-অনুমান-কিংবদন্তীর ব্যাপার। তাঁর গভীর ভাবজীবনের ঢেউগুলি তিনি নিজে নিশ্চয় ভোলেন নি।

মজঃফরপুর থেকে তাঁর পিতৃবিয়োগের খবর পেয়ে ভাগলপুরে ফিরে অকস্মাৎ একদিন তিনি কলকাতায় চলে আসেন। তারপর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বর্মায় চলে যান।

তখন পর্যন্ত জীবনের যে অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে বস্তুদৃষ্টি তীক্ষ্ন হবার সুযোগ কম ছিম না, মমতার তৃষ্ণাও ছিল, নারীর মাধুর্য এবং রিক্ততা দুই-ই তাঁর অনুভবে এসে থাকা স্বাভাবিক এবং ভাগলপুরের আদমপুরে ক্লাব আর কুমার-বাহাদুর তাঁর সৌখীন শিল্পী-মনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

এই স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে, যথার্থ কোনো তীব্র নারীসঙ্গের আশ্রয় না পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পী-মনেরই আশ্রয় সন্ধানে এবং জীবিকা ও সমাজসঙ্গের অনুসন্ধানে বর্মায় গিয়েছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস হওয়া অসংগত নয় এবং 'আশ্রয়' মানে যে গৃহসুখ নয়, 'ভবঘুরে' শরৎচন্দ্রের সে-বিষয়ে পূর্বসংস্কার আরো সুদৃঢ় হয়। তাঁর সাহিত্যের যে দিকটাতে 'আধুনিকতা', সে দিকটা এই নিঃসঙ্গতার গভীর ও অনিবার্য তাড়না।

কষ্ট,—গৃহসুখবিমুখতা, নারী-হৃদয়ের প্রতি আকর্ষণ ও সংসারের বন্ধনের প্রতি অনীহা,—সামাজিক ও ব্যক্তিক ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর বিভিন্ন বৈষম্যের বোধ—এইসব দিক তাঁর অনুজ বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর প্রতিকৃতি বা 'ইমেজ'-এর কাজ করেছে। কী ভাষায়, কী লিখনভঙ্গিতে তাঁর জীবন-নিরীক্ষার অকৃত্রিম সরসতা যে পরমাশ্চর্য প্রসাদগুণে চিহ্নিত, তার অভিব্যক্তি যতোটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাদীপ্তিতে এবং যতোটা তারাশঙ্করের মধ্যেও ততোটা মোটেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর রীতিতে ঘটে নি। কল্লোলের খ্যাতনামাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালই ভাষাভঙ্গির দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অল্পবিস্তর সন্নিহিত ছিলেন। এই মন্তব্য অাপ্তবাক্য নয়।

দুই

১৮৭৬ থেকে ১৯৩৮ এই বাষট্টি বছরের আয়ু নিয়ে এসেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত সাহিত্যসম্রাট। তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তখন প্রকাশ-আসন্ন। 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি রচনায় দেশের দুরবস্থার কথা তিনি নানাভাবে বলেছেন। ১৮৭৫-৮০র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখাগুলি বেরুতে আরম্ভ করে। শরৎচন্দ্রের জন্মের বছর যোলো আগেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বেরিয়ে গেছে। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক, আইন-কানুন ইত্যাদি আরো আগেকার ঘটনা। দেশে ব্যাপক শিক্ষার অভাব, শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে উদ্যমহীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার দৈন্য ইত্যাদি পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই চলছিলই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম এবং আরো অনেকে দুঃখের চেহারা দেখেছেন এবং সে দুঃখ দূর করার উপায় ভেবেছেন, লিখেছেনও। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জাতিভেদ, মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা এবং সর্বাধিক দুঃখ পরাধীনতার গ্লানি—এই সবের মধ্য দিয়েই এগুতে হয়েছে তখনকার প্রতিভাধর লেখক, কবি, শিল্পীকেও।

তার অনেকদিন পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'শ্রীকান্তের' ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, সে-বইয়ের ভূমিকায় টমসন সাহেব শরৎচন্দ্রের এক আত্ম-পরিচয়মূলক বিবৃতি ছাপেন—যার বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছিল ১৩৪৪ সালের

'বাতায়ন' পত্রিকার শরৎ-স্মৃতি সংখ্যায়। সেই লেখাটির প্রথম তিনটি বাক্যেই শরৎচন্দ্রের শৈশব ও যৌবনের দুর্দশার উল্লেখ ছিল—"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি।" তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তো বটেই, দেশের দুঃখের কথা এবং দেশগঠনের নানা চিন্তা তাঁর 'নারীর মূল্য' (১৩৩০), 'তরুণের বিদ্রোহ' (১৯২৯), 'স্বদেশ ও সাহিত্য' (১৩৩৯), প্রভৃতি সন্দর্ভগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসে বিশেষভাবে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী সন্ত্রাসবাদীদের কথাও সুপরিচিত। 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬) ইত্যাদি কাহিনীতে তিনি দেশ, সমাজ, ব্যক্তিজীবন—তিন ক্ষেত্রেই দুঃখের খুবই বাস্তব গ্রন্থিগুলি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'রামের সুমতি' কে না জানেন? 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে কথাসূত্রে তিনি লেখেন—"রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোনো সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়েইর সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশি আর কিছু করবার আমার নেই।"

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে কমললতা আর গহরের কথা প্রসঙ্গে এই সংলাপটুকু মনে পড়েঃ

"কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠোনে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না।"

বৈষ্ণবী কহিল, "না।"

এবং তারপর কমললতার উদ্দেশ্যে শ্রীকান্তর এই উক্তিটি :

"কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাসা করচ না।"

একই সূত্রে মনে দেখা দেয় তাঁর 'দেনা-পাওনা'র (১৯২৩) এককড়ি, মগের-সর্দার, শিরোমণি, তারাদাস ঠাকুর, জীবানন্দ, ষোড়শী, জনার্দন রায়, নির্মল, হৈম এবং পুরো চণ্ডীগড় গ্রামখানি। এবং সেই শেষ প্রহরের সংলাপঃ

"জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা?

তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ ?"

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল; "পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।"

তিন

তাঁর 'বাল্যস্মৃতি'র গদাধর ঠাকুরকে দেখতে পাই। সেজদাদা পঞ্চাশ-ষাট টাকা দামের একটা ল্যাম্প কিনে এনেছিলেন। কৌতূহলবশে সেটি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেই সেজদাদার ছোটভাই সেটার কাঁচের চিমনি ভেঙ্গে ফেলে; কিন্তু সমস্ত অপরাধের দায়ী হতে হয় গদাধর ঠাকুরকে। মেজদাদা, সেজদাদা সকলেই বিমুখ হয়ে নিরীহ গদাধরকে বরখাস্ত করে দেন। শরৎচন্দ্রের সেই স্মৃতির শেষ কথাগুলি এই ছিল ঃ "কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরীব গদাধর ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।"

অচিন্ত্যকুমার দু'একটি ক্ষেত্রে এই দরদের প্রতিধ্বনি ঘটিয়েছেন তাঁর রচনায়,—বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ক্ষেত্রেই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু শরৎ-পরবর্তীদের অধিকাংশ কথা-সাহিত্যিকই ঠিক এরকম সরল দরদের শিল্পী নন। তাঁদের সমবেদনা আন্তরিক, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদের রীতি আরো শিল্পিত বিদ্রূপ-বিরক্তি-চিহ্নিত। শরৎচন্দ্রের বুকের শুধু আধখানাই নয়, তাঁর সমস্ত বুক জুড়ে বিদ্যমান ছিল তাঁর স্বদেশ ও সাহিত্য। ১৩২২ সালে 'নারায়ণ' পত্রিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অশেষ গুণগ্রাহী এই শরৎচন্দ্রই মহাত্মা গান্ধীর চৌরি-চৌরার পরবর্তী আন্দোলন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে লেখেন—"সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকালবিলম্বে দিল্লীর নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, "I have lost all fear of man"—জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।" দেশের নেতাকে দেশের দুঃখ দূর করার তপস্যায় মগ্ন থাকতে হয়—এবং দেশগঠনের যথার্থ

উদ্যম কাজে, ব্যবহারে, পরিণামে সর্বনিয়োগ উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সার্থক হয়। তাঁর এই বিশ্বাসই তিনি তাঁর 'মহাত্মাজী' নামে সেই নিবন্ধে লেখেন। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না—বিবেকানন্দের এই উক্তিরই উদাহরণ দেখেছিলেন তিনি গান্ধীজীর মধ্যে। তাঁর এই মন্তব্যটি তাই স্মরণীয়ঃ

"কোন দেশ যখন স্বাধীন সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয় না, স্বদেশপ্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়তো চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে তখম ঢিলাঢালা কর্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতায় অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয়,—কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়—সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, —সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিতে হয়।"

রাজনীতি, সমাজসেবা, পল্লী উন্নয়ন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় তাঁর আগ্রহ প্রবাহিত হয়েছিল। সংস্কার ও প্রগতির দায়িত্ব তিনি মননগুণে মেনেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিক্ষমতায় সে-সব অভিজ্ঞতা স্বাদু রচনায় পরিণতও হয়েছে। তবে গঠনের জন্যই ধৈর্য দরকার, যুগান্তরে পেঁছোবার জন্যেই সহিষ্ণুতা চাই —এ বিশ্বাসও তাঁর বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

সমাজে মানুষকে তিন রকম শাসন-পাশ মেনে চলতে হয়, একথা তাঁরই কথা, "প্রথম রাজ শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে তাহারই শাসন।" তিনি এই তিন পাশকেই মেনেছেন, মানতে বলেছেন। তবে তাঁর কথায়, "রাজার আইন রাজা দেখিবেন সে আমার বক্তব্য নয়।" কিন্তু সামাজিক আইনে ভুলচুক সংশোধন করার, গঠনমূলক কর্তব্য তিনি সর্বদাই মেনেছেন। এবং বারবার যথোচিত ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে ভোলেন নি। মানুষের প্রতি অসীম মমতাই তাঁর পাথেয় ছিল এবং মানব-সম্পর্কের সমুচিত বোঝাপড়ার দিকে কোনো রকম আলস্য বা ক্লান্তি তিনি বরদাস্ত করতে নারাজ ছিলেন। দেশের দুঃখ এবং

ভবিষ্যতের প্রগতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ এই চিন্তাটুকু এখানে এই সূত্রে তুলে দেখা যায়—

> "সেই সময়ের বাঙলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিভক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির (অর্থাৎ উনিশ শতকের গোঁড়া হিন্দুসমাজের কোনো কোনো আচারের) আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোনো কাজেই লাগিল না। দেশ তাহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ বলিয়া ম্লেচ্ছ খৃীষ্টান মনে করিতে লাগিল।"

না, শরৎচন্দ্রকে যতোটা ব্রাহ্মবিদ্বেষী মনে করা হয়, তিনি তাও ছিলেন না। তাঁকে যতো বিপ্লবী-ঘেঁষা মনে করা হয়, তাও তিনি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার, চেয়েছিলেন গঠন, চেয়েছিলেন প্রগতি। এবং রসসাহিত্যের বাহনে সেই স্বাক্ষরই তিনি রেখে গেছেন। উগ্রতা তাঁর সাহিত্যিক চরিত্রে ছিল মনে করাটাই কষ্টকল্পনা। উত্তরকালে বা তাঁরই সমকালে যাঁরা উগ্রপন্থী হন, শরৎচন্দ্রকে তাঁদের সর্বৈব নেতা মনে করাও কষ্ট-কল্পনা। তিনি তাঁর অন্তর্জীবনে কখনোই কোনো কূটনীতির সেবক ছিলেন না।

চার

মৃত্যুর বছর চারেক আগে,—'শেষ প্রশ্ন' বই হয়ে বেরিয়ে যাবার পরে—২৮এ পৌষ, ১৩৩৮ অর্থাৎ ১৯৩২ খৃীষ্টাব্দের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের এক চিঠিতে অমল হোমকে শরৎচন্দ্র লেখেন যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও কবিতা দুই-ই তিনি পড়েছেন অনেকবার,—পড়ে খুশি হয়েছেন—এবং—"আমার চাইতে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে, আমার চাইতে কেউ বেশি মকসো করেনি তাঁর লেখা।"

আবার আরো বছর চারেক পরে ৩রা মাঘ ১৩৪২ তারিখে শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে তিনি লেখেন—রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর চেয়ে বড়ো ঔপন্যাসিক, সে বিষয়ে তার নিজের মন ছিল সংশয়হীন—"নিজের মন ত জানে এ সত্য, পরম সত্য।" এবং একথাও জানান যে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তিনি নিজে যৌবনে

যে দু'একটি মন্তব্য করেছিলেন, সে তাঁরই ভ্রান্তি মাত্র—"যৌবনে এক-আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে (আক্রমণ) করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে করেছিলাম।"

এই চিঠির প্রায় এক বছর আগে ৩রা মাঘ ১৩৪১ তারিখে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়কেই তিনি আর এক চিঠিতে লেখেন—"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি।"

এই সব চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আনুগত্য এবং অভিমান দুইই প্রকাশিত হয়। অভিমানের অংশগুলি অপ্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃতিগুলি থেকে এখানে বাদ দেওয়া হোলো। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার কাছাকাছি সময়ে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর নিজের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথাও তিনি উল্লেখ করেন—যেমন লেখেন,—"চোখের বালি (সম্বন্ধে) তাঁর নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বউ। তাঁকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই।" এ চিঠির এই অংশ থেকে মনে হতে পারে—এ তাঁরই নিজের ধারণা, কিন্তু পাঠককে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, মোটেই তা নয়, শরৎচন্দ্র তখনকার সম্ভাব্য লোকধারণার কথাই অনুমান করেছিলেন।

পাঁচ

বিষয়বস্তু বা জীবনাভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সততা (honesty) পালন করার দায়িত্ব যে অনস্বীকার্য, সেকথা শরৎচন্দ্র বারবার জানিয়ে গেছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিষয়বস্তু, এবং শিল্পরীতি, এ-দুটি ব্যাপার আলাদা প্রসঙ্গরূপে বিভাজ্য নয়। ধরা যাক্, 'শেষ প্রশ্নে'র চব্বিশের অধ্যায়ে কমল যেভাবে, যেসব হ্রস্বদীর্ঘ কথোপকথনের ধারায় আশুবাবুকে বলে বসে—"শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাতে সংসার এমনি ভেঙে পড়ে। তাই অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী,"—সেই পুরো পরিস্থিতিতে সম্ভাব্যতা বজায় রেখে ঘটানো হয়েছে কিনা,—বস্তুসত্য ও প্রকাশকলা সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতা কমল প্রকাশ করেছে, তা কবির ভূয়োদর্শনের মতোই মাননীয়, কিন্তু বাস্তব জীবনের দেশকালগত সম্ভাব্যতা ও-ক্ষেত্রে কি সমুচিত হয়েছে? সত্য হলেও এরকম কথা কি কোনো সাধারণ

শিক্ষিত রুচিশীলা বাঙালী মেয়ের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল? বাহবা আর বাস্তবতা কি সমার্থক? রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' উপন্যাস নয়, সেটি এক সুপরিচিত, চমকপ্রদ গল্প; কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে কমলের মুখ দিয়ে যেসব পরিস্থিতিতে যেসব কথা বলানো হয়েছে তার মর্মবাণী যা,— 'স্ত্রীর পত্রে'র স্ত্রীজাতির বেদনার সঙ্গে তার কি খুব একটা পার্থক্য আছে? এবং 'স্ত্রীর পত্র' সম্পূর্ণ সম্ভাব্যতা-অনুসারী, 'শেষ প্রশ্ন' ঠিক সম-অনুপাতে তা নয়, – এ অভিমতেও সুধী সমাজের নিশ্চয় আপত্তি হবে না?

এই রকম আরো অনেক নিদর্শন ব্যবহার করা যায়। এসব প্রসঙ্গে অল্প-বিস্তর তর্ক-বিতর্কও ঘটা স্বাভাবিক। ঠিক কোন্ চরিত্র বা কোন্ পরিস্থিতি কতোটুকু এবং কোথায় কোথায় অবাস্তব হয়েছে, সেরকম বিশ্লেষণের প্রয়াস দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি সম্বন্ধে আলোচনা আরো সংক্ষেপে আরো বীজাকারে পরিবেশিত হলে সাধারণ পাঠকের সুবিধা হয়। সেই সূত্রটি কী? শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পরীতির ব্যবধান বা অন্য কোনো লেখকের সঙ্গে অন্য কোনো লেখকের ব্যবধান ঠিক কোনো বিশেষ ছাঁচে ফেলে দেখানো কি সম্ভব? তা যদি না হয়, তাহলে শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পের রীতিগত বিশেষত্ব কোন্দিক থেকে কোন্ কোন্ সূত্রে নির্ণয়-যোগ্য? উত্তরকালের সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের ব্যবধানের দিক থেকেও তা বিবেচ্য।

ধরা যাক্ আধুনিকতার কথা। শরৎচন্দ্রের বিষয়বস্তুর মতো শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতিও কি ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে গেছে? আমরা জানি, আমাদের সমাজ বদলে গেছে। কিন্তু এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, তবে প্রশ্ন যখন জাগে, উত্তরও তখন দেখা দেয়। টমাস ম্যান যে-রীতিতে তাঁর উপন্যাস লিখেছেন, জেম্স্ জয়েস সে-রীতিতে লেখেন নি। কিন্তু উভয়েই অনুরাগী পাঠকের ঔপন্যাসিক। একজন সমালোচক বলেছেন, জেম্স্ জয়েসের 'ইউলিসিস' পড়লেই বোঝা যায় যে, চেতনাস্রোতের অভিব্যক্তি ব্যাপারটি তাঁর ক্ষেত্রে মোটেই স্টাইলঘটিত কায়দা নয়। — "It is itself the formative principle governing the narrative pattern and the presentation of character."

এই মন্তব্যের ইঙ্গিত ধরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও তার বিষয়বস্তু ও শিল্প-রীতির অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের দিকটি ভাবতে ইচ্ছা করে। যাঁরা তাঁকে বিষয়বস্তুতে ও রীতিতেও অনাধুনিক অথবা এই দুইয়ের যে কোনো একটিতে,— (বলা

বাহুল্য, প্রথমটিতেই) অনাধুনিক মনে করেন, তাঁরা অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যটি দেখলে খুশি হবেন—শ্রীকুমারবাবুর কথায়—

> "শরৎচন্দ্রকে বিচার করিতে হইবে শুধু চরিত্রপরিকল্পনার অবাস্তবতার মানদন্ডে নয়, তিনি যে উপলক্ষ্য খানিকটা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কতটা সদ্‌ব্যবহার করিয়াছেন শেষ পর্যন্ত তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে। ভাববিলাস, অতিকথন-প্রবণতা ও সময় সময় হৃদয়-সংঘাতের অপরিমিত বিস্তার প্রভৃতি ত্রুটি শরৎ-সাহিত্যে আবিষ্কার করা দুরূহ হইবে না। ইহা বাঙালী চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য ও বাঙালী ঔপন্যাসিকও কতকটা এই জাতীয় প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া পারেন না।"

শ্রীকুমারবাবুর এই আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণেই এদিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। আবেগ আমাদের জাতীয় প্রকৃতি। অল্পবিস্তর সব বাঙালী ঔপন্যাসিকের স্বভাবেই তা আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটু বেশি ছিল। তাঁর সমকালীন নবতর যুগের আবেগ-প্রকৃতি একটু অন্য ধরনের মাত্র।

ছয়

১৩৬৯ সালের 'সাহিত্যের খবর' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক পরিচিতির পুনর্বিচারসূত্রে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন—(১) তাঁর উপন্যাসে জীবনসত্যের অভাব দেখা যায়। (২) অতিরিক্ত ভাবালুতাই তাঁর প্রকৃতি, (৩) স্ত্রী-পুরুষের যথার্থ চিরন্তন জীবনসমস্যার প্রতি তাঁর নাকি মনোযোগ ছিল না ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের দত্তা, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন প্রভৃতি উপন্যাসের অনুরাগী পাঠক যাঁরা, তাঁরা আগেও এরকম ধারণা প্রকাশিত হতে যে না দেখেছেন, তা নয়। শরৎচন্দ্রের দেশ-কাল আজ আর নেই, সেকথাও মানতে হয়। তবু এরকম মন্তব্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অনুরাগী পাঠকের মন হয়তো প্রস্তুত থাকে না। সেজন্যে এসব ধারণার প্রতিবাদ অথবা এরকম মন্তব্য কেন্দ্র করে বাদানুবাদ ঘটাও স্বাভাবিক। অরুণবাবুর মন্তব্য নিয়েও পূর্বোক্ত সময়ে তাই ঘটে।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ-সাহিত্যের সমালোচনাসূত্রে অনেক

প্রশংসার কথা লিখেছিলেন। অরুণবাবুর এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে ঐ বছরের শারদীয়া 'গল্পভারতী'তে শ্রীকুমারবাবু একটি জবাব দেন। তাঁর সেই প্রবন্ধটির নাম ছিল—'উপন্যাসের পুনর্বিচার'। অরুণকুমারের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে অরুণকুমার—"মানবসত্তার সমাজবন্ধনাতীত, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমাতিসারী এক অতীন্দ্রিয় রূপকল্পনাই ঔপন্যাসিকের নিকট প্রত্যাশা করিয়াছেন।" তিনি তাঁর অভ্রান্ত প্রত্যয়যোগে জানান—"চিন্তা কর্ম ও আচরণের মধ্যে আভাসিত, পারস্পরিক সংঘাতের দ্বারা বিশেষত যে চরিত্র-পরিচয় আমরা ঔপন্যাসিকের নিকট পাইতে অভ্যস্ত ডাঃ অরুণকুমার তাহাতে তৃপ্ত নহেন"—এবং—"রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে যেমন মানবআত্মার শুভ্র নিরঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ পরিচয়টি মাঝে মধ্যে উদঘাটিত হয়, তাহারই প্রতিরূপ যদি উপন্যাসে আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে ঔপন্যাসিকের সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। কবি ও ঔপন্যাসিকের বস্তু-উপাদান ও রূপায়ন-প্রণালী পৃথক।"

কবি ও ঔপন্যাসিকের রীতি ও আদর্শের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

> "কবি জীবনের ধারাবাহিক পরিচয় না দিয়া উহার কয়েকটি ভাস্বর বিন্দুতেই নিজ দৃষ্টি সংহত করেন। ঔপন্যাসিককে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার আবরণ ভেদ করিয়াই অন্তর-রহস্য উদঘাটন করিতে হয়। কবিসৃষ্ট চরিত্র আমাদের কল্পনা সমর্থনের দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসসৃষ্ট চরিত্র আমাদের ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতার সমর্থন না পাইলে সার্থকতা-বঞ্চিত হয়। মাঝে মাঝে উভয়ের মিলন সম্ভব। কিন্তু উভয়ের সর্বকালীন অভিন্নত্ব প্রত্যাশা করিলে আর্টের বিচিত্র পদ্ধতি হইতে যে রসবৈচিত্র্য আস্বাদন করা যায় তাহা দুর্লভ হইয়া পড়ে ও বিভিন্ন কলারূপের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত সীমারেখাটি অস্পষ্ট হয়।"

প্রসঙ্গতঃ চৈতন্যস্রোত, মনোবিশ্লেষণভঙ্গি ইত্যাদি আধুনিক উপন্যাস-রীতির প্রবণতাগুলি উল্লেখ করে তিনি লেখেন—

> "অতি আধুনিক যুগে ব্যক্তিত্ব-রহস্যের আসল উৎস লইয়াই আমাদের মৌলিক ধারণা বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। ফ্রয়েডের যৌনবাদতত্ত্ব, ভার্জিনিয়া উলফের চেতনা-প্রবাহতত্ত্ব ও জয়েসের অসংবদ্ধ, বিভিন্ন

স্তরবিন্যস্ত মানসক্রিয়ার সমকালীন স্ফুরণতত্ত্ব চরিত্রপরিচিতির মূল ভিত্তিকেই নাড়া দিয়াছে। বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বদৃষ্টিতে কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র উপাদান গঠিত অস্তিত্ব নাই, আছে শক্তিক্রিয়ায়। অবশ্য আমাদের ব্যবহারিক ধারণায় এই উপাদানভেদবিলোপী তত্ত্বের প্রভাব এখনও পড়ে নাই। সেইরূপ মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত চিন্তার ফলে এখন সত্তারহস্যের কেন্দ্রবিন্দুই স্থিরতা হারাইয়াছে।''

সাত

'আধুনিকতা' এমন একটি শব্দ, এইদিক থেকেই যার যাথার্থ্য ধরা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—বাংলা উপন্যাসের ধারায় এই তিন প্রথিতযশা লেখকের শিল্পরীতিতে তথাকথিত 'আধুনিকতা' কোন্ অর্থে ধর্তব্য, এখানে সে বিষয়ে সত্যিই সহায়ক সংকেত পাওয়া যায়। শ্রী-কুমারবাবু জানিয়ে গেছেন যে, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্কট, জেন অস্টেন, ডিকেন্স, জর্জ এলিয়ট, এমিলি ও শার্লট ব্রন্টে প্রভৃতি লেখকরা—ইংরেজি উপন্যাসের যাঁরা ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, তাঁরা—''মানুষকে সমাজ-প্রতি-বেশে ও ব্যক্তি-জীবনের নিভৃত অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া উহার জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।'' এবং—লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমরা জীবন সম্বন্ধে কোন নব-আবিষ্কৃত থিয়োরীকেই আমাদের বিচারের মূলসূত্র করিয়া না বসি। ঔপন্যাসিকের পক্ষে কোন নূতন জীবনতত্ত্ব জানা বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে কোন বিশিষ্ট সমাজবিধৃত ও নীতিনিয়ন্ত্রিত জীবনকাহিনীর মধ্য হইতেই উহার গম্ভীরতম তাৎপর্যটি নিষ্কাশিত করিতে পারেন।''

যেমন 'আধুনিকতা'র প্রসঙ্গ, তেমনি বহুপ্রচলিত 'জীবনবোধ' কথাটিও ভেবে দেখা দরকার। শ্রীকুমারবাবু সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি সজাগ করে দিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' সম্পর্কে তিনি লেখেন—''এরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেন ষোড়শীকে খাঁটি ভৈরবীরূপে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য লাগে।'' ষোড়শীর চরিত্র ভৈরবীর বৃত্তি-অনুসারী হয়নি, একথা ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য কোনো অভিযোগ হিসেবে মানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লাবণ্য (শিক্ষয়িত্রী), যোগমায়া (অভিভাবিকা), মতির মা (অশিক্ষিতা গৃহস্থবধূ), হলা মালী (বাগানের মালী মাত্র) যেমন,—ষোড়শীও তেমনি বিশেষ এক বৃত্তির জীব, এবং সেও মোটেই অসঙ্গত

চরিত্র নয়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্র সমাজ ও পরিবারজীবনের প্রাধান্যে অবস্থিত সেকালের বাঙালীর ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিমনের সার্থক নিরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। শিল্পীর শিল্পের প্রয়োজনেই তাঁকে 'খানিকটা কৃত্রিমভাবে' উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে হয়েছে। 'পরিবার ও সমাজে সদা-সংলগ্ন' তাঁর দৃষ্টি। এবং তাঁর পাত্রপাত্রী প্রধানতঃ বাঙালী বলেই—"ইহাদিগকে বাঙালী-জীবন-সংসক্ত করিয়া না দেখাইলে ইহাদের বাস্তবতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ক্ষুন্ন হইত।"

শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতির আলোচনায় এই সতর্কবাণী কি উপেক্ষা করা যায়? এবং উত্তরকালে আমাদের সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি অবিশ্বাস্যভাবে বদলে গেছে বলেই বোধহয় খুব সাম্প্রতিককালের যুবক-যুবতীর চোখে শরৎচন্দ্রকে বড়ো বেশী দূরবর্তী মনে হয়।

আট

শরৎচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে কতো যে জনপ্রিয় মহৎ শিল্পী ছিলেন, সে কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ইংরেজী উপন্যাসের বিশ্ববিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের নামোচ্চারণ করে থাকেন। ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর লেখকজীবনের প্রতিষ্ঠাকাল শেষ হয়ে গেছে,—সেই সঙ্গে তাঁর মরজীবনেরও পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। ১৯১২-১৩ হিসেবটা কল্পিত নয়। কারণ, ঐতিহাসিকেরা তো বটেই, এমন কি সেকালের তরুণ পাঠক কবি মোহিতলাল মজুমদারও লিখে গেছেন যে, ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া একনিঃশ্বাসে পূর্বোক্ত দুজনের সঙ্গে সমভাবে উল্লেখযোগ্য তৃতীয় কোনো প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক ছিলেন না। অন্ততঃ তরুণ-সাহিত্যিক-সমাজে শরৎচন্দ্রের নাম তখনো প্রায় অজ্ঞাত ছিল। 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তরুণ-সাহিত্যিকদের শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে দেখতে অনুরোধ করতেন। মোহিত-বাবু লিখেছেন—"তখন বোধহয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ—শরৎচন্দ্রের নাম তখন আমাদের তরুণ সাহিত্যিক-সমাজে অজ্ঞাত, যদিও ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকটি গল্প একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।"—এবং—"লেখকের নাম যেমন অপরিচিত, গল্পের নামও তেমনি সুসভ্য বা সুশ্রী নয়—"রামের সুমতী' ও

'বিন্দুর ছেলে' শুনিলে কিছুমাত্র ভক্তির উদ্রেক হয় না।" পাঠকমনের এই পূর্বস্মৃতির চিত্রপটে তাঁর 'কুন্তলীন'-পুরস্কার-চিহ্নিত 'মন্দির' গল্পটি উদিত হয়। এবং শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখে মোহিতলালের পাঠক-মন সেটিও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল।

বস্তুতঃ 'বিরাজ বৌ' ধরেই মোহিতলাল শরৎসাহিত্যে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। উত্তরোত্তর শরৎচন্দ্রের অন্যান্য বইও বেরোয়, মোহিতলালও তাঁর সম্বন্ধে আকৃষ্ট হতে থাকেন। শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনাগুলি জানতে চেষ্টা করেন তিনি। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে চাকরি করেন।

লোকমুখে শুনে এবং চিঠিপত্রে বন্ধুদের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের বিষয়ে যা যা খবর জানা যায় তাতে এইটুকু মোহিতলালের গোচরে আসে যে—"শরৎচন্দ্র একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, সাধারণ গৃহস্থ লোক নহেন—পশুপক্ষী লইয়াই তাঁহার সংসার—একদা তাঁহার একটা পোষা পাখি যখন মরিয়া যায়, তখন তাঁহার এমনই শোক হইয়াছিল যে তাহার পায়ে যে সোনার শিকলি ছিল, অন্ত্যেষ্টিকালে তাহা তিনি খুলিয়া লইতে পারেন নাই।"

প্রত্যেক মানুষই পৃথক ও বিচিত্র। লেখকরা তো অদ্ভুত ধরনের মানুষ, ঠিকই। কিন্তু পশুপ্রীতিতেই হোক, আলস্যেই হোক—অথবা অতিমাত্রায় কল্পনা-প্রবণতাতেই হোক্, শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত মন-মেজাজের মধ্যেই-অসাধারণ লেখক-সামর্থ্য বিদ্যমান ছিল। সেকালে শরৎচন্দ্র বৈঠকে বসতেন 'ভারতী'র আড্ডায়। মোহিতলাল সেখানে তাঁকে দেখেছেন। সে-সময়ে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি' গল্পটি নিয়ে 'ভারতী'র মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তর্ক শুনেছেন তিনি। মোহিতলালের কথাতেই পাওয়া যায়—"তিনি এই গল্পের নায়িকার চরিত্র কিছুতেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বাঙালীর মেয়ে ঐ বয়সেও ঐরূপ হৃদয়হীনা হইতে পারে না, ইহা তিনি জোর করিয়া বলিলেন—উহাতে বিশুদ্ধ ভাব-কল্পনার আর্ট যতই থাকুক, জীবনের সত্য নাই।" এই 'সত্য'-সম্পর্কিত সমস্যাটি বহুতলস্পর্শী সমস্যা! শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর উত্তরকালের দৃষ্টি এই দিক থেকে সমুচিত জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। উত্তরকাল কি তা ভেবেছেন?

হৃদয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। এবং 'ভারতী'র নানা সাহিত্য-আলাপে শরৎচন্দ্রের বিচিত্র আলোচনা শুনে মোহিতলাল বুঝেছিলেন—

"তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার নির্যাস নয়, প্রত্যক্ষদর্শনের নিঃসংশয় ধারণা।"

মোহিতলাল শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত অগ্রজ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের নাম করেছেন, কিন্তু যাঁরা সাহিত্যের ঐতিহাসিক, নামের স্মৃতি এবং তারিখের হিসেব তাঁদের মনে আর-এক ভাবে অটুট থাকে,—যেমন সুকুমার সেন মশাই 'প্রভাবে'র দিকে চোখ রেখে জানিয়েছেন যে, ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসের রচনা, যা বেরিয়েছিল ১৩২০ সালের মাঘ মাসের 'যমুনা'তে, শরৎচন্দ্রের সেই 'ক্ষুদ্রের গৌরব' এবং ঐ সালেরই ফাল্গুনের 'যমুনা'তে প্রকাশিত 'গুরুশিষ্য সংবাদ', দুটিই শরৎচন্দ্র বঙ্কিম-রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখেছিলেন। ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী'র অংশ-বিশেষও নাকি বঙ্কিম-প্রভাবিত। তাছাড়া, সুকুমারবাবু জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯) কথাও ভোলেন নি। তিনি বলেছেন—"পতিত নারীর পক্ষ নেওয়াতে জলধরকে আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বগামী মনে করিলে ভুল করিব না।"

কিন্তু এসব বিষয়গত বা উপলব্ধিগত সাদৃশ্যের কালক্রম ধরে যেসব মন চলতে অভ্যস্ত, তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনবোধে রসের আবেদন হয়তো উহ্য রেখে চলেন। জলধর সেন বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) পতিতার প্রতি সমবেদনা যতোই জানিয়ে থাকুন, তাঁদের কোনো রচনাই শরৎচন্দ্রের মতন নয়। অতএব সেকথা থাক্।

নয়

ডিকেন্স কি সত্যিই শরৎচন্দ্রের মতন মানুষ? তাঁরই মতন মনের অধিকারী? এই সব প্রশ্নও দেখা দেয়। উত্তরকাল টলস্টয়ের কথাও ভাবে, গোর্কির কথাও, ডিকেন্সের কথাও।

সুকুমারবাবু শরৎচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাব' অনেক দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও শরৎচন্দ্রকে তিনি সত্যিই এই মর্যাদা দিয়েছেন যে—"রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে আর কোন বড় গল্পলেখকের চারিত্র্যনীতিবোধ সাধারণ গতানুগতিকের অতিরিক্ত ছিল না।" তিনি বলেছেন, এদিকেও রবীন্দ্রনাথই পথ-প্রদর্শক,—শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি আলোচনায় 'সতীত্ব' সম্বন্ধে বেশ জোর দিয়ে তাঁর নিজের ধারণা প্রকাশ করেছেন।

এবং তথ্যসন্ধানে শরৎচন্দ্র যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। 'নারীর মূল্য' বইখানিতে তিনি যে হিসেব দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায়, বাংলার কুলত্যাগিনী রমণীদের শতকরা সত্তর জন সধবা, বাকি তিরিশটি বিধবা! আমাদের কারও মনে এ-সন্দেহ জাগতে পারে যে, অনাথা অ-নিপীড়িত বেশ কয়েকটি কুমারীও কি এঁদের মধ্যে ছিলেন না? উত্তরকালের চোখ এই দিকেও।

কিন্তু সে অন্য তর্ক। সেকথাও থাক্। ডিকেন্সের সঙ্গে তুলনায় তাঁকে পাশাপাশি রাখবার চেষ্টাটাই যদি কারও মনে তীক্ষ্ন হয়ে থাকে, তাহলে সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছে তার জবাব পাওয়া যায় না। তিনি শুধু চার্লস গার্ভিলের 'Leola Dale's Fortune' নামে এক উপন্যাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'দত্তার' কাহিনীগত মিলের উল্লেখ করেছেন। মোহিতলালের 'শরৎ-পরিচয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) প্রবন্ধটি পড়বার সময়ে পাঠকের মন উৎসুক হয়ে থাকে এই বুঝি ডিকেন্সের কথা উঠলো! কিন্তু না,—তিনিও তা বলেন নি। তিনি যা বলেছেন,—অন্ততঃ যে বাক্যটি ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সমধর্মিতার ভাবনা জাগাতে পারে, সেটি হোলো এই: "গত যুগের বাঙালীসমাজের একটি প্রাণগত পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রাণে-মনে সেই গত-যুগেরই বংশধর, তাঁহার রচিত সাহিত্যে আমরা একটি বিলীয়মান যুগের বাঙালী-সভ্যতা, বাঙালী-সমাজ এবং সেই সমাজের শক্তি ও অশক্তির যে মর্মান্তিক লিপিচিত্র পাইয়াছি, তাহাই বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছা করলেই কিছু চার্ট বা তুলনামূলক তালিকা দেখিয়ে ডিকেন্স-শরৎচন্দ্র সামীপ্য-দূরত্ব বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনিও তা করেন নি। তাঁর প্রসিদ্ধ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' বইখানির নবম অধ্যায়ে শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত আলোচনার প্রারম্ভেই তিনি শুধু ব্যাপকভাবে এই আলোকপাত ঘটিয়েছেন যে—"নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ন তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুন্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাহাতে তিনি বাঙালীর মনের সংকীর্ণ গন্ডি বহু দূর ছাড়াইয়া অতি-আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন।"

এই উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 'অতি-আধুনিক' শব্দটি নিশ্চয় ডিকেন্সের

কালকেও ধারণ করবে না ? ডিকেন্স কি অতি-আধুনিক ? তাঁর আয়ুষ্কাল গেছে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত। শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁর তিরোধানের বছর ছয়েক পরে। সে অন্য কাল।

তবে, জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ডিকেন্সের সাদৃশ্যের ভাবনা অমূলক নয়। কেম্বিজ-ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা আছে—

"Except Shakespeare and Scott, there is probably, no other English writer who can match him in this respect."

বাংলায় যে যাই বলুন, বঙ্কিমচন্দ্র অনেকের রুচিতেই চিরপ্রিয় এবং আমাদের স্বাধীনতার তারিখ থেকে অদ্যাবধি যতো উপন্যাস বেরিয়েছে, সে সবের চেয়ে শরৎচন্দ্র এখনো অনেক বেশি জনপ্রিয়। 'জনপ্রিয়তা' কথাটা কোনো রকম নাসিকা-কুঞ্চনের বাচক নয় মোটেই, এখানে কোনোমতেই তা নয়। পূর্বোক্ত সাহিত্য-ইতিহাসেই বলা হয়েছে—

"In fact, neither the uncritical nor the critical lover of Dickens ever tires of him, as both often do of some writers whom they have admired."

শরৎচন্দ্রের নিজের দেশ, নিজের কাল এখন আর নেই। বড়ো তাড়াতাড়ি বদলে যায় এই পৃথিবী! "এদেশে যেমন তেমন করেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষার অভাব হয় না। "চলো না গোঁসাই বেরিয়ে পড়া যাক্"—এরকম কথা এখন কি আর এদেশে শোনবার খুব একটা সম্ভাবনা আছে? তারাশঙ্কর বা সরোজকুমারের লেখাতেও এরকম আবহাওয়া কতকটা টিকে ছিল—সে তো মাত্র এই সেদিনের কথা। কিন্তু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে গত প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের সে-আবহাওয়া কি আছে আর?—পশ্চিম-বাংলার কোথাও আছে এসব? কমললতা, গহর, —রাজলক্ষ্মী, নিরুদিদি, অন্নদাদিদি—ওরা কেউ নেই আর! 'ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্তী পরিবার'—'নিষ্কৃতি' গল্পের এই প্রথম বাক্যটিই তো পুরাবৃত্ত এখন। হাওড়া জেলার গ্রাম ছোট বিষ্ণুপুর এখন আর সেরকম নেই নিশ্চয়। কোনো ভদ্রলোকের স্ত্রী তাঁর একমাত্র পুত্র পটলকে আর সপত্নীপুত্র কানাইলালকে বড় জার হাতে রেখে মৃত্যু শয্যাশায়ী পিতাকে দেখতে চলে গেলেন কৃষ্ণনগরে—এরকম পরিস্থিতি এখনকার বাংলার বাস্তব পরিস্থিতি নয়। বামুনের মেয়ে, শুভদা, বড়দিদি—এঁরা সবাই এখন শুধু স্মৃতিমন্দিরে

সংরক্ষিতা। এবং স্মৃতির চেয়ে বর্তমানের দাবি অনেক, অনেক তীব্র! শরৎচন্দ্রের যুগ তিরোহিত—যেমন টলস্টয়ের,—যেমন ডিকেন্সেরও।

তবু ডিকেন্সের মত শরৎচন্দ্রও আমাদের প্রিয় লেখক এখনো। হামফ্রে হাউস তাঁর ডিকেন্স-সম্পর্কিত আলোচনার মুখবন্ধে বলেছেন যে, ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি এখন ঐতিহাসিক দলিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, কেউ কেউ ইতিহাসের বই লিখতে গিয়েও ডিকেন্সকে অবিশ্বাস্যরকম খাতির করেন। শিশুদের মজুরিতে নিয়োগ—গ্যাস-সমস্যা, লন্ডনের যান-চলাচল ও কুয়াশা,—নতুন পুলিশ বাহিনী,—সরাইখানা,—রেলপথ,—পার্লামেন্টের নির্বাচন ইত্যাদি কতো যে ইতিহাসের প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে ডিকেন্সের উল্লেখ করতে হয়। ডিকেন্স ছিলেন মস্তো সমাজ-সংস্কারক—এই ধারণাটা চলছেই! শরৎচন্দ্রের বিষয়েও অধুনা আমরা কি সেইরকম কিছু ভাবছি এখনো? এই গতিশীল অধ্যায়ে মানুষের সমাজ প্রহরে প্রহরে বদলায়। আবার চিরন্তন মানবমনও তো আছে একরকম। শরৎচন্দ্র বনাম আধুনিকতা প্রসঙ্গে সেটাও বিবেচ্য।

নারীর নারীত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, দুইয়েরই অভিন্নতা অবশ্য—মনুষ্যত্বে—এবং মনুষ্যত্ব কি দেহ-মন-ধর্ম-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সব নিয়ে এক অবিমিশ্র সমগ্রতা ও স্বাতন্ত্র্যের গৌরবেই আশ্রিত নয়? শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের স্থান-কাল পরিচিতির দিকে কি আমাদের গবেষকরা সমুচিতভাবে উৎসুক হয়েছেন? স্থান-পরিচিতি, যাকে বলে, 'টোপোগ্রাফি'—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সে কাজ সমুচিতভাবে হয়নি, যদিও ডিকেন্স সম্বন্ধে অনেক হয়েছে। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সময়ের রঙ-রেখা, আলো-ছায়া,—সত্যিকার বাস্তব হাট-বাজার কি দেখা যায়? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু মোটেই সে রাজ্যে বাস করেন না। সুবোধ ঘোষও করেননি। তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধেয়, শক্তিমান, কিন্তু কেউই ঠিক কিন্তু শরৎ-বংশীয় নন।

শুধু তাই নয়, 'শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র', 'শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম', 'শরৎ-সাহিত্যে আহার', 'শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতি' ইত্যাদি গবেষণার বিষয় দেখতে দেখতে আজকাল চোখ জ্বালা করে।

শরৎ-সমালোচনার হাওয়া অন্যদিকে প্রবাহিত হবার সময় অনেকক্ষণ শুরু হয়েছে, কিন্তু আমরা কি আমাদের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, অন্তত ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে পাশাপাশি রেখে, খানিকটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করতে পারি

না ? ঋণ শোধ করতে না পেরে কারাবাসের ব্যাপারটা ডিকেন্সের একটা স্থায়ী ভাবনা ছিল—যা তাঁর নানা রচনায় দেখা দেয়। টাকার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে ডিকেন্সের নিশ্চয় একটা গভীর ক্ষতবোধ ছিল। বিবাহে অশান্তি এবং পতি-পত্নীর অসদ্ভাব তেমনি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ একরকম অসুখ বলা ধৃষ্টতা হবে না। তবু একথাও মানতে হবে যে, কেবল বঙ্কিমের ভ্রমর বা সূর্যমুখীর মতন নারী সমস্যাতেই তিনি আবদ্ধ থাকেননি। রবীন্দ্রনাথের বিমলা, দামিনী ইত্যাদি তাঁকে দুনিয়া-বদলে যাবার অভিজ্ঞতা দিয়ে গিয়েছিল একে একে—যখন তিনি নিজেও তাঁর ব্যক্তিমনের অধিকারিণীদের দেখেছেন, চিনেছেন—সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকুমারবাবু সে প্রসঙ্গটি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেনও বটে। কিন্তু শরৎচন্দ্র কি সত্যই আমাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসে স্মরণযোগ্য তেমন কোনো চিরস্থায়ী সাহিত্যিক দলিল রেখে গেছেন ? তাঁর 'দেনা-পাওনা' বা 'পথের দাবী' কি ইতিমধ্যে বাঙালীর এবং ভারতবাসীর বহতা অভিজ্ঞতার আলোতে রঙ্ বদলায়নি ? এক-একটা খণ্ডকালের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া সেণ্টিমেণ্টের স্বাদ যেমন স্বীকার্য, চিরন্তনী মানব-জীবন-জিজ্ঞাসাও তেমনি স্বীকার্য। ডিকেন্সের 'মিকবার' আজকের বিচ্ছিন্নতাবিদ্ধ, নৈরাশ্যজর্জর নগর-সভ্যতার এখনো হয়তো কোনো কোনো মনে কোথাও-না-কোথাও অম্লান আছে। শরৎচন্দ্রের কোন্ কোন্ নরনারী সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারি ? সুরেশ, কিরণময়ী, অচলা মিথ্যে নয়। কিন্তু শ্রীকান্ত কি বিচ্ছিন্ন মানুষ—নাকি দায়িত্বভীরু একজন সুখী ভবঘুরে ?

সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন। কিন্তু সুখ-দুঃখেরও মানে বদলে যায়। শরৎচন্দ্রের সময় থেকে 'কল্লোল'-এর লেখকদের সুখ-দুঃখ-বোধ বদলে গিয়েছিল তো বটেই। তা যদি ঘটে থাকে, তাহলে কতোটা বদলেছে—কোন্ কোন্ ধারায় ? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,—তারপর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু এবং আরো সব শক্তিশালী বাঙালী কথাসাহিত্যিক- শরৎচন্দ্রকে কে কতোটা ছুঁয়ে আছেন ?

উত্তরকালের সামনে এখন এইসব জরুরী প্রশ্ন।

□

রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্যের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, 'বড়দিদি', 'পণ্ডিত মশাই', 'পরিণীতা', 'মেজদিদি', 'বিরাজবৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'আঁধারে আলো', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব), 'নিষ্কৃতি', 'বৈকুন্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'চরিত্রহীন', 'কাশীনাথ', 'দত্তা'-র মত পরপর অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হয়ে মাত্র ৫ বৎসরের মধ্যেই শরৎচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুললো। ইতিমধ্যে ১৯১৬ খৃীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের বাস উঠিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র একই সহরে কাছাকাছি (জোড়াসাঁকোয় ও শিবপুরে) বিরাজ করতে লাগলেন, বিশ্বকবির প্রতিভা-জ্যোতিতে কিন্তু শরৎচন্দ্র আচ্ছন্ন হয়ে যাননি। কৈশোর থেকে মধ্যযৌবন পর্যন্ত শরৎচন্দ্র দরিদ্র, ভবঘুরে, ছন্নছাড়া জীবন যাপন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে মানুষ হবার সুযোগ তিনি পাননি। লেখাপড়াও তাঁর বেশীদূর এগোয়নি, মাত্র আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। মোটের উপর, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। তবু যে তিনি জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের পাশে একই সহরে মর্যাদার সঙ্গে সহ-অবস্থান করতে পেরেছেন, এ তাঁর পক্ষে মহা কৃতিত্বের ও গৌরবের কথা। রবীন্দ্রনাথের সমকালে শরৎচন্দ্রের সুবিপুল জনপ্রিয়তায় বিস্মিত হতে হয়।

শরৎচন্দ্র আমৃত্যু যশ ভোগ করে গেছেন, এখনও তিনি যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, তা তাঁর বইয়ের কাটতি এবং বিশেষ করে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীর উৎসব-অনুষ্ঠানের দেশব্যাপী আড়ম্বরের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের বহু লেখা নানা ভারতীয় ভাষায়,

এমনকি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সেসব পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন অসংখ্য লোক।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর চার দশক পরেও তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করলে একটা আশ্বাস অন্তত পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার নয়, লেখার গুণের জন্যই তিনি জীবিতকালে রবীন্দ্র-দীপ্তিতে ম্লান হননি এবং সেই গুণের জন্য মরণোত্তর দীর্ঘজীবন লাভও হয়তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

তবে, অমরত্ব না হোক, সত্যই যদি শরৎসাহিত্যের সুদীর্ঘ সম্মানিত জীবন নিশ্চিত করতে হয় তাহলে তাঁর রচনাবলীর পুনর্মূল্যায়ন অবশ্যই করতে হবে। যুগ পাল্‌টে যাচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের ফলে নানা নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, মানুষের চিন্তাজগতে এবং সাহিত্যরুচিতেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটছে। একথা অনস্বীকার্য যে, শরৎচন্দ্রের যে সব লেখা ঘরোয়া ও হৃদয়ভাব বা সিদ্ধরস কেন্দ্রিক, সেগুলির সঙ্গে এদেশবাসীর নরম মনের একান্ত ঘনিষ্ঠতা শরৎচন্দ্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকদের এই মানসিকতাও পাল্টে যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী আলোড়নের পর সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশেও ভাব-সংঘাত দেখা দিয়েছিল, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তা বিশেষ দানা বাঁধেনি এবং এখনও পুরানো দিনের ধারণা-ভাবনার প্রভাব এদেশে পাঠক মানসে কিছুটা বর্তমান। পুরানো বিচারবোধে শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু দিনকাল পাল্‌টে যাচ্ছে বলে আর বেশিদিন আমাদের দেশের পাঠকদেরও পুরানো মূল্যবোধে আটকে রাখা সম্ভব হবে না বলে অনেকে মনে করছেন। এঁদের মতে বাংলা কাব্যজগতে এই বিপ্লব ইতিমধ্যেই প্রবল শক্তি সঞ্চয় করেছে, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের একটা গভীর আগ্রহ ইতিমধ্যেই স্পষ্টত স্পন্দিত হচ্ছে। এ অবস্থায় শরৎচন্দ্রের অনুরাগী চিন্তাশীলদের অপরিহার্য কর্তব্য শরৎচন্দ্রের লেখার প্রচলিত বিচার পদ্ধতির প্রসার ঘটিয়ে মননশীলতার ও ক্রান্তদর্শিতার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের অধিকার সমকালীন জনমানসে মুদ্রিত করা। এতে সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণ অধিকতর আগ্রহবোধ করবে, যে সমস্যাগুলি অভ্যাসবশে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং যেসব সমস্যা আগামী দিনে অনিবার্যভাবে বড় হয়ে উঠবে, সেগুলি সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র কতটা

সঁচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন বা তাঁর লেখায় সেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে কতখানি স্থান পেয়েছে, তার উপরও যত্ন করে আলোচনা করা হবে। শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রের আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে, এই সময় যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাঠক-সমাজ শরৎসাহিত্যের পুনর্মূল্যায়িত পরিচিতি অনুধাবন করে, তাহলে আপন নিহিত গৌরবেই শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবী হবেন। আধুনিক কালের দাবীর সঙ্গে শরৎসাহিত্যের যোগ আছে, আধুনিক কালের বিচিত্র সমস্যাপীড়িত মানুষের কাছেও শরৎচন্দ্র বাতিঘরের মত, একালের মানুষও শরৎ-চেতনার সংশ্লেষে উন্নততর জীবনের পথ খুঁজে পেতে পারে,—এই ধারণা নূতন ধারায় শরৎসাহিত্য আলোচনার মধ্যে প্রত্যয়িত হলে তা বাংলা সাহিত্যের তো বটেই, শরৎ-অনুরাগী বিপুল পাঠক-সমাজের পরম কল্যাণবাহী হবে। শুধু সমকালই শরৎসাহিত্যের রসপুষ্ট হয়নি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিক কালও শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার লাভে সমৃদ্ধ হতে পারে,—শরৎসাহিত্যের বিচার এই প্রত্যয়ভিত্তিক হওয়া দরকার।

শিল্পের জন্য শিল্প,—কথাটা মুখে যতই বলা হোক, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য শেষপর্যন্ত হিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েই থাকে। সামাজিক গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে কথাটা আরও সত্য এইজন্য যে, সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংঘর্ষের উপর অধিকাংশক্ষেত্রে কথাসাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সমস্যার ছবি না ফুটিয়ে উপায় নেই এবং ছবি ফোটালেই সমস্যা-বিশেষ সম্পর্কে লেখকের ভাবদৃষ্টির ছাপ তাতে পড়বেই। বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যা এঁকেছেন এবং তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধিমত সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি ভিন্নরূপ ছিল, তিনি মনে করতেন সমস্যার জীবন্ত রূপাঙ্কনই কথাসাহিত্যিকের কাজ, সমাধান করা তাঁর কাজ নয়। (দ্রষ্টব্য—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল, 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী', ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০৮।) 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণীর এবং 'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দনন্দিনীর করুণ পরিণতিতে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে শরৎচন্দ্র মোটেই কলাকৈবল্যবাদী ছিলেন না। তিনিও চেয়েছেন তাঁর ভাবদৃষ্টি যেন পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়। এজন্য কাঠিন্য, জটিলতা বা ভয়াবহতা সহ সমস্যাকে স্বরূপে এঁকে সমাজশক্তির দ্বারা নিপীড়িত মানুষের ব্যথাবেদনা তিনি যত্ন করে ফুটিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর পূর্বে যেটুকু কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল সমাজবিধান-নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মানুষের মানসিকতার

লীলাভূমি, শরৎচন্দ্রই প্রথম সমাজের ছবি স্বরূপে এ'কে সমাজকে সহায়কের ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছেন, মানুষকে মূল চরিত্র করে মানবতামূলক সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। কথাসাহিত্যকে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলা হয়, বাংলা সাহিত্যে এই সংজ্ঞা শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসেরই প্রথম প্রাপ্য।

সমাজের বিধিবিধান মূলত সমাজভুক্ত মানুষের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্য রচিত হয়েছে, মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরও এগুলি চলতে থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনাবশ্যক ভার হয়ে কল্যাণের পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করবে এবং সমাজের অগ্রগতির পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হবে। এই সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের চাপের কথাও মনে রাখতে হবে। সমাজের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে, প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধান পরিবর্তনে যদি তাঁদের আগ্রহ না থাকে, সেরকম চেষ্টা হলে তাঁদের দিক থেকে নানাভাবে বাধা আসবেই। এ'দের হাতে সমাজ-বিধি পরিচালনার ভার থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থার জোরে এবং নিপীড়িত দুর্বল সামাজিক মানুষের অভ্যাসজনিত হীনমন্যতার সুযোগে এ'রা অন্যায়ভাবে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করেন, ফলে সমাজশক্তির কাছে সংশ্লিষ্ট সামাজিক মানুষ অসহায়ভাবে পরাজিত ও নিষ্পিষ্ট হয়। শরৎচন্দ্র অপরিসীম মানবিক সহানুভূতি দিয়ে সমাজের পরাক্রম ও সমাজবদ্ধ দুর্বল মানুষের আর্তি জীবন্ত করে ফুটিয়েছেন। তাঁর বিশাল সাহিত্যে নৈষ্ঠিক রূপায়ণের মধ্যেই, সে করুণ ছবি সীমায়িত হলেও, তার মর্মবাণী যখন পাঠক-হৃদয় প্লাবিত করে, ছবির সীমানা স্বতঃই প্রসারিত হয়, পাঠক-মানস উদ্বেল হয়ে ওঠে সমাধানের আবেগে। ১৩৪২ সালের ১১ই মাঘ শ্রীমতী জাহানারা চৌধুরীকে লেখা একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্রের এই অভিমত স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছেঃ— "সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি করতে পারে বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এর ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার।"

এইখানে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে এবং সমাজের বিধিবিধানকে এক করে দেখেছেন বহুক্ষেত্রে। 'ধর্মতত্ত্ব'-এ তিনি খোলাখুলিই বলেছেনঃ—"সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দন্ডপ্রণেতা,

ভরণ পোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষা।" ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে বঙ্কিমের সময়ে এদেশবাসীর মধ্যে ইউরোপীয় জীবনচর্যার বহিরঙ্গ আকর্ষণের বিপদ লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো তাঁর শিল্পীমানসকে ইচ্ছা করেই সঙ্কুচিত করেছিলেন। সে যাই হোক, এ হিসাবে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে মৌলিক পার্থক্য নিঃসন্দেহে তা শরৎচন্দ্রকে কালের গন্ডী অতিক্রম করবার অধিকার দিয়েছে। শরৎচন্দ্রও সমাজকে ভালবাসতেন, ধ্বংসবাদী বা ইংরেজিতে যাকে বলে Iconoclast, তা তিনি ছিলেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মত সমাজ ও সমাজের বিধানকে এক করে দেখেননি, সবসময় তিনি মনে করেছেন সুস্থ সমাজ তার বিধানের চেয়ে বড়, বিধানের চেয়ে মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অনেক বেশী নিবিড়। এই জন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ভাবরূপ হ'ল—সামাজিক বিধান মানুষের প্রয়োজনে অবশ্যই পরিবর্তন, এমন কি পরিবর্জনযোগ্য। যে যুগে আমাদের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান পর্যন্ত নাগরিক কল্যাণের আবেগে বারবার সংশোধিত হচ্ছে, সে যুগে শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টি তাঁর সমকালীন সংস্কারাচ্ছন্নতার কাঠিন্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই পাঠকসমাজের গভীর মনোযোগ দাবী করতে পারে।

শরৎচন্দ্রের এই উদার মানসিকতার আর এক প্রসারিত রূপ—তিনি পাপী এবং পাপকে পৃথক করে দেখেছেন। মানুষ তার পাপের চেয়ে বড়, পাপ মানুষের জন্মগত হীনতার পরিচায়ক নয়। পরিবেশের প্রভাবে, শিক্ষার অভাবে, অন্যায়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ঘনিষ্ঠতার অভ্যাসের চাপে, অসহায়তার বা দুর্বলতার বলি হিসাবে মানুষ পাপ করে। শরৎচন্দ্র আন্তরিক বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে এমন কোন পাপী নেই যে পাপের জন্য পাপ করে এবং আরোগ্যাতীত মনের অসুখে অসুস্থ ছাড়া এমন কোন পাপী নেই যার ভবিষ্যৎ নেই। পাপী সুযোগ পেলে ভালো নিশ্চয়ই হবে, এই প্রত্যয়ে শরৎচন্দ্র পাপীর পাপের ছবি এঁকেছেন এবং অনুকূল পরিবেশ সেই পাপীর নিহিত সম্ভাবনা উৎসারিত করলে তিনি পাপের ঊর্ধ্বে তার উত্তরণের সার্থক ইঙ্গিতও করেছেন। শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত দুখানি উপন্যাস 'দেনাপাওনা' ও 'গৃহদাহ'-এর দুটি বড় চরিত্র জীবানন্দ ও সুরেশের চরিত্রায়ন থেকে এই ভাবদৃষ্টির চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলবে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন জীবানন্দ যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তখন কোনখানেই তার সত্যকার কোন বন্ধু ছিল না। তার হারানো স্ত্রী

অলকা যেদিন শান্তিকুঞ্জের নরকে ভালবাসার কল্যাণ-প্রদীপ জেবলে ষোড়শী রূপে তার সামনে এসে দাঁড়াল, প্রেমের আলোয় জীবানন্দের অন্ধকার পথ আলোকিত হ'ল, জীবানন্দ সহজেই আত্মদীপ হয়ে উঠলো। উপন্যাসের প্রথম দিকের লম্পট, নিষ্ঠুর, শোষক জমিদার জীবানন্দের ছবি তার প্রতি পাঠকের ঘৃণারই সঞ্চার করে, কিন্তু উপন্যাসের শেষদিকে গায়ে জবর নিয়ে জীবানন্দ যখন মেখলা অপরাহ্নে দরিদ্র প্রজাদের ধান বাঁচাতে মাঠের জল নিকাশের জন্য ব্যগ্রভাবে সাঁকো তৈরী করাতে থাকে, তখন তার সেই পরিবর্তিত রূপে পাঠক মুগ্ধ হয়। ষোড়শীর ভালবাসাই এই পরিবর্তনের পটভূমি। সুরেশ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অলিখিত ঘোষণা করেছেন যে, সুরেশ প্রকৃতপক্ষে পাপী সামান্যই, বড় কথা সে ভুল করেছিল, পাপী-না হয়েও ভ্রান্ত ধারণার বশে পরস্ত্রী অচলাকে স্বামী মহিমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সে পাপ করেছিল। ঝড়ের রাতে সুরেশ অচলাকে বন্ধ ঘরে কাছে পেয়েও যখন বুঝলো অচলাকে সে নষ্ট করেছে মাত্র, অচলা প্রকৃতই তার নয়, মহিমের, তার স্বামীর, মুহূর্তের বিদ্যুৎ চমকে সুরেশ নিজেকে খুঁজে পেল। তারপরই পথভ্রষ্টতার অনুশোচনায় কাতর সুরেশের মাঝুলিতে আত্মত্যাগের নামে আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্বের পাদপীঠে প্রত্যাবর্তন। 'চরিত্রহীন'-এর আগুনপারা কিরণময়ীর উম্মাদ হয়ে যাওয়াও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। কিরণময়ী পাপকে পাপ বলে যখন বুঝলো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় বুদ্ধি-ভ্রংশকে প্রশ্রয় দিয়ে সে নিজের সর্বনাশ নিজে করেছে, ভালবাসার অহমিকায় প্রতিশোধের নামে দিবাকরকে আরাকানে টেনে নিয়ে গিয়ে ভালবাসার ধন উপেনের মন ভেঙে চুরমার করে তাকে সে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছে,—ভুল বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে কিরণময়ীর পায়ের তলার মাটি সরে গেল, উদ্‌ভ্রান্ত কিরণময়ী জ্ঞান হারিয়ে হয়ে গেল উন্মাদ। কিরণময়ী উন্মাদ হ'ল ঠিকই, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে নিজের জায়গায় অনেকটা ফিরে এল, আস্তিক্য-প্রত্যয়ী লেখক তাকে অনেকটা স্বচ্ছ করলেন, যে কিরণময়ী একদিন কঠোর ছিল, সে-ই মা কালীর প্রসাদ খাইয়ে মরণোন্মুখ উপেন্দ্রকে ভাল করবার স্বপ্ন দেখল।

বাস্তবিক চিন্তার আধুনিকতার হিসাবে পাপ এবং পাপীকে এই ভাবে পৃথক দৃষ্টিতে দেখা নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যে নূতন সংযোজন। পাপীকে এভাবে পাপমুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া শিল্পী শরৎচন্দ্রের মানবতা-বোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই মানবতাবোধের স্পর্শে তাঁর সাহিত্যে ভ্রষ্ট

নষ্ট মানুষের মিছিলে নূতন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা সঞ্চারিত হয়েছে। সমালোচক জন ক্যারুথারস্ বলেছেন, ঔপন্যাসিক যদি আত্মপরিচয়ের অধিকার হারাতে না চান, তাহলে অবশ্যই পরিচিত জীবনকে সামনে রেখে তাঁকে জীবনের ছবি আঁকতে হবে। (John Carruthers, Shehanazade, P. 23) শরৎচন্দ্র সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের অধঃপতনের করুণ চিত্রাঙ্কনে কুণ্ঠা দেখাননি, কিন্তু দেবদাসের মত সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রের ব্যর্থতা লক্ষ্য করলে অনবধানী পাঠকও সমাজনীতির অনুদারতাজনিত মানবশক্তির অবাঞ্ছিত অপচয়ে গভীর বেদনাবোধ করবেন। তার এই ব্যথা বা ক্ষুব্ধতার ফলে সমাজের কল্যাণমুখী পরিবর্তন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একান্ত আশা ছিল।

বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান চরিত্রে লেখকের আপন যুগের অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য আছে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলিত রূপের দ্বিধাহীন প্রতিফলন সেখানে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও অভিজাত শ্রেণীর এই আধিপত্য বর্তমান, তবে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে সাধারণ মানুষের সম্ভাবনা ও অধিকারের দিকে লেখকের স্নিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ সমাজ-সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নেননি। ভাল করে হৃদয়ের কথা বলার দিকে এবং সুস্থ সুন্দর জীবনধর্মের রূপায়নে তাঁর আগ্রহ প্রচলিত সমাজ-বিধান নিরপেক্ষভাবে তাঁর উপন্যাসে কোন কোন জায়গায় চমৎকার ফুটেছে। ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কথাও এইসূত্রে উল্লেখ করা যায়। এ হিসাবে দৃষ্টান্ত মিলবে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্রের, 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী চরিত্রের এবং 'গোরা'য় গোরা চরিত্রের অগ্রগতিতে। শরৎচন্দ্র যদিও রবীন্দ্রনাথের মত মার্জিত জীবনায়ন বা সাংস্কৃতিক সচেতনতার দিকে উল্লেখযোগ্য ঝোঁক দেখাননি, তবু নরনারীর হৃদয়রহস্যের রূপকার হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন। শরৎচন্দ্র লেখার জোরেই পাঠকের মন সমস্যামুখী করে তুলতে পেরেছেন। শরৎচন্দ্র আশা করেছেন পাঠকের সচেতনতা অদূর ভবিষ্যতে সমাজের দৈন্য ঘোচাবার সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। আধুনিক কালে শরৎচন্দ্রের এই লেখক-মানসই পাত্রান্তরস্থ হয়ে আরও গতিলাভের জন্য এবং আরও পরিণামমুখী হওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। আধুনিক লেখকরা এলোমেলো ঘোরার ভিতরেও অন্ধকারে অস্পষ্ট পথরেখার সঠিক নির্ণয়ে আকুলতা দেখাচ্ছেন। তাঁদের প্রয়াস বা পথচলার ভঙ্গী

নির্ভুল না হলেও এই মনোভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার রয়েছে।

শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি জন্মেছিলেন অবৈধ সন্তানরূপে, আপন প্রতিভাগুণে তিনি সারাবিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ইউরোপে জন্মেছিলেন বলে তাঁর উন্নতির পথে সমাজ দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করেনি। শরৎচন্দ্রের সময় আমাদের দেশের সমাজের অবস্থা ছিল বিপরীত। এখানে মানুষের পরিচয় মানুষ হিসাবে হ'ত না, তার কাজ বা সহজাত প্রতিভার হিসাবে হ'ত না, হ'ত সামাজিক বিধি-নির্দিষ্ট তার পারিবারিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। শরৎচন্দ্র মানবতার এই লাঞ্ছনার ছবি ফুটিয়েছেন 'বামুনের মেয়ে'র প্রিয়নাথ ডাক্তারের কথা বলতে গিয়ে। যত দিন যাচ্ছে আমাদের দেশেও এই চিন্তার দৈন্য কমে আসছে। প্রিয়নাথ ডাক্তারের ক্ষেত্রে করুণ রসের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র পাঠককে এই গুরুতর বিষয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর অগাধ সহানুভূতির জন্যই কুলটা মায়ের মেয়ে 'দেনাপাওনা'র ষোড়শী বা 'চন্দ্রনাথ'-এর সরযূ আপন গুণে মানবিক মর্যাদার স্তরে উঠতে পেরেছে। কমলের জন্ম বৃত্তান্ত সামাজিক হিসাবে গৌরবের নয়, তার একাধিক বিবাহের কাহিনীও সমাজবিধির সমর্থিত নয়, তবু মানবতাবাদী শরৎচন্দ্রের হাতে পড়েছে বলেই কমল নিজের ভাব-ভাবনার ঔজ্জ্বল্যে ও অধিকারে শুধু আশুবাবুর মত মহৎ ব্যক্তির শ্রদ্ধা অর্জন করেনি, একটু অত্যুগ্র ও অবিন্যস্ত হলেও নূতন যুগধর্মের প্রবক্তৃীরূপে কমল আধুনিক কালের চিন্তাজগতে আপন স্থান করে নিয়েছে। মানুষের প্রকৃত ঐশ্বর্য মনের ঐশ্বর্য, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে শেখাই সবচেয়ে মহৎ শিক্ষা,—এই সত্যের উপর আপন সাহিত্যবোধকে দাঁড় করিয়ে শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁর নিজের কালকে অতিক্রম ক'রে শুধু আমাদের এ যুগের কেন, আগামী যুগেরও পরিমন্ডলে পেঁাছে গেছেন। ধর্মমুখী অথবা প্রচলিত সমাজবিধানমুখী সাহিত্যবৃত্তি থেকে বাংলাসাহিত্যকে উদ্ধার করে শরৎচন্দ্র মুক্ত মানবতামুখী সাহিত্যচিন্তার যে স্রোতপথ খুলে দিয়েছেন সেই পথে চলাইতো আধুনিক কালের সাহিত্য-ধর্ম।

এই মুক্ত মানবতামূলক মনোভঙ্গীতেই শরৎচন্দ্র মেয়েদের দেখেছেন। মেয়েরা জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, অথচ সমসংখ্যক পুরুষদের ইচ্ছার উপর তাদের বেঁচে থাকা কার্যত নির্ভর করে। বিবাহের যে সিংহদ্বার পার হয়ে মেয়েদের সংসারজীবনে প্রবেশ করতে হয়, সেই বিবাহপ্রথায় প্রকৃতপক্ষে

মেয়েদের সারাজীবনের পরাধীনতার দলিল পাকাপাকিভাবেই যেন সই করিয়ে নেওয়া হয়, বিবাহমন্ত্রের বাচ্যার্থ যাই হোক না কেন। শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে মেয়েদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রত্যক্ষেও এই আবেগ প্রকাশে তাঁর আপত্তি নিশ্চয় হতো না, কিন্তু আমাদের যে সমাজের কথা তিনি বলেছেন সেই সমাজের প্রচলিত জীবনরূপে এই আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী মেয়েদের মনকে বিশেষ নাড়া দেয়নি, মুক্তির আলোর সঙ্গে পরিচয় না থাকায় মেয়েদের অভ্যাসের দাসত্ব চিন্তার দাসত্বে পর্যবসিত হয়েছিল, নিজেদের ন্যায্য মুক্তির দাবী তাদের নিজেদের দ্বারা মোটেই উপস্থাপিত হচ্ছিল না। এক্ষেত্রে জীবনধর্মী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র জীবনের বাস্তবরূপকে উপেক্ষা না করে মেয়েদের অসহায়তাজনিত দুর্বলতা দেখিয়েছেন এবং পুরুষনির্ভরতার অভ্যাসের কেন্দ্রে তাদের অন্ধকারে আত্মগোপনের ম্লান ছবি ফুটিয়ে সামাজিক শক্তির করুণ অপচয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নানা প্রথার চাপে নিষ্পিষ্ট নারীজাতির পঙ্গুত্ব ঘোচাতে শরৎচন্দ্র সুবিধা পেলেই তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত করে তোলার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। বিবাহ প্রথার বর্জন নয়, মানুষের কল্যাণমুখী পরিবর্তন তিনি কামনা করেছেন। বাংলাদেশের সমাজজীবনের প্রতি সতর্কতায় বাংলাদেশের পটভূমিতে একথা তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি বটে, কিন্তু বাংলার বাইরে অঙ্কিত 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িতা অভয়ার রোহিনীবাবুর সঙ্গে মিলিত জীবন-যাপনের দৃঢ়সংকল্পে এবং 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে ভালবাসার উপর অজিতের সঙ্গে স্থায়ী ঘর বাঁধবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অজিতের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও কমলের অজিতকে বৈধ বিবাহে অসম্মতিতে শরৎচন্দ্রের মনোভঙ্গীর স্বাক্ষর আছে। বার্ট্রান্ড রাসেল ও বার্নার্ড শ,—আধুনিক পৃথিবীর যুগন্ধর দুই মনীষীর সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রথা সম্পর্কিত দৃষ্টির মৌলিক সামঞ্জস্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সহজেই চোখে পড়ে।

বাঙ্গালী সমাজে মেয়েদের মর্যাদা তাদের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে জড়িত বলে শরৎচন্দ্র মনে করতেন। অর্থনৈতিক নির্ভরতা কিভাবে মেয়েদের আত্মহারা করে, 'গৃহদাহ'-এ সুরেশের বিপরীতে অচলার জীবনরূপে তা স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। অচলা ঝড়ের রাতে সুরেশের সঙ্গে একঘরে শুতে বাধ্য হয়ে সর্বনাশকে আর ঠেকাতে পারল না, পরদিন প্রভাতে রামবাবু

অবাক হয়ে দেখলেন অচলার মুখ মড়ার মুখের মত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। এই অচলা কিন্তু অতঃপর সুরেশকেই অবলম্বন করে রইল, সুরেশের দেওয়া অলংকারে সুসজ্জিতা হয়ে সে যে আবার রামবাবুর বাড়ী যেতে পারল তা মুখ্যত সম্ভব হয়েছে অর্থনৈতিক চাপের জন্য, সুরেশের উপর ভালবাসার চাপ এক্ষেত্রে সামান্য কথা। অচলার চরিত্রাংকনের বিপরীতে 'শ্রীকান্ত'-এর রাজলক্ষ্মীর চরিত্র লক্ষ্য করলে কথাটা পরিষ্কার হবে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল, প্রেমিকার ভূমিকায় যখন সে সক্রিয় তখন শ্রীকান্তকে সেবা করবার প্রবণতা পাঠকের নজরে পড়ে, কিন্তু সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারিণী ছিল বলে যে রাজলক্ষ্মী প্রেমের ক্ষেত্রে শ্রীকান্তে অনুগত, জীবনায়নের অন্য সব ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত-নিরপেক্ষ তার আত্মস্বাতন্ত্র্য পাঠক লক্ষ্য না করে পারেন না।

এ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে অর্থনৈতিক চেতনার স্থান নগণ্য, অথচ আধুনিক যুগচিন্তায় এই অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানসিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারী-চরিত্রের গতি-প্রকৃতিতে অর্থনৈতিক প্রভাবের প্রশ্ন একরকম উপস্থাপিতই হয়নি, যথেষ্ট না হ'লেও শরৎচন্দ্রই প্রথম বড় সাহিত্যিক হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপন সাহিত্যকৃতিতে সংযুক্ত করলেন। আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য তাঁর এই উত্তরাধিকারকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে যুগ-চেতনা সমৃদ্ধ হবে সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনার অবদান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে। এ বিষয়ে তাঁর 'অরক্ষণীয়া' এবং 'স্বামী' গল্প থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি দৃষ্টান্ত রাখা যায়। 'অরক্ষণীয়া'য় জ্ঞানদার সঙ্গে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান এক লোলচর্ম বৃদ্ধের বিবাহের কথা হয়েছে। এ বিবাহের আশু ফল যে বৈধব্য তা জ্ঞানদা জানে। তার জন্য হিন্দু মেয়ের দুঃখময় দীর্ঘ বিধবা জীবন পড়ে থাকবে। এ বিবাহে কোন তরুণী কুমারীই খুশী হয় না। অন্তরে জ্ঞানদাও হয়ত আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাটিকে সে যেরকম শান্তভাবে গ্রহণ করেছে তাতে তার মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধ পাত্র যখন জ্ঞানদাকে দেখতে এলেন, যাতে তাঁকে দেখে তাঁর পছন্দ হয় সেজন্য জ্ঞানদা সস্তা পাউডার, নারকোল তেল ইত্যাদি নিয়ে সাজতে বসলো। তাকে কেউ

গ্রাহ্য করে না, সাজিয়ে দিতে কেউ এগিয়ে এল না। উপকরণ নেই, ভাঙ্গা আরশি, গরম কাল, প্রাণপণ চেষ্টা করেও জ্ঞানদা শেষ পর্যন্ত এমন সজলো যে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের শিশুপুত্রও অবাক হয়ে মন্তব্য করলো 'পিতি সঙ্ সেজেছে।' জ্ঞানদা ভবিষ্যতের একটু সংস্থানের আশায়, মায়ের মৃত্যুর পর অনিচ্ছুক আত্মীয়দের গলগ্রহ হবার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতির জন্য কোনরকমে ওই বৃদ্ধ পাত্রের চোখেই নিজেকে পছন্দযোগ্য করে তুলতে চেয়েছে। সফল হলে বৈধব্য সত্বেও ভবিষ্যতে তাকে ভিক্ষা করতে বা ভয়ংকর জীবন যাপন করতে হবে না, এই আশাই তার একমাত্র সান্ত্বনা। এই করুণ বাস্তব অর্থ-নৈতিক চেতনার ছবিটি বাংলাসাহিত্যে নূতন কালের চিন্তারূপান্তরের দ্যোতক। 'স্বামী' গল্পে সৌদামিনীকে নিয়ে তার মা বড় ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকেন। সৌদামিনীকে মামা খুবই ভালবাসেন, যত্ন করে তিনি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এমন ভাগ্নীর সত্যকার ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, এ বিষয়ে মামা নিঃসন্দেহ। সৌদামিনীর মা কিন্তু দাদার আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশ নেন না, নিজের চেষ্টায় তিনি অল্পবয়সে বিপত্নীক ম্যাট্রিক পাশ নিঃসন্তান চাকুরে যুবক ঘনশ্যামের সঙ্গে সৌদামিনীর বিবাহ ঠিক করেন। দাদা প্রচন্ড বাধা দেন, প্রতিশ্রুতি দেন তিনি সৌদামিনীর ভাল বিয়ে নিশ্চয়ই দেবেন, এমন মেয়ের বিয়ে ঘনশ্যামের মত বাজে ছেলের সঙ্গে তিনি হ'তে দিতে পারেন না। অর্থনৈতিক চেতনাজাত বাস্তব জীবনবোধে শরৎচন্দ্র সৌদামিনীর মাকেই এক্ষেত্রে জিতিয়ে দিলেন। সৌদামিনীর মা দাদার পায়ে মাথা খুঁড়ে তাঁকে বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থেকে নিবৃত্ত করলেন। মা হয়েও তিনি শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ দাদার প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা না রেখে সাধারণ পাত্রের সঙ্গেই সৌদামিনীর বিয়ের জিদ বজায় রাখলেন। তিনি জানেন, তাঁর দাদার আদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু টাকা নেই, এ পাত্র তবু মেয়েটাকে খেতে পরতে দিতে পারবে, নিঃসন্তান বলে বিপত্নীক হ'লেও সৌদামিনীকে ছেলেটি হয়তো স্বামী হিসাবে সুখী করবে। এ বিয়ে ভেঙ্গে গেলে তাঁর নিজের আর দাদার অবর্তমানে সৌদামিনীর আর্থিক ভবিষ্যৎই মায়ের প্রধান ভাবনা হয়েছে।

বিখ্যাত 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্রের অর্থনৈতিক চেতনার আর এক জোরালো অভিব্যক্তি ঘটেছে। আজ পর্যন্ত 'মহেশ' যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তার মূলে আছে শক্তিমান অর্থবানের শোষণ ও অন্যায় অত্যা-চারের প্রতি পাঠকের ঘৃণা উদ্রেকের প্রয়াস এবং শোষিত নিপীড়িত দরিদ্র

কৃষক গোফুর ও অসহায় গোরু মহেশের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি। কিন্তু এই কারুণ্যটুকু ছাড়াও গল্পটির মর্মমূলে আর একটি বড় তথ্য পাঠকদের দৃষ্টি এড়িয়ে অবস্থান করছে। ভারতের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল ভূমিকায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এদেশে অর্থনৈতিক সংগঠন-রূপান্তরের মৌলিক আকাঙ্ক্ষাই হবে পরিকল্পনা রূপায়নের ভিত্তি। এর অর্থ, পুরাতন কৃষি-নির্ভর জাতীয় অর্থব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে হবে, প্রাচীন ভারগ্রস্ত কৃষির উপর বর্তমানের মত এত বেশী লোক নির্ভর করলে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দারিদ্র্য কোনকালেই ঘুচবে না এবং ফলে ভারতবাসী অগ্রগতিশীল পৃথিবীতে অনুন্নত থেকে যাবে। এইজন্য কৃষি-নির্ভরতা কমিয়ে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে জোর দিতে হবে। নিয়োগ-সমস্যা এবং ভোগ্যপণ্যের সমস্যা দুইয়েরই এতে সুরাহা হবে। দেশ বড় হয়ে উঠবে। ভারতের শান্ত সংযত আড়ম্বরহীন জীবনরূপের স্নিগ্ধতা অনস্বীকার্য, গ্রামীণ কৃষকজীবনের মধ্যে ভারতের উদার সনাতন জীবনরূপের স্পর্শ পাওয়া যায়। কৃষককে আমরা ভালবাসি, কৃষকের জমির প্রতি ভালবাসাকে আমরা প্রীতির চক্ষে দেখি। কিন্তু গোফুরের মত ভূমিহীন কৃষক যদি জমিদার বা তাঁর পুরোহিত তর্করত্নের কাছে সহৃদয় ব্যবহার, এমন কি কিছু সাহায্য পেত, তাহলে কি নিম্নতম প্রত্যাশিত জীবনমানের হিসাবে গোফুরের পক্ষে সপরিবারে বাঁচা সম্ভব হত? নিশ্চয়ই তা হ'ত না। শরৎচন্দ্র প্রথম বাঙ্গালী কথা-সাহিত্যিক যাঁর চেতনায় এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা স্থান পেয়েছে এবং যিনি আপন কথাসাহিত্যে তা রূপায়িত করেছেন। গোফুরের ব্যথায় একান্ত ব্যথিত হয়েও ভাল শল্য চিকিৎসকের দৃঢ়তা নিয়ে শরৎচন্দ্র ভূমিহীন দরিদ্র কৃষিজীবী গোফুরকে তার প্রাণপ্রিয় কৃষিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে গল্পের উপসংহারে তাকে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে পাঠিয়েছেন।

মানবতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনাও আশ্চর্য মার্জিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে ধার্মিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু সে ধর্মবোধ ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র অনুভূতিকেন্দ্রিক, আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। এদিক থেকে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য এবং আধুনিক কালের আলোক-সঞ্চারী শক্তি। ভারতবর্ষে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর, ধর্মের ব্যভিচারও এখানে যথেষ্ট চলে। ধর্মরূপকে মালিন্যমুক্ত করার সাধনা আধুনিক কালেও প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। আবিলতাহীন ধর্মবোধ শরৎচন্দ্র

মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। তাঁর 'বিরাজ বৌ'-এর নায়ক নীলাম্বর স্নেহের ছোট্ট বোন পুঁটিকে পথচারী এক বৈষ্ণব ভিখারীকে দেখিয়ে আবেগের সঙ্গে বলেছে, "বোষ্টমের কিচ্ছু নেই, তাদের কিছু থাকতে নেই।" সাধারণভাবে কথাটা সাধারণ, কিন্তু গভীর ধর্মবোধের ব্যঞ্জনায় একথার দাম কষা যায় না। ধর্মের নামে যারা অধর্ম করে শরৎচন্দ্র তাদের ঘৃণা করতেন। সত্যকার ধর্মপরায়ণদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন! 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে মুরারী-পুর আখড়ার এক দৃশ্যে শরৎচন্দ্রের এই পবিত্র মনোভাবের সুন্দর নিদর্শন আছে। আখড়ায় তখন গানের আসর বসেছে, বাইরে থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসে এক নামকরা বৈষ্ণব মৃদঙ্গ বাজাতে আরম্ভ করেছেন, আখড়ার প্রধান দ্বারিকাদাস বাবাজী চোখ বুজে শুনছেন। ঠিক এমন সময় সালঙ্কারা গায়িকা রাজলক্ষ্মী আসরে ঢুকলো। রাজলক্ষ্মীর অপরূপ রূপ,—বাদক বাবাজীর মৃদঙ্গের সুর কেটে গেল, সাধু দ্বারিকাদাসের কিন্তু কোন ভাবান্তর হ'ল না, তিনি যেমন চোখ বুজে ছিলেন, ঠিক তেমনি চোখ বুজে রইলেন।

শরৎচন্দ্রের সময় আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজরূপ ক্ষয়িষ্ণু হলেও টিকে ছিল। তবে অবক্ষয়ের ক্ষতচিহ্ন তখন তার সর্বাঙ্গে। শিল্পীসুলভ নিষ্ঠায় শরৎচন্দ্র সমকালীন সমাজকে এঁকেছেন। মানুষের প্রয়োজনে একদিন সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল, মানুষের প্রয়োজনেই তার পুনর্বিন্যাসের দাবী শরৎ-সাহিত্যে শোনা যায়। শরৎচন্দ্র নিজে এই সমাজ-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তার ভালমন্দ দুদিকই তিনি দেখেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভালমন্দ দুই দিকই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। জমিদার বেণী ঘোষালের পাশে জমিদার রমেশকে আঁকতে তাই শরৎচন্দ্র দ্বিধা করেননি। নূতন যুগের পদধ্বনি তিনি শুনেছিলেন, সেকথা একটু অসংলগ্নতার মধ্যেও কমলের তীক্ষ্ম মন্তব্যগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নবযুগ কি রকম হবে তা তিনি জানতেন না, তবু নূতন কালের আবির্ভাব যে অনিবার্য, তাঁর আঁকা সমাজের ধূলিধূসর ছবিগুলিই সে কথা বলে। রাবীন্দ্রিক প্রত্যয়ে শরৎচন্দ্র আশা করেছেন সূর্য স্বমহিমায় ফিরে এলে কুয়াশাও দীপ্তিলাভ করে সূর্যালোকে মিশে যাবে। রমেশ জেল থেকে ফিরে এল এবং বেণী রইল, পল্লীসমাজের এই উপসংহার অবশ্যই শুধু ভবিষ্যৎ সংঘর্ষেরই ইঙ্গিত দেয় না, সেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রমেশের সংগ্রামী মহত্ত্বের জয়ের ইঙ্গিত দেয়। সামন্ততন্ত্র আবিলতার মধ্যে

আত্মবিলুপ্তির পথে চলেছে, 'দেনা-পাওনা'র জীবানন্দের উত্তরণ, কিংবা 'শেষপ্রশ্ন'-এর আশুবাবুর বা 'শুভদা'র নন্দী মশায়ের মহত্ত্বের ঠেকা দিয়ে অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রকে বাঁচান যাবে না, সমাজতন্ত্রের দিকেই সমাজ ঘুরবে, — এই ধারণা শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' ও 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে মোটামুটি বলিষ্ঠভাবেই রেখেছেন। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের যে পুঁথিগত ধারণা এখন বলবৎ হয়েছে, তা এসেছে প্রধানত সোভিয়েট বিপ্লবের সাফল্যের ফলশ্রুতিতে। 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'দেনা-পাওনা'-র (১৯২৩) সময়তো বটেই, 'পথের দাবী' ১৯২৬) রচনাকালেও এই সমাজতন্ত্রের ধারণা এদেশে ছড়ায়নি। শরৎচন্দ্র আপন প্রতিভাবলেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট আভাস উল্লিখিত উপন্যাস দুখানিতে রেখেছেন। 'পল্লীসমাজ'-এ রমেশের ও 'দেনা-পাওনা'য় ষোড়শীর নেতৃত্বে শোষিত দরিদ্র কৃষক প্রজারা একত্র হয়ে কায়েমী সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছে। কাহিনীর প্রকৃতি-পরিণতি অনুধাবন করলে অনায়াসে বলা যায় যে, সামন্ততান্ত্রিক পটভূমির উজ্জ্বলতা উভয় উপন্যাসেই শেষপর্যন্ত ম্লান হয়ে গেছে, সমাজ-তান্ত্রিক আবেগ সফল না হ'লেও লক্ষণীয় গতিলাভ করেছে। আধুনিক কালে এই সমাজতান্ত্রিক অনুভূতি সাধারণভাবে কথাসাহিত্যিকের মনোজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময় তলার শ্রেণীর মানুষের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বোধ একেবারে কম ছিল বলে শরৎচন্দ্রের মনের আবেগের তুলনায় সে আবেগের প্রকাশ অতি সামান্যই হয়েছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্র যদি 'পল্লীসমাজ', 'দেনা-পাওনা'র কৃষকদের মুক্তি আন্দোলন না আঁকতেন, 'পথের দাবী'তে শিল্প-শ্রমিকদের মুক্তি আন্দোলনের উপর জোর না দিতেন, এই আন্দোলনে রমেশ, ষোড়শী, সব্যসাচীর মত যোগ্য সেনাপতির পরিকল্পনা না করতেন, তাহলে এদেশে, অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক ভাব-ভাবনার বর্তমান প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে বিলম্বিত হ'ত। পক্ষান্তরে শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সামান্য সুযোগে এই কঠিন প্রয়াসে এগিয়ে এসেছিলেন বলেই আধুনিককালের বাংলাসাহিত্যে সেই মহৎ কীর্তির উত্তরাধিকার ক্রম-সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আজকাল মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে একথা ঠিক, কিন্তু সেইসঙ্গে দলগত রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে বলে রাজনৈতিক কর্মী মনের দিক থেকে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করে

একালের লেখকরা সমকালীন সাধারণ মানুষের এই মানসিক অবনমন রোখ-বার বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই করতে পারেন। যারা রাজনৈতিক দলবাজি, মারামারি কাটাকাটি করে, তাদের সামনে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী সব্যসাচীর পাশে গান্ধীবাদী অদ্রোহ অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনকারিণী ভারতীর মর্যাদাপূর্ণ সহ-অবস্থান দৃষ্টান্ত হিসাবে নিঃসন্দেহে শিক্ষাপ্রদ, আধুনিককাল এই সুযোগ গ্রহণ করলে জাতীয় অগ্রগতি সংহতির মধ্য দিয়ে অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে।

আমাদের দেশে এখন জনসাধারণের পশ্চাৎপদতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষার অভাব। শিক্ষা মানুষের মনে বল জোগায়, সে বল বাহুবলের চেয়ে বড়। শিক্ষার অভাবে মানুষ আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন, সরব বা সক্রিয় হয় না, উন্নয়ন-পরিকল্পনার শরিক হয় না, জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে। অর্ধশতাব্দীরও আগে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প-উপন্যাসে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসখানিতে হৃদয়ের গুরুত্ব যথেষ্ট, কিন্তু বৃন্দাবন পণ্ডিত এবং তাঁর পাঠশালা এ গল্পের প্রাণ। একমাত্র পুত্র চরণ সমাজপতিদের দৌরাত্ম্যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার পর বৃন্দাবন যখন গ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছে তখনও তার প্রিয় পাঠশালাটি উঠে যায় নি, বৃন্দাবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত কলেজের অধ্যাপক কেশব চাকরী ছেড়ে বন্ধু বৃন্দাবনের সাধনক্ষেত্র পাঠশালাটি পরিচালনার ভার নিয়েছে। পল্লীসমাজের রমেশের গঠনমূলক ক্রিয়াকর্মের বড় দিক হ'ল কুঁয়াপুর-পীরপুরের স্কুল দুটি ভালভাবে চালানো। 'শ্রীকান্ত'-এ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ সাধন-ভজন কতখানি করেছে শরৎচন্দ্র সেকথা বলেননি, কিন্তু বজ্রানন্দ স্কুল-গঠনে সাগ্রহে এগিয়ে এসেছে এবং বৃত্তিতে বাইজী হ'লেও উপন্যাসের নায়িকা রাজলক্ষ্মী উদারভাবে তাকে সাহায্য করেছে। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের জমিদার বিপ্রদাস জবরদস্ত মানুষ, তিনি মহাজনী কারবারও চালান, কিন্তু শিক্ষার জন্য তাঁর উদারতা উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়েছে। বিপ্রদাস স্কুলে-মক্তবে অর্থসাহায্য করেন, তাঁর কলকাতার বাড়ীতে অনেকগুলি ছাত্র বিনাখরচে থেকে কলেজে পড়ে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পে বিন্দু অমূল্যকে উপলক্ষ করে বাড়ীর বাইরে পাঠশালা খুলে দিয়েছে। সত্যকার জাতীয় অগ্রগতিতে গণ-শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য বলেই মানবতাবাদী শরৎচন্দ্র

শিল্পগত প্রবল অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁর গল্প-উপন্যাসে শিক্ষার উপর এতটা জোর দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের এই কল্যাণ কৃতির আদর্শ সর্বকালেই অনুকরণ যোগ্য।

মোটের উপর, মূলকথা হ'ল শরৎচন্দ্র সমগ্রভাবে সুস্থ সুন্দর জীবন-ধর্মের জন্য এবং দেশের ও দশের সত্যকার মঙ্গল সাধনের জন্য শিল্পকলা-হানির কিছুটা দায়িত্ব নিয়েও যে বিপ্লবাত্মক আবেগ দেখিয়েছেন, আধুনিক কালে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের হিসাবে তার স্বীকৃতি ও অনুসৃতির প্রয়োজন ফুরোয় নি।

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর
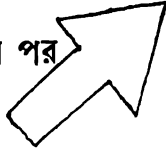
কাজী আবদুল ওদুদ

শরৎচন্দ্র বাংলার সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হন ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব' সমেত তাঁর অন্তত পনেরখানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই বেরিয়ে যায়। তার কোনটি পাঠকসমাজে অনাদর পায় না, বরং সমাদর পায়। তাই বলা যেতে পারে, প্রথম পাঁচ বৎসরেই শরৎ-চন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল —তাঁর প্রভাবকাল আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে এই বড় ব্যাপারটিও স্মরণীয় যে এটি বাংলার সাহিত্য-জগতের উপরে রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রভাবও যে বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল তা যথার্থ।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রভাব বলতে কোন্ বিশেষ ব্যাপার বুঝতে হবে? চিন্তা বা সাহিত্যাদর্শের কোন্ বিশেষ রূপ? আমরা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে যতটা পরিচিত হয়েছি তাতে দেখেছি, বাস্তব জীবন সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও শরৎচন্দ্র মুখ্যত ছিলেন সুনীতি, সদাচার, পবিত্রতা, প্রেম ও শ্রদ্ধার বন্ধনে বদ্ধ দাম্পত্য জীবনের রূপকার। এই অভিযোগ ব্যাপক হয়েছিল যে তাঁর লেখায় ঘোর অনাচার ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে—সে-সব মোহন রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন ঃ

> পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় এই কথাটা আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল।

এই উক্তিটি তিনি করেন ১৩৩১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে। কিন্তু তার বহুপূর্বে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যে তাঁর সাহিত্যের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন তারও উল্লেখ রয়েছে, উক্ত ভাষণেই।

পাঠক সাধারণের এই ধরনের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষা করা যেতেও পারে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন নতুন লিখিয়েদের দলেও যেসব অস্বস্তিকর নতুন প্রবণতা দেখা দিল সে সব আর উপেক্ষা করবার মত অবস্থায় রইল না। অর্থাৎ, যাকে সাহিত্যে বাস্তববাদ, Realism, বলা হয় তার বিভীষিকা আর আকর্ষণ দুই-ই নিযে বাংলা সাহিত্যে লক্ষণীয় হয়ে উঠল শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই।—বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের গুরু শরৎচন্দ্র এত বড় সম্মান বা দুর্নাম যে সত্যই তাঁর প্রাপ্য নয়, এর সত্যকার গুরু বরং কাল—এ বিষয়ে আজ আমরা অনেকখানি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আমাদের দেশে বাস্তববাদের ব্যাপক প্রচলনের ব্যাপারে কালের এক বড় বাহন হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র তা স্বীকার না করেও উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কালের সূচনা থেকে একাল পর্যন্ত অন্যূন ষাট-জন সাহিত্যিক ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে কম বা বেশি খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা সবাই অবশ্য বাস্তববাদ বলতে যা বোঝায় সেই পথের পথিক নন। তবে শরৎ উত্তর যুগের পুরোপুরি পরিচয় নিতে হলে এঁদের প্রায় সবারই পরিচয় নেওয়া দরকার। কিন্তু সে কাজটি দুঃসাধ্য —এত শীগগির হয়ত অপ্রয়োজনীয়ও। আমরা চেষ্টা করব শরৎ-উত্তর কালের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধানত বাস্তববাদী অংশের যথাসম্ভব নির্ভর-যোগ্য একটা ধারণা দিতে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ শরৎচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান হন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্রের প্রভাবের কালেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বাস্তববাদী রচনা বলতে যা বোঝায় তাঁর রচনা ঠিক তা নয়। তাঁর কোনো কোনো রচনায় অনুকূল দৈবযোগের প্রাচুর্য দেখে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনাকে বলেছেন বয়স্কদের রূপকার। কিন্তু আসলে মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর কম ছিল না, আর চরিত্রাঙ্কনে তাঁর রেখাপাতও অনেক সময়ে সুতীক্ষ্ণ হয়েছে। তবে মোটের উপরে জীবনের বাস্তব দিকের কিছু কিছু ইংগিত দিয়ে তিনি পাঠকের হাসি-তামাসার প্রচুর খোরাক জোগাতেই তৎপর হয়েছিলেন।

তাঁর অনেক ছোট গল্প আজো পাঠকদের প্রিয়।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তঃ প্রভাতকুমারকে বাস্তববাদী না বলা গেলেও

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কিছু পরেই উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির অধিকারী হলেন সেই ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সেদিনে বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক রূপেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর 'অগ্নি-সংস্কার' 'শুভা' 'পাপের ছাপ' এবং আরো বহু উপন্যাস সে সময়ে পাঠকসমাজে গৃহীত হয়েছিল পুরোপুরি বাস্তববাদী উপন্যাস রূপে।

কিন্তু তাঁর খ্যাতি অল্পদিনেই ম্লান হয়ে গেছে, তার কারণ মনে হয়, বাস্তবের সত্যকার ছবি তাঁর রচনায় কমই আঁকা হয়েছিল, আর তাঁর চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল আরো কম। কিছু নতুন চিন্তার পরিচয় তিনি অবশ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু চিন্তা, শুধু নূতনত্ব বা বৈচিত্র্যের গুণে নয়, গভীর-ভাবে জীবনধর্মী হলে তবেই মানুষের সমাদর পায়।

কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের একখানি বই 'আমি ছিলাম' তাঁর একটি স্মরণীয় রচনা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। তাঁর 'রবীন মাষ্টার'ও কারো কারো শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। কিন্তু রবীন মাষ্টারের চরিত্র শেষের দিকে ভাবালু হয়ে পড়েছে বেশি। 'আমি ছিলাম'-এ তাঁর রেখাপাত সে তুলনায় অনেক তীক্ষ্ন। বইটির বৃদ্ধ নায়ক তার পৌত্রের ভিতরে মানুষের জন্য দরদ আর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস প্রত্যক্ষ করে নিজের জরাজীর্ণ জীবনে তাঁর অতীত দিনের ব্যাপক মানবকল্যাণ-অভিমুখী চিন্তার উদ্দীপনা নতুন করে অনুভব করেছেন; পরিবর্তিত কাল সম্বন্ধে এবং সেই পরিবর্তিতকালে নিজের করণীয় সম্বন্ধে বৃদ্ধের চেতনাও পাঠকদের মনে দাগ কাটে।

কল্লোল গোষ্ঠী ঃ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যে বাস্তববাদী লিখিয়েদের আর্বিভাব ঘটে, সেই সময়ে তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টার নামকরণ হয়েছিল অতি আধুনিক সাহিত্য। একালে এই দলের লেখকেরা সাধারণত 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র সাহিত্যিক নামে পরিচিত, যদিও সেইদিনে 'কল্লোল'ই তাঁদের একমাত্র বা মুখ্য মুখপাত্র ছিল না। এই দলে অনেক লেখকই ভিড়েছিলেন।

কিন্তু কালে কালে গল্প ও উপন্যাস লিখিয়ে হিসাবে এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর বুদ্ধদেব বসু। বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে এঁরা, অথবা এঁদের শেষোক্ত দুইজন, বাংলা সাহিত্যের একালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে বিচার করে দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায়, অল্প বয়সে অনেকটা তারুণ্যের উদ্দীপনায় আর ফ্রয়েড, ডি. এইচ্. লরেন্স প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের প্রভাবে এঁরা বাস্তববাদ সম্বন্ধে মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু অপরিণত চিত্তশক্তি নিয়ে এঁরা যে বাস্তব-বাদের জগতে প্রবেশ করে-ছিলেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এঁদের সেই দুর্বলতার পরিচয়ই এঁদের সৃষ্ট সাহিত্য বহন করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে জ্ঞান করা যেতে পারে এই দলের Friend, Philosopher and Guide—বন্ধু, দার্শনিক আর নেতা। তাঁর আগে এঁরা নতুন পথের ইংগিত পেয়েছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদারের কোনো কোনো কবিতা থেকে আর কবি নজরুল ইসলামের উদ্দাম ছন্দে। কিন্তু সেই ইংগিত কিছু বিশিষ্ট রূপ নেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবযৌবনের রচনা 'পাঁক' উপন্যাসখানিও 'ইতর জীবনে'র কিছু চিত্র এঁদের সামনে তুলে ধরে, কিন্তু 'ইতর জীবনে'র সঙ্গে এঁদের নিজেদের পরিচয় ছিল যৎসামান্য, আর বিশেষ করে মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ঝোড়ো হাওয়ার দোলাই এঁদের লেগেছিল বেশী। এঁদের অনেকের রচনা সেই দোলার স্নায়ু-চাঞ্চল্যের হর্ষ যেন কাটিয়ে উঠতে চায়নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাবা হয়নি। এক হিসাবে কাজটি সঙ্গতই হয়েছে, কেননা, সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্তরঙ্গযোগ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, আর রবীন্দ্রোত্তর যুগে আধুনিক কবি নামে যাঁরা পরিচিত তাঁদের চাইতে দেশের জীবন-ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও অনেক গভীর ও ব্যাপক।

কিন্তু তাঁর কবিতা ও উপন্যাস যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হলেও তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে তাঁর ছোট গল্পগুলোয়, তাদের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। তাঁর গভীর সৌন্দর্যবোধ ও জীবন-বোধ সে-সবে মাঝে মাঝে অপূর্ব ভাষা পেয়েছে—আমাদের একালের জীবনে সৌন্দর্য ও সার্থকতা কত রকমে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তার ছবি বিচিত্র ভঙ্গিতে সে সবে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রেমেন্দ্র মিত্রের লাভ হয়েছে, বোধহয় অনেকেরই এই মত।

কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের চাইতেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ

ছোট গল্পের মর্যাদা বেশি দেন। তাঁদের কথা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা মাঝে মাঝে অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর কিছু-বেশি রোমাণ্টিক প্রবণতা তাঁর প্রতিভাকে সত্যই কিছু ক্ষুণ্ণ করেছে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত সেদিন কিছু কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস, বিশেষ করে' তাঁর 'বেদে' উপন্যাসখানি লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর বাস্তব-বোধ মনে হয়েছে অদ্ভুত। প্রকৃতি-বর্ণনা মাঝে মাঝে তাঁর রচনায় চিত্তাকর্ষক হয়েছে – বিশেষ করে ভাঙনধরা নদীর বর্ণনা; কিন্তু মানুষের ছবি তিনি যা এঁকেছেন তা অর্থপূর্ণ হয়নি—সেগুলোকে যদি stunt অর্থাৎ কসরত জাতীয় রচনা বলা যায় তবে নিন্দা করা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বেদে' সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য অনেক করেছিলেন; কিন্তু ভাল যতটা বলেছিলেন তাও কম নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন কিছু আশার সম্বল তাঁর এই লেখাটি নতুন করে' পড়ে আমরা পাইনি: জীবনের প্রতি যে দরদ ও দায়িত্ববোধ লেখাকে অর্থপূর্ণ করে, মনে হয়েছে, কেমন করে যেন তারই অভাব ঘটেছে তাঁর রচনায়। তাঁর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লেখা বোধহয় তাঁর 'যতনবিবি'। তাতে চরিত্রগুলোকে খুব বাস্তব করতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তারা দাঁড়িয়েছে যেন বাস্তবের মুখোস পরে –তাদের অন্তরাত্মার স্পর্শ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বুদ্ধদেব বসু অল্প বয়সেই সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। আর নবযৌবনেই পদ্য গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা পেয়েই তিনি সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন, কিন্তু অচিরে ফ্রয়েড্ এবং ডি. এইচ. লরেন্সের প্রভাব তাঁর উপরে প্রবল হয়।

অল্প বয়সেই তিনি যেমন খ্যাতিমান হন তেমনি নিন্দার পাত্রও হন। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মতো অত কড়া নিন্দা বোধ হয় আর কাউকে ভোগ করতে হয়নি। সেটি অবশ্য এক হিসাবে তাঁর সাহিত্যিক শক্তিরই পরিচায়ক।

তাঁর সাহিত্যিক প্রচেষ্টা অনেক বাঁক-বন্দর ঘুরে এসেছে, অনেকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই অল্প কথায় তাঁর পরিচয় দেওয়া কঠিন। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, কবিতা রচনায়ই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশি।

তাঁর প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনীও অনেকের প্রিয়। কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কম।

একালের বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরাই বাস্তববাদ নিয়ে বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছিলেন—সেই বিতর্কের কোলাহল দেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছড়িয়েও পড়েছিল। কিন্তু আমরা এই গোষ্ঠীর নেতাদের যতটা পরিচয় পেলাম তা থেকে বোঝা গেল কল্লোল-গোষ্ঠীর বাস্তববাদ ছিল খুব অবিকশিত—আমাদের সাহিত্যে তা থেকে স্মরণীয় কিছু পাওয়া সম্ভবপর ছিল না, পাওয়া যায়ওনি। এরপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বাস্তব-বোধের—অর্থাৎ রূঢ় বাস্তব-বোধের—কিছু উল্লেখযোগ্য পরিণতি আমরা দেখব। কল্লোল-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কল্লোলে লিখতেন। কিন্তু তাঁকে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখক না বলাই সঙ্গত। কেন না, বাস্তবতা নিয়ে কোনোরূপ বাড়াবাড়ী বা মাতামাতি তিনি কখনো করেননি যদিও তাঁর বাস্তবের বোধ গভীর। দেশের সঙ্গে তাঁর যোগও নিবিড়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই ঃ

> শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্যঘোষণার কৃত্রিমতা নেই।..... তাঁর কলমে গ্রামের যে সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজেই ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারিপাউডারি ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।

শুধু দারিদ্র্য নয়, গ্রামের বিচিত্র কদাচারের ছবি, আর বিশেষ করে নারীনির্যাতনের-ছবি, তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁকে জ্ঞান করা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের একজন সত্যকার উত্তর-সাধক। তাঁর বাস্তবতার চিত্রণে কৃত্রিমতা নেই একথা বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের উচ্চমর্যাদার ইংগিত করেছেন।

কিন্তু বাস্তব-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতে রোমান্টিক চেতনাও বেশ আছে। তার পরিচয় ফুটেছে সাঁওতাল জীবনের যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে। তাঁর সেইসব গল্প খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই শ্রেণীর লোকেদের

জীবনের ছবি আঁকার 'পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সাঁওতাল জীবন সম্বন্ধে শৈলজানন্দ যে সব গল্প লিখেছেন সেগুলো পড়ে আমাদের মনে হয়েছে রোমাণ্টিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে আর একটু কম থাকলে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা-বোধ হয়ত আরো উচ্চতর সার্থকতা লাভ করত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রোমাণ্টিক প্রবণতা আমাদের একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবল, তা বাস্তববাদের যতই ভক্ত তাঁরা হোন—তার পরিচয় পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়কে বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলা যায় না, কিন্তু তাঁর মধ্যে রোমাণ্টিক প্রবণতা একটা নতুন ফল ফলিয়েছে। তাঁর অতি প্রবল প্রকৃতি-প্রেমের তা হয়েছে অনুবর্তী—পেছনে থেকে নানাভাবে সরসতা যুগিয়ে চলার ভূমিকা তা নিয়েছে, সামনে এসে অদ্ভুত হয়নি। আমাদের একালের অনেক বাস্তববাদী রোমাণ্টিক চেতনার এই বৈধ ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারেননি।

প্রকৃতি বিভূতিভূষণের চিন্তায় ও অনুভবে এক অতিবড় সত্য। সাধারণত উপন্যাসে তেমন মনোভাবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না; তার কারণ, উপন্যাসের মুখ্য বিষয় প্রতিদিনের জীবন—প্রকৃতি তার পটভূমিকা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার অতিরিক্ত নয়। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতি পটভূমিকার চাইতে আরো অনেক বড় হযে উঠেছে। কিন্তু অনাড়ম্বর দৈনন্দিন জীবনের প্রতি বিভূতিভূষণের গভীর মমতাও তাঁর চেতনায় কখনো আবৃত হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক তিনি হতে পেরেছেন এরই গুণে।

বিভূতিভূষণ কিছু ভাল ছোট গল্পও লিখেছেন। তাঁর গভীর স্নেহময় প্রকৃতি ও প্রকৃতি-প্রেম সে সবে খুব হৃদ্য রূপ পেয়েছে।

তাঁর নিজস্ব জগৎ নিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্য শরৎ-উত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে বিভূতিভূষণকে শরৎ-উত্তর না বলে রবীন্দ্রোত্তর বলাই ভাল।

অন্নদাশঙ্কর রায়ঃ অন্নদাশঙ্করের জন্ম উড়িষ্যায়। সেখানে তাঁদের পরিবারের দীর্ঘকালের বসতি। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে উড়িষ্যায়। তিনি ওড়িয়াতে সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পবয়সেই তাঁর হাতে পড়ে 'সবুজ পত্র' ও রবীন্দ্রনাথের রচনা; তার ফলে সাহিত্য সম্বন্ধে

তাঁর অন্তরে নতুন চেতনার সঞ্চার হয়। ওড়িয়া ছেড়ে তিনি বাংলায় মন দেন।

সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে তাঁর নতুন চেতনা লাভের কথা তাঁর 'বিনুর বই' রচনাটিতে মনোরম করে বলা হয়েছে। তাতে দেখা যায় সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অল্প বয়সেই বহু কথা তিনি ভেবেছিলেন। বোধহয় তার বড় কারণ, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ একালের শ্রেষ্ট মনীষীদের রচনার সঙ্গে তিনি অল্প বয়সেই পরিচিত হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে, একটি বড় স্বপ্ন নিয়ে অন্নদাশংকর তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেছেন।

তাঁর অল্প বয়সের লেখা 'পথে প্রবাসে' তাঁকে ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী করে।

অন্নদাশঙ্কর যেমন সচেতন একালের দাবি সম্বন্ধে তেমনি সচেতন ভারতের ঐতিহ্যের দাবি সম্বন্ধেও। তাঁর উড়িষ্যায় জন্ম ও লালন তাঁর এই প্রাচীন ঐতিহ্য চেতনার মূলে হয়ত অনেকখানি।

কিন্তু সাহিত্যে, বিশেষ করে রস-সাহিত্যে সচেতনতাই একই সঙ্গে গুণের ও দোষের। অন্নদাশংকরের সাহিত্য-প্রচেষ্টায় সেই গুণ ও দোষ দুইয়েরই সাক্ষাৎকার আমরা পাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ অল্প বয়সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেন। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' পড়ে অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হয়ে ওঠেন। কালে কালে তিনি অনেক উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করেন, কিন্তু সে সবের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছোট গল্প আর মাত্র দুটি উপন্যাস পাঠকদের সেই আশা কিছু পরিমাণে পূরণ করেছে। তাঁর অবশিষ্ট রচনায়—তার পরিমাণ যে কম নয় তা বলা হয়েছে—তাঁর পর্যবেক্ষণ-শক্তির আর দেশের জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে, তার দুঃস্থ অংশের সঙ্গে, তাঁর অন্তরঙ্গ যোগের পরিচয় থাকলেও অর্থপূর্ণ সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে সেসব কমই উৎরেছে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের বাস্তব-বোধের অপরিণতি ও অদ্ভুতত্বের কথা আমরা বলেছি। তাঁদের ধারার বাইরে শৈলজানন্দের রচনার সামাজিক বাস্তব-বোধের উল্লেখযোগ্য পরিচয় আমরা পাই, তারও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে বাস্তববাদ বলতে যে রূঢ়, সাধারণত সমাজ-

ধর্ম বিরোধী, বাস্তবের রূপায়ণ বোঝায় তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়ই। তাঁর যে দুটি সার্থক উপন্যাসের কথা আমরা বলেছি সে দুটি হচ্ছে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আর 'পদ্মা-নদীর মাঝি'; আর তাঁর সার্থক গল্পগুলোর মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'সরীসৃপ'।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎ উত্তর বাংলা সাহিত্যে একটি জনপ্রিয় নাম।

তাঁর লেখাগুলো তিনটি বড় বিভাগে সাজানো যেতে পারে। প্রথম বিভাগে, রাঢ়ের গ্রাম্য পরিবেশের চিত্র (তিনি বীরভূমের লোক) - সেই পরিবেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রা, আমোদ-আহ্লাদ, তাঁর গভীর অনুরাগ আকর্ষণ করেছে। দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চবর্ণের লোকদের গৌরবময় ঐতিহ্যের ক্ষয়শীল দশার চিত্র—সেজন্য তাঁর বেদনা সুগভীর। তৃতীয়-বিভাগে, প্রাচীন জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক জীবনধারার সংঘর্ষের চিত্র —দুয়েরই মধ্যে যা ভাল তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

তারাশংকর প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন—তাঁর প্রথম স্তরের কয়েকটি বিশিষ্ট রচনায় গীতি-কবিতার সুর পাওয়া যায়। তাঁর দ্বিতীয় স্তরের লেখা ('ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি) থেকেই তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার সূচনা হয়। আর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', তাঁর ঔপন্যাসিক যশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠি'তে আঞ্চলিক জীবনের প্রথম অনেকখানি সার্থক ছবি আমরা পাই—তারাশংকরের 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় সেই আঞ্চলিক চিত্র এক অনন্য সাধারণ সার্থকতা লাভ করেছে। এব্যাপারে ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির সাফল্যের সঙ্গে তার সাফল্য তুলিত হতে পারে। তবে ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশংকরের দুর্বলতাও লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রে আমরা মাঝে মাঝে চরিত্র-সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছি। শরৎচন্দ্রের পরে বড় সার্থক উপন্যাস হচ্ছে বিভূতিভূষণের 'পথের-পাঁচালী' আর অন্নদাশংকরের 'সত্যাসত্য। সত্যাসত্যে অপ্রধান চরিত্রগুলো বেশি সার্থক হয়েছে আর 'পথের পাঁচালী'তে প্রায় সব চরিত্রই মোটের উপর সরল কিন্তু অসার্থক তারা হয়নি পরিবেশের সঙ্গে তাদের গভীর সঙ্গতির ফলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আর ছোট গল্পগুলোয়ও কিছু চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিদিনের পরিচিত মানুষদের দেখা সে সবে আমরা পাই – কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাত্রার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে সত্যকার বাস্তবধর্মী চরিত্র – শরৎচন্দ্রের ভাষায়, concrete রচনা—তাদের সাক্ষাৎকার আমরা পাই তারাশংকরের রচনার মধ্যেই, এই আমাদের একালের সাধারণ সাহিত্যিক ধারণা দাঁড়িয়েছে। এ ধারণার সমর্থনে বলা যায়, অন্তত তাঁর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় তারাশংকর ছিরুপাল, অনিরুদ্ধ, রহম, তিনকড়ি, বনোয়ারী, পরম ও করালীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যাদের বাস্তব না ভেবে পারা যায় না। তা ছাড়া এ সমস্ত উপন্যাসে শুধু পাত্র-পাত্রী নয়, পরিবেশও অত্যন্ত জীবন্ত—নদী, মাঠ, গাছপালা, ঋতুর পরিবর্তন এসব আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায় তারা সত্যই আছে, শুধু বইয়ের বর্ণনা তারা নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারাশংকরের মজ্জাগত যে দুর্বলতা সে দিকেও তাকাবার আছে। যে জীবন তাঁর অংকনের বিষয় হয়েছে তা চোখে দেখা জীবন যতখানি, স্মৃতি-বাহিত জীবনও যেন ততখানি, আর সে সবের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তনেরও যোগ ঘটেছে।

তারাশংকর বহু ছোট গল্পও লিখেছেন। সেসবে তাঁর বহু ধরণের অভিজ্ঞতা—তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক--প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর ছোটগল্প সাধারণত কাহিনী প্রধান। সুখপাঠ্য ছোটগল্প তিনি অনেক লিখেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ট ছোট গল্প বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা তাঁর রচনায় স্বভাবতই কম।

তারাশংকরের ভিতরে মরমী প্রবণতা আছে, তার ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু সেটি বিভূতিভূষণের মতো সহজ নয়, অনেকটা প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি থেকে জাত। তা হলেও তা দুর্বল ও গতানুগতিক নয়।

তারাশংকরের হৃদয়টি বিশাল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সেতুলনায় কম পরিচ্ছন্ন।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে একধরণের বাস্তববোধ ও কিছু অতিরিক্ত রোমাণ্টিক প্রবণতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের পরে প্রবোধকুমার সান্যালের মধ্যেও প্রায় তেমনি ধরনের বাস্তববোধ ও রোমাণ্টিক প্রবণতা আমরা দেখি। তবে অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের বাস্তববোধের চাইতে প্রবোধ সান্যালের

বাস্তববোধ অনেক স্থলে তীক্ষ্ণতর। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন।

তাঁর 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসখানি তাঁকে খ্যাতিমান করে। এই বইখানিতে তাঁর শক্তি ও দুর্বলতা দুয়েরই যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। এটিকে জ্ঞান করা যেতে পারে তাঁর উপন্যাসগুলোর প্রতিনিধি স্থানীয়।

একই সঙ্গে এমন অনেকখানি বাস্তবের বোধ আর স্বাপ্নিকতা, আর চিন্তা ও অনুভূতির শিথিলবন্ধ প্রকাশ—বলা যেতে পারে, এই আমাদের সমসাময়িক কথাসাহিত্যের বড় অংশের পরিচয়।

ছোট গল্প ঃ একালে কিছু ভাল ছোট গল্প লেখা হয়েছে সেদিকটায় একটু তাকানো যাক।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশে'র উল্লেখ করা হয়েছে। 'মহেশ' ভিন্ন শরৎচন্দ্রের উৎকৃষ্ট ছোট গল্প হচ্ছে 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী', 'মামলার ফল', 'বিলাসী', আর 'হরিলক্ষ্মী'। এ ভিন্ন তিনি অবশ্য আরো বহু গল্প লিখেছেন, যেগুলো চিত্তাকর্ষক। কিন্তু ছোট গল্পের যে বিশেষ গঠন ও আবেদন সেটি সেগুলোতে নেই। সেগুলো সাধারণত বড় গল্প বা উপন্যাস সংক্ষিপ্ত করে' বলা। কিন্তু ছোট গল্প ঠিক তাই নয়। ছোট গল্পে গল্প অবশ্য কিছু থাকবেই, কেননা, ছবি ফোটা চাই—ছবি না হলে শিল্প-সৃষ্টি আর কি করে হবে। কিন্তু গল্পের অংশ যদি পল্লবিত হয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে ছোট গল্পের রস নষ্ট হয়। ছোট গল্প যেন একটি সোনার আংটি যার উপরে এক কণা হীরে বসানো আছে। সোনাটুকু অবশ্য চাই, কিন্তু হীরের কণিকাটিই আংটিটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। তেমনি ছোট গল্প মর্যাদা পায় যদি তাতে জীবনের একটি খণ্ডাংশ হীরের কণার মতো একটি বিশেষ ভাবের দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়। শরৎচন্দ্রের কতকগুলো ছোট গল্প তেমন মহৎ মর্যাদা লাভ করেছে। 'মহেশ' বড় গল্প, কাহিনীর অংশ বেশ বড়, কিন্তু ছোট গল্পের জন্য চাই যে ভাবের হীরের কণাটি সেটিও এতে আছে—মহেশের মৃত্যু এবং গফুরের অন্তিম অভিসম্পাত কাহিনীটিকে অসাধারণভাবে কেন্দ্রীভূত করেছে। আর, একটি ছোট গল্প গল্পমাত্র হয়ে এটিযে জীবনকে ব্যাপক-ভাবে স্পর্শ করেছে তাতেও এর গৌরব খুব বেড়েছে। গভীর জীবন-বোধ ও জীবন-দর্শন যে সাহিত্যে বড় সম্পদ শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' তার এক ভাল প্রমাণ।

শরৎচন্দ্রের পরে ভাল গল্প লিখেছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী ও নরেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখিতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্ম-বিরোধের মধ্যেও আমি একটি অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই।

যাঁদের নাম করা হল তাঁদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পে এমনি বাস্তবিকতা আর অনির্বচনীয় রহস্যের সম্মিলন ঘটেছে। তাঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আমরা খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। যাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নি তাঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী খুব বিশিষ্ট। বাস্তবিক শরৎ-উত্তর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প লিখিয়েদের অন্যতম তিনি। তাঁর জগৎ অবশ্য সংকীর্ণ - মুখ্যত বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের নারী-জগৎ। কিন্তু সেই জগৎ তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে তীক্ষ্ন রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। আশাপূর্ণা দেবী উপন্যাসও লিখেছেন, কিন্তু ছোটগল্পই তাঁর বিশিষ্ট দান।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প বিশ্ব-বিখ্যাত—পরিমাণেও কম নয়। তাঁর পর শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আরো কয়েকজন বাঙালী লেখক-লেখিকা যে উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন তারও সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে।

একালের অনেক গল্পেই রয়েছে চিন্তার ও কথার খেলা, অথবা মারপ্যাঁচ। এরও একটা দাম আছে। আমাদের একালের লেখকরা যে তাঁদের পরিবেশ সম্বন্ধে অনেকখানি সজাগ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু সেই চেতনা দিয়ে তাঁরা যা সৃষ্টি করেছেন তার খুব বড় অংশই যে সাধারণ সাংবাদিকতা—তাই অত্যন্ত ক্ষণজীবি - তাও বোঝা দরকার।

এবার শরৎ-উত্তর কালের আরো কয়েকজন খ্যাতিমানের কথা আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা করবো।

মনোজ বসু ঃ বহু বই—গল্প, উপন্যাস, নাটক ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন ইনি। এঁর স্বচ্ছন্দ বর্ণন শক্তি সহজেই পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করে।

বাদা অঞ্চলের রূপ এঁর রচনায় ভাল ফুটেছে। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টিতে এঁর তেমন কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। এঁর একালের 'মানুষ নামক জন্তু'

উপন্যাস খানিতে ইনি রূঢ় বাস্তব রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা খুব চোখে পড়বার মতো হলেও সত্যকার সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেনি, এই মনে হয়েছে—বাস্তবতা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে বীভৎসতায় পরিণত হয়েছে। মাত্রাবোধ যেমন জীবনে অত্যাজ্য তেমনি সাহিত্যেও।

বনফুল ঃ ইনি বহু বই লিখেছেন, জনপ্রিয়ও ইনি। মোহিতলাল মজুমদার এঁর গল্প-উপন্যাসের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এঁর রচনায় তেমন কোনো সম্পদ পাইনি। এঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক কৌতুহল নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে – এঁর জনপ্রিয়তার মূলে সেটি হয়ত অনেকখানি। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতুহল থেকে উচ্চ সাহিত্যিক সম্পদ লাভ হতে পারে না। সাহিত্যিক সম্পদের অন্য নাম মানবিক সম্পদ—অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখ বিষাদ, নৈরাশ্য, উল্লাস, তাঁর জীবন-দর্শন, এসবের সার্থক রূপায়ণ। সেই রূপায়ণ এঁর বহু তথ্যে সমৃদ্ধ রচনাগুলোয় তেমন ঘটে ওঠেনি। হাস্য-কৌতুকের অবতারণা এঁর রচনায় বেশ নাম করা হয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ ইনি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাত। তবে উপন্যাসও লিখেছেন—তাতে চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশি করেছেন জীবন-দর্শন ব্যক্ত করতে – অবশ্য চরিত্রের মুখে। সচেতনতা এঁর নায়কের কাছে মহামূল্য—সেই সচেতনতার যদি কোন সামাজিক পরিচয় না থাকে তবুও। সেজন্য মৌনী তৈলঙ্গ স্বামীকে তিনি জ্ঞান করেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শাখাহীন তালগাছ তাঁর চোখে শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রতীক। 'ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে' এই তাঁর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

বলাবাহুল্য, এসব চিন্তা চমকপ্রদ হলেও একপেশে। এসব সত্যকার ভাবে জীবনধর্মী নয়, কেননা, প্রেমধর্মী নয়। এসবকে তাই স্বল্পমূল্য ভিন্ন আর কিছু বলা কঠিন।

দিলীপকুমার রায় ঃ 'দোলা', 'বহুবল্লভ' 'দুধারা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে ইনি সেদিন পাঠকদের মনোযোগ বেশ আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর এইসব বইতে অনেক ইয়োরোপীয় চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, আর প্রেমের বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে চেষ্টা করা হয়েছে। এসবই হয়ত হয়েছিল এই লেখাগুলোর প্রধান আকর্ষণস্থল।

রামপদ মুখোপাধ্যায় ঃ এঁর 'শাশ্বত পিপাসা' সেকালের 'স্বর্ণলতা'

জাতীয় উপন্যাস। বিদেশী প্রভাব থেকে আজো মুক্ত আমাদের যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ তার পারিবারিক জীবনের একটি অনাড়ম্বর বাস্তবধর্মী চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। এর নায়িকা প্রায় বালিকা বধূ, আস্তে আস্তে প্রায় দশ বৎসর ধরে শাশুড়ীর অপ্রসন্নতা সয়ে অবশেষে পত্নী ও জননীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল। প্রতিদিনের ছোটখাটো গৃহস্থালীর কাজ, শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা, এর ভিতর দিয়েই সে শিখলো, নারী স্বামী ও সন্তান নিয়ে সংসারধর্ম করেই তৃপ্ত।

এর অন্যান্য চরিত্রও সাধারণ বাঙালী মেয়ে ও পুরুষ—কিন্তু অনেকখানি স্পষ্ট করে আঁকা। বধূর পিতা রামজীবন দারিদ্র্যের জন্য কন্যা-জামাতাকে প্রতিশ্রুত যৌতুক দিতে অক্ষম হল, আর সেজন্য বেয়ানের অপমান নীরবে সহ্য করলো। চরিত্রগুলো সবই এমন যাদের প্রাণে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ্য, সুখ-দুঃখ, সবই ছোট মাপের, কিন্তু ছোট মাপের মধ্যে তারা বেমানান নয়, বরং সুসঙ্গত।

লেখক কি প্রাচীন ধারার পুনরুজ্জীবন চাচ্ছেন? হয়ত চাচ্ছেন। কিন্তু প্রাচীন বলে নয়, বাংলার পরিবেশ সুসংগত বলে। এমন পুনরুজ্জীবনের প্রতি শরৎচন্দ্রেরও দৃষ্টি ছিল সশ্রদ্ধ, যদিও 'শেষ প্রশ্নের' মতো বইও তিনি লিখেছিলেন।

কাজি ইমদাদুল হক: ইনি শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। আর বালক পাঠ্য রচনাই লিখেছিলেন বেশি। তবে উপন্যাসও একখানি লেখেন, আর সেটি খুব বিশিষ্ট। এঁর সেই উপন্যাসের বা সমাজ-চিত্রের নাম—'আবদুল্লাহ্'। এর রচনাকাল ১৯১৯ ২০। সেইকালেই 'মোসলেম ভারতে' এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পুস্তক আকারে এটি প্রকাশিত হয় বোধহয় ১৯৩৪ সালে। এতে বাংলার মুসলমান সমাজের, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত অংশের অবক্ষয়ের ছবি অতি নিপুণ হাতে আঁকা হয়েছে। লেখকের সুমার্জিত ও মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খুব লক্ষণীয়।

এই বইখানি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:..."বইখানি আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। দেখছি যে ঘোরতর বুদ্ধির দৈন্য হিন্দুকে সর্বপ্রকারে দুর্বল করে রেখেছে। তাই মুসলমানের ঘরে ধুতি-চাদর ত্যাগ করে লুঙি ফেজ পরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। একি মাটির গুণ!..."

বইখানির মর্যাদার দিকে দেশের শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আজো যোগ্যভাবে আকৃষ্ট হয়নি।

গোপাল হালদার ঃ প্রাবন্ধিক রূপে ইনি সুপরিচিত, তবে উপন্যাসও লিখেছেন, আর সে সবের মধ্যে 'একদা , 'অন্যদিন', 'আর একদিন', এই ত্রয়ী বিখ্যাত।

এই বই তিনখানি অর্থপূর্ণ হয়েছে দুইভাবে—কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের এক জোরালো বিবৃতিরূপে, আর উদার মানসিক জগৎ থেকে কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ক্ষেত্রে লেখকের বেদনাময় নব জন্মলাভের ইতিহাস রূপে। এই শেষোক্ত রূপেই রচনাগুলো বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

অমরেন্দ্র ঘোষ ঃ ইনি বামপন্থী। কিন্তু বামপন্থী চিন্তা এঁর ভিতরে যত প্রবল তার চাইতে অনেক বেশী প্রবল দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানুষের জন্য এঁর দরদ। অনেকগুলো উপন্যাস ইনি লিখেছেন ; কিন্তু সে সবের মধ্যে খুব বিশিষ্ট হয়েছে 'চরকাশেম'। বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলের পদ্মার এক নতুন চর কেমন করে আবাদ হল বহু দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে, আবাদ হল প্রধানত ঐ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের অসাধারণ শ্রমের দ্বারা—এইই বইখানির প্রধান বিষয়। এই সঙ্গতিহীন মানুষগুলোর জান্তব জীবনের বলিষ্ঠ শ্রী-ছাঁদ অমরেন্দ্র ঘোষের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এতে যেসব মেয়ে চরিত্র দাঁড় করানো হয়েছে তারাও প্রাণবন্ত—তাদের কর্মনিপুণতা, কোন্দলপ্রিয়তা, বংশগর্ব, সবই লেখকের সপ্রেম দৃষ্টির সামনে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের বামপন্থীদের লেখা মুষ্টিমেয় সফল উপন্যাসের মধ্যে 'চরকাশেম' অন্যতম—হয়ত শ্রেষ্ঠতম। সুবিখ্যাত Growth of the Soil-এর সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ ইনি উপন্যাসও লিখেছেন, কিন্তু এঁর বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে হাসির গল্পে। সেই সব হাসি-তামাসার ভিতর দিয়ে জীবন সম্বন্ধে, এঁর গভীরবোধও যে ব্যক্ত হয়েছে তাতেই এঁর হাসির গল্পগুলো এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ বিহারবাসী বাঙালী। প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' লিখেই ইনি ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হন। উপন্যাসটি মনস্তত্ত্বমূলক। পিতা স্কুলের শিক্ষক, গান্ধীবাদী, আর প্রকৃতিতে কিছু খেয়ালী। তাঁর বড় ছেলে বিলু সুশিক্ষিত ও স্বদেশ-প্রেমিক ৪২-এর আন্দোলনে ধরা

পড়েছে আর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা লাভ করে তার নির্জন 'সেলে' দিন গুণছে। তার দণ্ডাজ্ঞার মূলে তার ছোট ভাই নীলু বিলুদের সে জ্ঞান করে ফ্যাসিস্ট। পরিবারের এমন পরিণতিতে বিলু ও নীলুর মা আকুল হয়ে ভাবছেন গান্ধীদেবতা কি করলেন—তাঁর নির্দেশ মতো চলে তাদের জীবনে একি পরিণতি ঘটলো।

মনোবিশ্লেষণে লেখক কুশলী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরিত্রগুলো যে ভাল দাঁড়িয়েছে তা বলা যায় না। বিলু সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী, কিন্তু মৃত্যুচিন্তা তাকে আকুল করেছে বেশি। তার ফলে তার চরিত্রের আর কোন দিক তেমন ফোটেনি। শেষ পর্যন্ত বিলু অবশ্য মুক্তি পেল।

এঁর অন্যান্য রচনাও মনস্তত্ত্বমূলক। তবে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ ধূর্ত ঢোঁড়াইয়ের রকমসকম ও বাকভঙ্গি বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার : এঁর 'গড়শ্রীখণ্ড' বড় উপন্যাস। বহু চরিত্রের অবতারণা তাতে হয়েছে। লেখক চিন্তাশীল—জীবন সম্বন্ধে গভীর চিন্তার পরিচয় মাঝে মাঝে দিয়েছেন। এক জায়গায় বলেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিক হওয়ার চাইতে প্রথম সারির বাঁচিয়ে হওয়া ভাল। কিন্তু বাঁচা বলতে কি বোঝায়—কোন্ পথে বাঁচা যায়, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবির অবতারণা নেই। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কালের কথা এতে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। একঘর জমিদার আর সেই অঞ্চলের মুসলমান বাসিন্দাদের কাহিনী এর প্রধান বিষয়। জমিদার-পরিবার সুশিক্ষিত; কিন্তু সংকটকালে যথার্থ করণীয় কি তা তাঁরা ভেবে পেলেন না। অবশেষে দেশ ত্যাগ করলেন। মুসলিম লীগের প্রচারণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কেমন একটি বিশিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি হল সে-ব্যাপারটি এতে দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বহু গল্প উপন্যাস লিখেছেন ইনি। এঁর গল্পের খ্যাতিই বেশি। এঁর গল্পগুলো সহজেই পাঠকদের মন আকর্ষণ করে। কিন্তু আকর্ষণ করে ইনি যে একটু বেশি চড়া রং দিয়ে ছবি আঁকেন অনেকটা সেইজন্য—অবশ্য আঁকেন যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে। এঁর একটি বিখ্যাত গল্পের নাম 'টোপ'। তাতে ধনীদের অমানুষিকতা অবিশ্বাস্য রকমে উৎকট হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : এঁর নাম করা বই হচ্ছে 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'—

হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস। মানিকপুরের লোহার কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের ভিতরকার দ্বন্দ্বের কাহিনী এর মুখ্য বিষয়। সেইসঙ্গে শ্রমিকদের, মালিকদের ও তাদের পরিজনদের বিচিত্র চরিত্র ফোটাবার চেষ্টা এতে করা হয়েছে।

'ইস্পাতের স্বাক্ষর' যে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এটিকে খুব সার্থক বলা যায় না। এটিকে বলা যেতে পারে মানিকপুরের লোহার কারখানার পুরাণ—যেমন 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'আকাশ পাতাল' এক একটি পুরাণ। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ও পুরাণজাতীয়; তবে তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদা এঁদের চাইতে বেশি।

বর্ণনার দিকে একালের লেখকদের মন বেশি গেছে। সে তুলনায় চিন্তার দায়িত্ব তাঁরা কম নিতে চাচ্ছেন। এ যুগের এই একটি লক্ষণীয় প্রবণতা।

অবধূত ঃ অল্পদিনেই ইনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। আমাদের কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও এঁর লেখার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ভিন্ন আর কোনো বইতে সাহিত্যিক সম্পদ আমরা তেমন কিছু পাইনি। অদ্ভুত বর্ণনা, উদ্ভট আখ্যায়িকা, এইসব অবশ্য পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে। হতে পারে এই সবই তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে। এঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' একটি দুর্গম তীর্থ পথের কাহিনী। পথের দুর্গমতা চমৎকার ফুটে উঠেছে এতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুস্তর পথের যাত্রীদের, বিশেষ করে উট চালকদের চেহারা। এতেও কিছু কিছু অদ্ভুত বর্ণনা আছে। তবে এতে গুণের ভাগ অনেক বেশি।

দোষে-গুণে মেশা জীবন্ত চরিত্র দাঁড় করাতে অবধূতের খুব আগ্রহ। বলা বাহুল্য এমন চেষ্টা প্রশংসার্হ। কিন্তু তাঁর সার্থকতার পথে বাধা হয়েছে অদ্ভুত ও উদ্ভটের প্রতি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ অল্প বয়সেই ইনি লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু এঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' আমাদের একালের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হয়েছে। এতেও আঁকা হয়েছে একটি আঞ্চলিক চিত্র—পূর্ববঙ্গের ভৈরববাজারের অদূরবর্তী তিতাস নদীর পারের জেলে-কৈবর্তদের ও সেই অঞ্চলের মুসলমান চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি। বহু চরিত্র এতে আঁকা হয়েছে কিন্তু ভাল ফুটেছে খুব কম চরিত্রই। কৈবর্তদের জীবনের

দুঃখ-ধান্ধা, বিশেষ করে তিতাস মরা নদীতে পরিণত হওয়ার ফলে তাদের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল, সেইটি লেখক যত্নের সঙ্গে এঁকেছেন, আর সমস্ত প্রাণ দিয়ে এঁকেছেন সেই অঞ্চলের প্রকৃতির ছবি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কৈবর্ত-সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে মুখ্যত একজন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি সেই পরিচয়টি এতে বিশেষভাবে ফুটেছে।

সমরেশ বসু ঃ বাস্তবপন্থী লেখক হিসাবে ইনি অল্পদিনেই খ্যাতিমান হয়েছেন। এঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তররঙ্গ'তে লরেন্সীয় ভঙ্গির যৌন আকর্ষণ উদ্দাম রূপ পায়। এঁর পরেপরের উপন্যাসগুলোয় শ্রমিক জীবনের বিভিন্ন স্তরের রূপাঙ্কনের চেষ্টা আছে। যেমন তাঁর 'গঙ্গা'য় ভাগীরথীর জেলেদের বাস্তব জীবনের চিত্র আঁকতে তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দাম রোমান্টিক প্রকৃতির ফলে সে ছবি আঁকার ক্ষমতা আজও তাঁর লাভ হয়নি। তাঁর 'গঙ্গা'র নায়ক তেঁতুল বাগ্দীর ছেলে বিলাস লক্ষণীয় ভাবে জান্তব বীর্যবত্তার অধিকারী। কিন্তু তাঁর মেছো জীবনের সত্যকার রূপায়ণের চাইতে লেখক বেশি মন দিয়েছেন হিমি ও তার ভিতরকার রোমান্স জমিয়ে তুলতে।

কিছু বেশি রোমাণ্টিক-প্রবণতা আমাদের একালের অনেক বাস্তবপন্থী লেখকের পথে বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রফুল্ল রায় ঃ চেষ্টা করেছেন আসাম সীমান্তের নাগাদের জীবন সম্বন্ধে একটি বড় উপন্যাস দাঁড় করাতে—সেই বইটির নাম দিয়েছেন 'পূর্বপার্বতী'। তরুণ-লেখক সুলভ রোমাণ্টিক-প্রবণতা সহজেই এঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নাগাদের জীবনের নানা দিকের নানা ধরনের ছবি এতে যা দাঁড় করাতে পেরেছেন তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আঞ্চলিক চিত্র অংকনের দিকে আমাদের একালের কিছু কিছু শক্তিশালী লেখক প্রবণতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রফুল্ল রায় তাঁদের অন্যতম।

গোলাম কুদ্দুস ঃ ইনি একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্ট রূপে পরিচিত। এঁর 'মরিয়ম' উপন্যাস খানিতে কমিউনিষ্ট চিন্তা ও প্রচারধারা পুরোপুরিই দেখা যায়; কিন্তু সমস্ত প্রচারণা ডিঙিয়ে এতে দুঃস্থ মানবতার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে—এতেই এর বিশেষ মূল্য।

গ্রামাঞ্চলের মুসলমান সমাজের একটি মেয়ে এর নায়িকা; তাই কমিউনিস্ট জনসমাবেশে তার বক্তৃতা স্বভাবত কিছুটা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু তার গভীর আন্তরিকতার গুণে তার চরিত্র শেষ পর্যন্ত অবাস্তব হয়নি।

অবিনাশ সাহা ঃ কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিশিষ্ট হয়েছে মাত্র একখানি। সে খানির নাম 'প্রাণগঙ্গা'।

এই উপন্যাসখানিতে ঢাকা জেলার সাভার অঞ্চলের চাষী ও মহাজনদের জীবন ইনি চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। এই অঞ্চলের সাধারণ জীবন-যাত্রা, দৈব-দুর্বিপাকের ফলে তাদের দুর্ভোগ, ফসল ভাল হলে তাদের সচ্ছলতা, তাদের বিশেষ ভাষা, সবই আঁকা হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। কিন্তু এই বইখানিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে লেখকের অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা। হয়ত ইনি নিজে মহাজন শ্রেণীরই লোক। কিন্তু সেই মহাজন শ্রেণীর লোকদের দুরন্ত লোভের ফলে চাষীদের জীবনে সময় সময় অনর্থ কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, আশ্চর্য অকপটতার সঙ্গে সেই চিত্র ইনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লীর জীবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সহজেই বুঝবেন লেখক অতিরঞ্জন করেননি আদৌ, আর লুকোননি কিছুই। বইটিতে একটি মেলার বর্ণনা আছে। তাতেও লেখকের সত্যনিষ্ঠা লক্ষণীয় হয়েছে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন তিনি অশ্লীল, এমন কি বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করেছেন। কিন্তু আসলে তাঁর লক্ষ্য পল্লীর জীবনের বিভিন্ন দিকের একটি অকৃত্রিম পরিচয় দেওয়া।

আবদুল জব্বার ঃ এঁর গল্পসংগ্রহটির নাম 'বুভুক্ষা'। সমঝদারদের দৃষ্টি কিছু আকর্ষণ করেছেন তাদের অভাবালু বাস্তববোধের জন্যে আর বিশেষ করে সেই বাস্তবের রূপায়ণের ক্ষমতার গুণে। বজবজের মিল অঞ্চলের গতর খাটিয়েদের সন্তান ইনি, চারপাশের লোকদের প্রতিদিনের জীবন সম্বন্ধে এর মধ্যে যে অভিজ্ঞতা এঁর হয়েছে তা অনন্যসাধারণ।

পূর্বঙ্গের (বাংলাদেশ) কথাসাহিত্য ঃ দেশ বিভাগের পূর্বে ও-অঞ্চলে ঔপন্যাসিক রূপে খ্যাতিমান হয়েছেন দুইজন চৌচির' প্রভৃতির লেখক আবুল ফজল আর 'মোমেনের জবানবন্দী'র লেখক মহাবুব-উল-আলম। ও-অঞ্চলের আবদুল রউফের 'পথের-ডাকে'ও একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হয়েছিল, কিন্তু সেটি দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল বহু পূর্বেই।

বিভাগোত্তর কালে গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে সব লিখিয়ে নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সাহেদ আলী, আলাউদ্দীন আলআজাদ আর আবু ইসহাক।

শরৎচন্দ্রে আমরা দেখেছি অসাধারণ অঙ্কন-ক্ষমতা আর অসাধারণ দরদ। তার সঙ্গে সবল বিচারবোধও মাঝে মাঝে দেখেছি। বিচারের দুর্বলতাও যে না দেখেছি তা নয়।

শরৎ-উত্তর সাহিত্যে আমরা কি দেখলাম?

দেখলাম এযুগেও অঙ্কন ক্ষমতার মান মোটের উপর প্রশংসনীয়। তবে এযুগে দরদের জায়গা দখল করেছে অথবা করতে চাচ্ছে - কৌতূহল, আর কৌতূহলের রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচারবোধ শিথিল হয়েছে প্রায় সর্বত্র। ব্যতিক্রমও কিছু কিছু চোখে পড়েছে; তবে এ যুগের সাধারণ চেহারা এই। দরদে এযুগে সহজেই লেগেছে রাজনৈতিক ঝাঁজ—এও দেখা যাচ্ছে।

সোজা কথায় বলা যায়—এ যুগে আমাদের সাহিত্যিক মান মোটের উপরে নেমে গেছে এই আমাদের ধারণা হয়েছে।

কেন এমন হল? সে সম্বন্ধে অবশ্য অনেক ভাবা যায়। কৌতূহলী পাঠকরা এ সম্পর্কে আমার 'বাংলার জাগরণ' পড়ে দেখতে পারেন। আবার এও বলা যায়—ওঠা-পড়া জগতের নিয়ম।

কেউ কেউ বলতে পারেন, নতুন নতুন দিগন্ত এযুগে আমাদের সাহিত্যিকদের সামনে খুলে গেছে—তার দাম তো কম নয়।

কম নয় নিশ্চয়ই; তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে সাহিত্যে বাঙালীরা পুরাতনের রোমন্থনই করছে না কৌতূহল নতুন নতুন পথে তাদের হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু বিচার করে দেখবার আছে সেই কৌতূহলেরও মর্যাদা—অকৃত্রিম সৃষ্টিধর্মী কৌতূহল বলতে যা বোঝায় সেটি কি তাই?

আমরা যতটা দেখেছি তাতে সৃষ্টিধর্মী কৌতূহলের পরিচয় আমরা এযুগে যে পাইনি তা নয়; কিন্তু অনেক বেশি পেয়েছি যে-কৌতূহলের পরিচয় তাকে সৃষ্টিধর্মী বলা যায় না। তা থেকে ভাল সাহিত্যিক ফলও আমরা পাইনি। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও যা গূঢ়ভাবে সত্যাভিসারী নয় সফলতা তাকে এড়িয়ে যায়।

হয়ত বলা হবে অনেক বেশি লোক আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাজির; তাতে সাহিত্যের সাধারণ মান নেমে যাওয়া স্বাভাবিক; সব দেশেই সম-সাময়িক সাহিত্যের বড় অংশ সাংবাদিকতা।

কিন্তু উন্নত সাহিত্য যেসব জাতির তারা এমন দশায়ও সাহিত্য আর সাংবাদিকতা এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। আমরা আছি কি?

প্রতিভা ফরমায়েশে গড়া যায় না; তার জন্য চিরদিনই অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু সাহিত্যিক রুচি অনেকটা চর্চা-সাপেক্ষ। উন্নত সাহিত্য উন্নত জাতির জন্য চাইই; উন্নত সাহিত্যিক রুচিও তেমনি। সাহিত্যিক বিপর্যয়ের দিনে সেই রুচি জাতির জন্য হতে পারে এক বড় অবলম্বন। (সংক্ষেপিত)

সাম্প্রতিককাল ও শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার

নারায়ণ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর চুয়াল্লিশ বছর কাল গত হয়েছে। এই প্রায় চার-পাঁচ দশক সময়সীমার মধ্যে বাংলা কথাসাহিত্যের অনেক পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গল্পে উপন্যাসে সমাজচেতনার আদর্শের প্রভাব কমে গিয়ে ব্যক্তিতন্ত্র, অন্তর্লীনতা, নির্জ্ঞান মনের জটিল-কুটিল চিন্তার রূপায়ণ, 'চেতনা-প্রবাহ' নামীয় নূতন রীতির আশ্রয়ে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার প্রয়াস, যৌনতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রভাবের মাত্রা ও পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ সাহিত্যের সমাজমুখী মননের ঐতিহ্য হ্রাস পেয়ে তার জায়গায় ব্যক্তিমুখী মননের ঐতিহ্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি ঘটে চলেছে। এটাকে শুভলক্ষণ বলতে পারিনে। কেন পারিনে তার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বাংলা কথাসাহিত্যের তিন শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই সমাজাশ্রয়ী লেখক। এই দুই প্রসিদ্ধ লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর গঠনে বহুতর তারতম্য ছিল,—দৃষ্টান্তস্বরূপ একের ভিতরে ছিল নীতিবাদের আধিক্য, অন্যজনের মধ্যে করুণার কোমলতা, তৎসত্ত্বেও এই এক 'সামান্য লক্ষণ' এঁদের দুইয়ের রচনার মধ্যে দেখা যায় যে, এঁদের কেউই সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদ বা 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। উভয়েই প্রবলভাবে সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব স্বীকার করতেন, তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্য সৃষ্টিকে সমাজ কল্যাণাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেই তাঁরা বরাবর লেখনী চালনা করে গেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কলাকৈবল্যবাদের তত্ত্ব পুরোপুরি মানতেন না, যেহেতু তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের কবি সেই কারণে তাঁর কথাসাহিত্যে বারে বারেই কাব্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং কাব্যকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত গীতলতার (লিরিসিজম) সংস্কার তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের কাঠামোর মধ্যে অনুলিপ্ত হয়ে গেছে। এর ফলে লাভ-অলাভ

দুই-ই হয়েছে। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য অনবদ্য সৃষ্টির সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তার সামাজিক উপযোগিতার দিক কমে গেছে। কাল্পনিকতার ঐশ্বর্যে ও কাব্যস্বাদে রবীন্দ্র-উপন্যাস ও ছোটগল্প চেখে চেখে ভোগ করবার মত এক অপূর্ব শিল্পকর্ম (যেমন তাঁর ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র, পোষ্টমাস্টার, জীবিত ও মৃত, অতিথি প্রভৃতি গল্প এবং ঘরে-বাইরে উপন্যাস)। কিন্তু সেগুলিতে সমাজ-চৈতন্যের বস্তুভাগ অল্প। সমাজ-চৈতন্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের অপেক্ষা সমৃদ্ধতর, একথা না মেনে উপায় নেই। তবে সঙ্গে-সঙ্গে এও মানতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস উপরের বিবৃতির এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই উপন্যাসটি একাই একশো। এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এপিক উপন্যাসই শুধু নয়, এর ভিতর অত্যন্ত প্রখর সমাজচেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে এবং এক মহৎ মানবিক আবেদনে এর বক্তব্য সমৃদ্ধ। বাংলা কথা-সাহিত্যের সবচেয়ে সারবান ও তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসরূপে যদি কোন উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে হয় তো নিঃসন্দেহে সেই মর্যাদা গোরা উপন্যাসের প্রাপ্য।

তবু সব জড়িয়ে বিচার করে একথা বলতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজকল্যাণাদর্শের ধারাবাহী লেখক শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে, বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের সমাজকল্যাণের ধারণায় বিস্তর পার্থক্য ছিল, যার ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি গল্পোপন্যাসই সমাজচেতনার আভায় দীপ্ত, তবে তারই মধ্য থেকে কতকগুলি রচনাকে যদি আলাদা করে বাছাই করতে হয় তো এইগুলির উল্লেখ করতে হয়—পথনির্দেশ, বিলাসী, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, একাদশীবৈরাগী, অনুরাধা প্রভৃতি গল্প এবং বড়দিদি চন্দ্রনাথ, পল্লীসমাজ, পণ্ডিতমশাই, অরক্ষণীয়া, দেনা-পাওনা, বামুনের-মেয়ে, শ্রীকান্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, চরিত্রহীন, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন, জাগরণ (অসমাপ্ত) প্রভৃতি উপন্যাস। এখানে এসব গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তুর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যটির কথা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বলতে হবে যে, কথাসাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষই তাঁর একমাত্র ধ্যেয় ছিল না, শিল্পোৎকর্ষের প্রয়োজনের প্রতি পুরামাত্রায় অবহিত হয়েও তিনি তাঁর সাহিত্যকে সমাজচেতনায় মণ্ডিত করতে যত্নশীল থেকেছেন। সেই সমাজচেতনারও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে, একটা

বিশেষ বক্তব্য আছে, একটা কল্যাণের দিক আছে। বাংলার গ্রামসমাজের সামন্তবাদী শোষণ, অবদমন ও অত্যাচার, কৃত্রিম সামাজিক অনুশাসনের চাপে ব্যক্তিত্বের পেষণ ও অবলোপ, গ্রামসমাজে নারীর অসহায় ও পরনির্ভর অবস্থা, তথাকথিত গ্রাম্যসমাজপতিদের জমিদার জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের সহায়তায় পরপীড়নের উল্লাস ও ক্রূরতা, সাধারণ শ্রমজীবী-মানুষের উৎকট দারিদ্র্য ও অবলম্বনহীনতা, নীচু জাতের লোকেদের প্রতি বর্ণশ্রেষ্ঠত্বাধিকারী ও বিত্তবান শ্রেণীর লোকেদের উদ্ধত ব্যবহার, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণে অজ্ঞতা কুসংস্কার ও প্রথার দৌরাত্ম্যের দাপট, যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে অবতারণা করে শরৎচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টিকে সচেতনভাবেই সমাজের অভিমুখে চালনা করতে চেয়েছেন, নিছক শিল্পোপভোগের সীমায় তাকে বেঁধে রাখতে চাননি।

নাগরিক পটভূমিযুক্ত উপন্যাসগুলির এলাকায় এলেও দেখতে পাই এসব উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধের মনোভাব (পথের দাবী), নারীর বিদ্রোহ ও আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা (শ্রীকান্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব এবং চরিত্রহীন), নারীজাগরণের আদর্শের বলিষ্ঠ শিল্পরূপ (শেষ প্রশ্ন) প্রভৃতি। প্রকারান্তরে এসব চিত্র-চরিত্রও সমাজচৈতন্যেরই প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তির নির্জ্জন মনের কারিকুরি ফুটিয়ে তোলার অন্তর্নিবেশমূলক শিল্পাভ্যাস থেকে এই শিল্পের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই শিল্পের আবেদন মোটেই ব্যক্তি-সাক্ষিক নয়, পরন্তু সামূহিক, অর্থাৎ সমাজের সমষ্টিভূত বিবেকের কাছেই মূলতঃ এই শিল্পের আবেদন। তাছাড়া, এই শিল্প তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই বহির্মুখ, অন্তর্মুখ নয়। স্বরূপতঃ এই শিল্প বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তব-ঘনিষ্ঠ, গীতলতার সুরে বাঁধা কথাসাহিত্যের মত এই রচনা কল্পনানির্ভর নয়, নয় তা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিমনের হিজিবিজি পাঁচালী। শরৎ সাহিত্যের বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা সেই সাহিত্যের এক প্রধান সম্পদ।

শরৎ সাহিত্যের এই সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা যদি শরৎ-পরবর্তী ও সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের পর্যালোচনা করতে যাই তাহলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কতকগুলি বিসদৃশ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা দেখতে পাবো যে, শরৎচন্দ্রের শেষ

জীবনের সমসাময়িককালে অথবা অব্যবহিত পরে বাংলা ভাষায় যে সব কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ লেখকবর্গ এবং আরও কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের ধারাটিকে মোটামুটি অনুবর্তন করে চলেছিলেন কিন্তু এ ভিন্ন অন্যান্য যেসব লেখক সমসাময়িককালে সক্রিয় ছিলেন ও পরে বাংলা কথা-সাহিত্যের বিভাগে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের রচনার ধারার ভিতর শরৎচন্দ্রের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না। অন্নদাশঙ্কর রায় কিংবা বুদ্ধদেব বসু অন্যথা—শক্তিশালী কথাকার হলেও তাঁদের রচনার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। তাঁরা নাগরিক মানসিকতার লেখক, বুদ্ধির বৈদগ্ধ্য এঁদের রচনার এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজের গ্রামীণ স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা কিংবা সামাজিক নিপীড়নের কাহিনী শরৎচন্দ্রের কল্পনাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল, কিন্তু এঁদের লেখায় সেই চেতনার ছিটেফোঁটা পরিচয়ও পাওয়া যায় না। পাওয়া সম্ভবও ছিল না, কারণ অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব অথবা তাঁদের স্বগোত্রীয় লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কিংবা সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখরা একান্তভাবে নগরজীবনের পশ্চাৎপটকে অবলম্বন করে তাঁদের কথাসাহিত্যের প্রাকার গড়ে তুলেছিলেন, এবং সেই কথাসাহিত্যের পাঠ্যবস্তুর মধ্যেও ব্যক্তির সমস্যা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, মানুষের সামূহিক জীবনের সমস্যা তার সিকির-সিকি মনোযোগও লাভ করতে পারেনি। অন্নদাশঙ্করের গল্পে-উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে মনঃ প্রকর্ষদীপ্ত পরিশীলিত নাগরিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত স্তরের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নরনারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকট থেকে উদ্ভূত নানাবিধ জটিল পরিস্থিতির চিন্তাপ্রধান বর্ণনা, আর বুদ্ধদেব বসুর গল্পে-উপন্যাসে রূপ পেয়েছে ব্যক্তিমনের অহংচেতনার তথা দৈব কামনা-বাসনার অতি উচ্ছলিত কিন্তু সুঠাম অভিব্যক্তি। কিন্তু এঁদের দুইয়ের রচনার এই এক প্রকৃতিগত সাদৃশ্য যে, তাঁদের দুজনেরই রচনাভঙ্গী অতিশয় বুদ্ধি-উচ্ছল ও স্বাদু, তবে দুয়েরই বিচরণ একান্তভাবে ব্যক্তিকতার স্তরে এবং সেই ব্যক্তিকতাও আবার অর্থনীতির পৃষ্ঠপট বর্জিত। শরৎচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টির সামান্যমাত্র ছাপও এঁদের লেখার মধ্যে চোখে পড়ে না।

ধূর্জটিপ্রসাদই আমাদের সাহিত্যে প্রথম 'চেতনা প্রবাহ' তত্ত্বকে উপন্যাসে রূপদান করবার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রবাহ-আবর্ত-মোহানা নামীয় ট্রিলোজী অনায়াসেই এই পাথিকৃত্যের দাবি করতে পারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই ধারাটিকে অনুসরণ করেন। তাঁর বৃত্ত, রাত্রি, সৃষ্টি, কস্মৈ দেবায় প্রভৃতি উপন্যাস এ কথার প্রমাণ। অবশ্য সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মরামাটি নামক উপন্যাস গ্রামভিত্তিক রচনা এবং বাস্তবতার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়। এটিকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মূল ধারার রচনারীতির ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায়।

শরৎ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারকে সবচেয়ে সার্থক-ভাবে বহন করেছেন বলতে পারা যায় এই কয়জন লেখক—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ, মানিক ও অংশতঃ মনোজ বসু। একে একে এঁদের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলির উপর চোখ বুলনো যেতে পারে।

তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের দেখা গ্রামের পটকে আরও অনেকদূর সম্প্রসারিত করে নিয়ে গেছেন। শরৎচন্দ্র সেক্ষেত্রে তাঁর শিল্প মনোযোগ মূলতঃ গ্রামীণ মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষগুলির জীবনলীলার উপর কেন্দ্রীভূত রেখেছিলেন, তারাশঙ্কর সেইস্থানে কেবলমাত্র এই দুটি স্তরে তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের একেবারে নীচুতলার জীবনের কেন্দ্র মধ্যেও তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কাহার, বাগ্দী, বাজীকর, বেদে, সাপুড়ে (সাপুড়ে জীবনের চিত্র অবশ্য শরৎ-সাহিত্যেও বিলক্ষণ পাওয়া যায় , জেলে, মালো নমঃশূদ্র গ্রাম্য ম্যাজিক ও সার্কাস দলের খেলোয়াড়, খেলোয়াড়নী, ঝুমুরদলের অভিনেত্রী ও কবিয়াল, মুটে মজুর কুলি-কামিন, অন্ধ ভিখারী প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের চরিত্র তারাশঙ্করের সাহিত্যে ভিড় করে এসেছে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত, রকমারি চরিত্রের সে এক সারিবদ্ধ মিছিল বলা যায়। ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্র্যে এখানে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের পরিধিকে অতিক্রম করে গেছেন।

অন্যপক্ষে, আঞ্চলিকতার রূপকর্মের ছাঁচেও এঁদের দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎচন্দ্র রূপায়িত করেছেন প্রধানতঃ হাওড়া ও হুগলী জেলার গ্রামকে, আর তারাশঙ্কর একান্তভাবে তাঁর স্ব-জেলা বীরভূমের পরিবেশ ও মানুষকে তাঁর মনোযোগের বিষয়ীভূত করেছেন। বীরভূমের ভূ-প্রকৃতি তারাশঙ্করের রচনায় বিশেষ শিল্পসিদ্ধ মূর্তি লাভ করেছে (ধাত্রী

দেবতা, গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা প্রভৃতি উপন্যাসের নিসর্গ বর্ণন স্মরণীয়)। তবে শরৎচন্দ্রের সমাজভাবনার সঙ্গে তারাশঙ্করের সমাজভাবনার পার্থক্য আছে। উভয়েই সমাজসচেতন লেখক এবং বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের সমস্যাগুলির বিষয়ে অবহিত। কিন্তু শরৎচন্দ্র যেখানে বাংলার গ্রামজীবনের অনুষঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের দোষ-ত্রুটি দেখিয়েই থেমে গেছেন, তারাশঙ্কর তার উপরে একটি নতুন আয়তন যোগ করেছেন এইদিক দিয়ে যে, তিনি সামন্তবাদের প্রতীক জমিদারের সঙ্গে গ্রামের নয়া ধনিকের দ্বন্দ্বের ছবিও তাঁর একাধিক গল্পে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন (জলসাঘর, কালিন্দী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, অভিযান সন্দীপন পাঠশালা প্রভৃতি গল্পোপন্যাস স্মর্তব্য), যার ছবি শরৎ-সাহিত্যে নেই। এক বিষয়ে অবশ্য শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করে প্রচণ্ড মিল—তাঁদের রক্ষণশীলতার প্রকৃতিতে। শরৎচন্দ্র গ্রামীণ-অবদমন-শোষণ-অত্যাচার-অবিচারের কঠোর সমালোচক হলেও যে সমাজব্যবস্থার আশ্রয়ে এই অন্যায়গুলির পরিপুষ্টি তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দেবার কথা কোথাও বলেননি পক্ষান্তরে গ্রামের অপসৃয়মান জমিদারী ব্যবস্থার প্রতি তারাশঙ্করের মমত্ব স্পষ্ট। তারাশঙ্কর নিজে একজন ছোটখাট জমিদার ছিলেন, সেই কারণেই হয়ত জমিদারতন্ত্রের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে মুখ্যতঃ গ্রামীণ নিসর্গের কবি-রূপকার হলেও তাঁর রচনায়ও বাস্তবতার উপাদান অনুপস্থিত কিংবা অলক্ষ্য নয়। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এইক্ষেত্রে তাঁর মিল যে, তিনি গ্রাম্য সমাজের অসহনীয় দারিদ্র্যকে এক অনস্বীকার্য অলঙ্ঘনীয় সর্বপ্রধান রিয়ালিটির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাঁর যা কিছু নিসর্গ-প্রীতি প্রকৃতি-প্রেম অলৌকিকত্বের চেতনা যাই বলা যাক, তার সবই বিকাশ লাভ করেছে গ্রাম-জীবনের এই মৌলিক তথ্যটিকে ঘিরে—সর্বব্যাপী দারিদ্র্য। পথের পাঁচালী বলুন, অপরাজিত বলুন, ইচ্ছামতী·দেবযান বলুন, অশনি সংকেত বলুন সর্বত্র এই মৌলিক তথ্যের স্বীকৃতি। মৃত্তিকা-সংলগ্ন মর্ত্যজীবী গ্রামীণ মানুষের একান্ত পার্থিব দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালার সঙ্গে ঊর্ধ্বচারী আকাশের বিহঙ্গ-কল্পনা মিশলে যে চেহারা দাঁড়ায় বিভূতিভূষণের গল্পোপন্যাস তারই শিল্পরূপ; খতিয়ে দেখলে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ শিল্পরূপের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একজন প্রত্যক্ষ ধারাবাহিক লেখক। কি ভাষার ঢোলে কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কি সংবেদনশীলতায় শৈলজানন্দ প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি অবশ্য আমাদের সচরাচর দেখা গ্রাম থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহারণ করে নিয়ে তাকে বাংলা-বিহারের সীমানা-সংলগ্ন কয়লা-খনি অঞ্চলের প্রতিবেশের উপর স্থাপন করেছেন কিন্তু তাঁর রচনার রীতি একান্ত-ভাবেই শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলীর স্মারক। শৈলজানন্দের অভিনবত্ব এখানে যে তিনি শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তিতলের উপর খনি-সাহিত্য নামক একটি নয়া আয়তন সংযোগ করেছেন, বাংলা ভাষায় কিন্তু তলিয়ে দেখলে, উভয়ের বাস্তবতার প্রকৃতি এক। শৈলজানন্দ অতি ঘরন্তী না পায় ঘর নামক যে অনবদ্য গল্পটি লিখেছিলেন, তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে খনি পরিবেশের কোন সম্পর্ক নেই, গ্রামের এক বন্ধ্যা নারীর সন্তানপিপাসার আর্তিকে কেন্দ্র করে এর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। এই গল্পের রীতি ও প্রকৃতি একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের ভাবের জগৎকে মনে করিয়ে দেয়। বিশ্ব-সাহিত্যের সেরা গল্পমালার ভিতর এটি অক্লেশে নিজের স্থান করে নিতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম এবং শহর উভয় জীবনের পটভূমিকায় বাস্তবতার এক প্রথম শ্রেণীর রূপকার। শরৎচন্দ্র যদি বাংলা ভাষায় বাস্তবতার পথিকৃৎ হয়ে থাকেন তো মানিক-সাহিত্যে সেই বাস্তবতার আরও উচ্চতর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানিক বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট লেখক। তবে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা আর মানিকের বাস্তবতার প্রকৃতিগত অনেকখানি ভেদ আছে।

রচনাশৈলীর মাধুর্যের কারণে তথা ভাষার সৌন্দর্যে শরৎচন্দ্রের বাস্তব চিত্রণ স্বাদুময়; পক্ষান্তরে, মাণিকের বাস্তবতা রুক্ষ, রূঢ়, শুষ্ক। তার মাথার উপর অগ্নিবর্ষী প্রখর রৌদ্রের খরতেজ, চেষ্টা করলেও তার কোথাও মিষ্টতার ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানিকের কথাসাহিত্যে এমনতর শুষ্কতা আর পরুষভাবের কারণ তাঁর স্থিতাবস্থার প্রতি অনমনীয় আপসহীন মনোভাব এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতাধৃত মূল্যবোধগুলির সম্পর্কে সীমাহীন ঘৃণা। ঘৃণার উত্তাপে সব রকম কমনীয়তা ও লালিত্য সেখানে শুষে উবে গিয়েছে। কিন্তু অন্তর্ভেদী মানিকের মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং মানুষের আচরণের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির ব্যবচ্ছেদমূলক বিশ্লেষণী ক্ষমতা। ফ্রয়েড

ও মার্কস তাঁর সাহিত্যে এক আধারে বিরাজ করছেন। তবে শেষের দিকের রচনায় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে কমে গিয়ে মার্কসীয় বহির্চেতনারই প্রাধান্য। নির্জ্ঞানমনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবচ্ছেদী ব্যায়াম ঘুচে গিয়ে তার জায়গায় সমষ্টি মানুষের সংগ্রামী জীবনের আদর্শের প্রতিষ্ঠা। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ ওই আদর্শের মূলকথা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মানিকের মূল প্রভেদ এখানে যে শরৎচন্দ্র সমস্যা উত্থাপন করেন কিন্তু তার সমাধান দেন না কিংবা সমাধান তাঁর জানা নেই। মানিকের রচনায় সমস্যার উত্থাপন ও সমাধান দুই-ই রয়েছে। তাঁর চোখে মজুর ও চাষীর অন্তহীন শোষণের প্রতিকারের একটিই মাত্র রাস্তা খোলা—কায়েমী স্বার্থবাদীদের সবলে প্রতিঘাত করা। প্রথম দিকের রচনা দিবারাত্রির কাব্য, জননী, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রভৃতি উপন্যাস এবং প্রাগৈতিহাসিক বিসর্পিল, ও বৌ পর্যায়ের গল্পগুলির ভিতর মনোবিকলনের আতিশয্য কিন্তু শহরতলী উপন্যাসের পর্ব থেকেই তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও বহির্মুখ মনোভাবের প্রাধান্য। তারপর একে একে দর্পণ, অহিংসা, চতুষ্কোণ প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শেষোক্ত মনোভাবের আরও বেশী সম্প্রসারণ। তবে শেষের দিকের ছোটগল্পগুলির মধ্যেই অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবন্ধ মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ছবি স্পষ্টতর। কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে, সক্রিয় বিদ্রোহের আভাসে এই রচনাগুলি সমাজ চৈতন্যদীপ্ত সাহিত্যসৃষ্টির তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। যথা, ছোটবকুলপুরের যাত্রী, হারানের নাতজামাই, পেটব্যথা প্রভৃতি গল্প। শরৎচন্দ্র গ্রামজীবনের অত্যাচারের ছবি দেখিয়েছেন কিন্তু অত্যাচারের প্রতিরোধের ছবি তেমন দেখাননি। সেই বাঞ্ছিত কাজটি করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক আমাদের সাহিত্যে একাধারে একজন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শিল্পী ও কর্মিষ্ঠ লেখক।

মনোজ বসু বাংলার যে অংশকে দক্ষিণবঙ্গ বলা হয় তার গ্রামজীবনের একজন কমবেশী রোমান্টিক রূপকার, তবে তাঁর ওই স্বাদু-রম্য জীবনচিত্রণের মধ্য দিয়েই গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-ব্যথা বেদনাকে তিনি গভীর দরদের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর একাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসে। মুসলমান চাষীর বাস্তব জীবনযাত্রার একাধিক সুন্দর ছবি তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর লেখার আর একটি বড় গুণ হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যের দ্যোতনায় সাম্প্রদায়িক

মিলনের ছাপটি তাঁর রচনায় বড় সুন্দর রূপ পেয়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে যত কথাই বলা হোক, শরৎচন্দ্রের ভাষার উজ্জ্বলতার সঙ্গে পরবর্তী কোন লেখকেরই কোন তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্রের স্টাইল এক অনন্য সৃষ্টি। তাঁর ভাষাশৈলীতে সচেতন রূপকর্মের সঙ্গে প্রাঞ্জলতার শিল্পের এক অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর গল্পোপন্যাসের বিষয়বস্তু মূলতঃ গ্রামীণ কিন্তু তাঁর ভাষার মেজাজ ষোলআনা নাগরিক। বিদগ্ধ ও পরিমার্জিত স্টাইলে তিনি গ্রামের গল্প লেখেন। এমনটি আর পরবর্তী কোন লেখক, গ্রামজীবন যাঁদের রচনার মূল উপজীব্য, তাঁদের বেলায় দেখা যায়নি। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ, মনোজ-মানিক প্রমুখ কথাকারদের ভাষাশিল্প শরৎচন্দ্রের তুলনায় অনেক কম পরিশীলিত, কম প্রসারিত। মোটকথা, এখনকার লেখকদের আর শরৎচন্দ্রের মত ভাষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কথাকারদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দুই একজন লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা ভাষার প্রসাধনকলার প্রতি কমবেশি অবহিত কিন্তু তাঁরা এক্ষেত্রে বুঝি বা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়েই রইলেন।

সাম্প্রতিককাল ও শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার — মানিক মুখোপাধ্যায়

ক্রমবিবর্তনের ধারায় সাহিত্যের ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক নিয়মটিকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিযে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই শরৎচন্দ্র বলতে পেরেছিলেন, "যে ভাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির পক্ষে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়ে যায়, সে শুধু এইজন্যই যাবে যে আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আর পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাব যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় অতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে। বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তিসামর্থ পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকুমাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদের কাজ ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই রইল।"

শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে নবীন লেখকের আবির্ভাব যথেষ্ট হয়েছে। একদিকে 'কল্লোল' এবং 'কালি ও কলম' গোষ্ঠীর লেখকরা, অন্যদিকে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধায়ের মত ক্ষমতাবান লেখকরা অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় একযোগেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই বাংলাসাহিত্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন। সমাজজীবনের বহু নূতন দিককে সাহিত্যে নিয়ে এসে এঁরা বাংলা সাহিত্যের ক্যানভাস-টিকেও অনেক ব্যাপক আকার দান করেছেন। তবু এ সত্ত্বেও বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্র তাঁর উন্নত মতাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রুচি ও মাধুর্যে ভরিয়ে বাংলা সাহিত্যকে রসসৃষ্টির যে মানে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, মূলতঃ মতাদর্শের দুর্বলতার জন্য সে মানটিকে এঁরা বজায় রাখতে পারলেন না। কেন পারলেন না, কেন এঁরা শরৎচন্দ্রের চাইতেও উন্নত স্তরের সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেন সে অবশ্যই আলোচ্য বিষয় এবং বর্তমান প্রবন্ধেই অন্যত্র তা আলোচনা করা হবে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হ'ল শরৎচন্দ্রের ঠিক পরবর্তী যুগে তারাশংকর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্যিকরা— ভুল-ভ্রান্তি এঁদের যাই হোক, আন্তরিক প্রয়াসে এঁরা বাংলাসাহিত্যকে তবু অন্ততঃ সে পর্যায়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন—এঁদের পরবর্তীকালে যাঁরা এলেন, তাঁরা কিন্তু সে মানটিও ধরে রাখতে পারলেন না। তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিকতার ঐ একই বিভ্রান্তির পথে এগুতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দেখতে দেখতে এঁরা বাংলা সাহিত্যকে এমন এক স্তরে নামিয়ে আনলেন যে সুস্থ মস্তিষ্ক বিচারশীল পাঠকমাত্রই তাতে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। সাম্প্রতিককালের এইসব সাহিত্যিকরা অতি আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির উদগ্র বাসনায় জীবনের সমস্ত জ্ঞান-নীতি বিসর্জন দিয়ে সমাজের যত নোংরামি ও কুশ্রীতাকে খুঁচিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন, সাহিত্যের নামে এঁরা বস্তুতঃ পর্ণগ্রাফিরই চর্চা করছেন। এইসব সাহিত্যিকরা দাবি করছেন, তাঁরা নাকি সাহিত্যে বাস্তবতাকেই প্রকাশ করছেন। অথচ আসলে তাঁরা সমাজের কিছু বিত্তবান অথবা মধ্যবিত্তদের যে অংশটা জীবন-সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, মানসিক বিকারগ্রস্ত, অস্থিরচিত্ত—জীবনে যারা যৌনতা ও নানা নোংরামির মধ্যেই ডুবে আছে—মূলতঃ তাদের সেই ব্যর্থ ক্লেদাক্ত জীবনের দৈনন্দিন গ্লানিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছেন এবং একেই তাঁরা গোটা সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে দাবি করছেন। বাস্তবিক এ হ'ল সমাজের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি। এই সমাজেই যে আর একটা ব্যাপক অংশ আছে— যারা সহস্র বঞ্চনা ও সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্রমাগত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, সেইসব শ্রমিক-চাষী নিম্নমধ্যবিত্ত শোষিত জনসাধারণের সংগ্রামী জীবনের সত্যরূপ কিন্তু এঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। তাদের ব্যবহারিক জীবনে অমানুষিক দারিদ্র্য ও নিম্নমানের বঞ্চিত জীবনে আপাতদৃষ্ট কুশ্রীতাগুলিকেই এঁরা মহা উৎসাহে বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত, কিন্তু তাদের জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও প্রতিনিয়ত যে কত

সুন্দর সুন্দর সম্পর্ক, প্রেম-ভালবাসার মাধুর্য্য, উন্নত জীবনের কত নূতন নূতন দিক ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক নিয়মেই সমাজে রূপ নিতে চাইছে—এগুলি কিন্তু এইসব সাহিত্যিকের চোখে পড়ে না। আসলে কথায় কথায় সাহিত্যের বাস্তবতার উল্লেখ করলেও এঁরা জানেনই না সাহিত্যের বাস্তবতা বলতে যথার্থ কি বোঝায়। শুধু তাই নয়, বর্তমান সমাজ, সাম্প্রতিককাল কোনটিকেই এঁরা চেনেন না।

অথচ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শরৎচন্দ্র কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট ধারণা দিযে বলেছিলেন, "সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ।" শরৎচন্দ্র জানতেন, পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়, গতিময়তাই এর প্রকৃতি ; সমাজ, মানবজীবন, মানবমন—সবই নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—এই পরিবর্তনের জোয়ারে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার রুচি, রসবোধ, প্রেম-ভালবাসা সবই পালিয়ে যাচ্ছে—এটাই ক্রমোন্নতির পথ, উন্নত থেকে উন্নততর রূপ অর্জনের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ। তাই সাহিত্য, হল রসরূপে জীবনেরই সুন্দরতম এবং যথার্থ প্রকাশ—সেই সাহিত্যও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—ক্রমোন্নতির পথে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তার প্রকাশরীতি। কোনও সাহিত্যই তাই চিরন্তন নয়, শাশ্বত নয়, সাহিত্যিকের কালজয়ী হওয়ার বাসনাও তাই অলীক, অবাস্তব স্বপ্নমাত্র। এই মিথ্যা মোহে বিভ্রান্ত না হয়ে তাই সেইসব সাহিত্যিকরাই সাহিত্যে বাস্তবতার প্রকৃত চর্চা করতে সক্ষম, যাঁরা তাঁদের যুগে সমাজের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য থেকে সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এই পরিববর্তনের সঠিক ধারাটিকে উপলব্ধি করতে পারেন। সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে বস্তু-জগৎ এবং লেখকের সচেতনতা—দু'টোকে মিলিয়েই ধরা হয়, অর্থাৎ সহজ ভাষায় সমাজে যা আছে এবং যেমন তার হওয়া উচিত—দুইয়ের সম্মিলিত অভিব্যক্তিতেই একমাত্র সাহিত্যে বাস্তবতার যথার্থ প্রকাশ ঘটতে পারে। এই কারণেই সমাজ অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য থেকে যে নূতন নূতন উন্নত আদর্শ, চিন্তা ও উন্নত জীবনবোধ ভবিষ্যতকে গড়বার দুর্জয় ক্ষমতা নিয়ে ধীরে ধীরে সমাজে আবির্ভূত হচ্ছে—সেই বাস্তব যুগচিন্তাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যে সঠিকভাবে রূপ দেওয়াই

সচেতন সাহিত্যিকের কাজ। একইভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়ার কথা বলেছিলেন শরৎচন্দ্র।

সাম্প্রতিককালের যুগোপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির প্রশ্নে আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন কিছুই সমাজে অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসৃষ্টরূপে দেখা দেয় না। অতীতই বর্তমানকে গড়ার জমি তৈরী করে দেয়। তাই বর্তমানের যুগোপযোগী শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হলে আমাদের ঠিক আগের যুগটাকে ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের দেশে রেনেসাঁশ বা নবজাগরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলনটির গতিপ্রকৃতি এবং তার স্বরূপটিকে এই কারণেই ঠিক ঠিকভাবে অনুধাবন করা দরকার। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে সুরু করে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবধারার এই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের মধ্য দিয়ে যা পরিণত রূপ নিয়েছিল, সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে পাশাপাশি সুস্পষ্ট দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথম তথ্য পরিবেশন করে দেখান যে, ভারতবর্ষের মানবতাবাদী ভাবধারার মধ্যে "একটি ধারা agnostic অর্থাৎ সংশয়বাদী, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে তর্ক করে না, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মূল tendency (ঝোঁক বা প্রবণতা) হচ্ছে বস্তুজগৎ ও বাস্তবজগৎটাকে বিশ্বাস করার দিকে—এই দিকেই তার ঝোঁক বেশী। ফলে এর দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ secular। সাহিত্যচিন্তায় এই ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন শরৎচন্দ্র ও নজরুল। আর একটি ধারা হচ্ছে যেটা ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবতাবাদের মূল্যবোধগুলিকে সংমিশ্রিত করতে চেয়েছে। এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ।" মনে রাখা দরকার, সামন্ততন্ত্রকে ভাঙ্গা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং পুঁজিবাদের বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রক্রিয়া, তার মধ্য থেকে পুঁজিবাদী বিপ্লবের সাংস্কৃতিক কাঠামো হিসেবেই একদিন বিপ্লবাত্মক মতবাদ রূপে পার্থিব মানবতাবাদ বা সেকুলার হিউম্যানিজমের আবির্ভাব। কিন্তু ইউরোপের দেশে দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর নিজেরাই যখন শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে সবলে

দমন করতে শুরু করল, নিজের দেশের বাইরে চড়াও হয়ে অপরাপর দেশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে উঠে পড়ে লাগল, তখন থেকে বুর্জোয়া মানবতাবাদও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বিপ্লবাত্মক সেক্যুলার বা পার্থিব রূপটি হারিয়ে ক্রমাগত সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয় মতাদর্শের সাথে আপোষমুখী হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্র কিন্তু আন্তর্জাতিক এই বিশেষ যুগে আবির্ভূত হয়েও মানবতাবাদের সেই বিপ্লবাত্মক যুগের সেক্যুলার রূপটিকেই এদেশে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন। শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের মূল্যবোধগুলি—ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নারীস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সমানাধিকারের ভিত্তিতে নর-নারীর মর্যাদাবোধ প্রভৃতি শুধু যে এদেশের মাটিতে সার্থক বিপ্লবাত্মক রূপ নিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করল, তাই নয়, বিশ্বমানবতাবাদও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের মাধ্যমে সবচেয়ে সার্থক, সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক এবং সবচেয়ে পরিণতরূপে দেখা দিল শরৎ-সাহিত্যে।

বাস্তবিক, যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শরৎচন্দ্র বুর্জোয়া মানবতাবাদকে এদেশের মাটিতে ক্রমাগত বিকশিত করে উন্নতির যে সর্বোচ্চ শিখরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পরবর্তী উন্নততর মতাদর্শই হল সর্বহারার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। কাজেই মানবতাবাদী ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যে বিরাজ করে তাকে ডিঙ্গিয়ে উন্নত স্তরে না গিয়ে শরৎ-উত্তর সাহিত্যসৃষ্টি আর কোনোমতেই সম্ভব নয়, শুধু এই কারণেই সম্ভব নয়, তা নয়। শরৎচন্দ্রের যুগটাই ছিল, এদেশে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙ্গে মানবতাবাদী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠার যুগ, যুক্তি ও বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠার যুগ—যে কাজটি শরৎসাহিত্য সার্থক-ভাবেই করেছে। কিন্তু শরৎ-উত্তর যুগটা হল, ক্ষয়িষ্ণু সংকটময় পুঁজিবাদের, সাম্রাজ্যবাদের যুগ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারা বিপ্লবের যুগ—সর্বহারার উন্নততর সংস্কৃতি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগ। এই সর্বহারা বিপ্লবের যুগে তাই মানবতাবাদী মতাদর্শ আর নূতন করে কোনও সমাধান করতে নূতন করে পথ দেখাতে অপারগ—সে মানুষকে আরও বিভ্রান্তই করবে, বিপ্লবভীত কাপুরুষ করবে, অবক্ষয়ের দিকেই নিয়ে যাবে।

সর্বহারার সাহিত্যই যে বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি, এ চিন্তা একেবারে সুস্পষ্টভাবে না হলেও ক্রমেই যে শরৎ চিন্তাকেও ধাক্কা দিচ্ছিল, তার আভাস আমরা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখাতেই পাই।

আধুনিক কলকারখানাকে কেন্দ্র করে যে নূতন শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যেও তাদের জীবন প্রতিফলিত হোক, শরৎচন্দ্র তা একান্তভাবেই চাইতেন। 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি পরিষ্কার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, সে-সাহিত্যের যথার্থ রূপটি কেমন হবে, সে-সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব আমরা পাই 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বলেছেন, "বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" এই কারণেই যেদিন তিনি দেখলেন 'কল্লোল' এবং 'কালি-কলম'-এর নবীন একদল সাহিত্যিক নূতন এক উৎসাহে সমাজের শোষিত জনগণ শ্রমিক-চাষীর জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচনায় এগিয়ে এলেন—তখন সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের এই নবপ্রয়াসকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সূচনায় তাঁদের এই যে সৃষ্টি-উৎসাহ—অচিরেই দেখা গেল তা ফরাসী ন্যাচারালিজমের ভ্রান্ত ফাঁদে পা বাড়িয়ে বিভ্রান্তির পথে সমাজের যত নোংরামিকে খুঁচিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁদের এই ব্যর্থতার মূল কারণ, তাঁরা মানবতাবাদী মতাদর্শকে সম্বল করেই সর্বহারার জীবনের রূপ দিতে গিয়েছিলেন, যেটি সম্ভবই ছিল না। এমন কি মানবতাবাদের যে বিপ্লবাত্মক ধারা শরৎ-সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার প্রয়াসও তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হল না, বরং এদেশের আপোষকামী জরাগ্রস্ত মানবতাবাদের ধারণাটিকেই তাঁরা গ্রহণ করে চলতে চাইলেন। তারাশংকর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের মধ্যে ন্যাচারালিজমের প্রভাব দেখা না গেলেও এঁরাও কেউই শরৎচন্দ্রের বিপ্লবাত্মক পার্থিব মানবতাবাদের ধারাবাহিকতায় শরৎ-উত্তর সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন নি, ভারতবর্ষের আপোষকামী ধর্মীয় মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথের যে বিরাট প্রভাব—তার থেকে মুক্ত থেকে সাহিত্যসাধনা এদের কারুর দ্বারাই সম্ভব হয়নি। এমন কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সত্যিই এদেশে সর্বহারার সাহিত্যসৃষ্টি করতেই চেয়েছিলেন, সাম্যবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই সাহিত্য সাধনা করেছিলেন—তিনিও শেষ পর্যন্ত শরৎ-উত্তর সাহিত্য অর্থাৎ সর্বহারার সাহিত্যসৃষ্টিতে

ব্যর্থ হলেন। এর মূল কারণ, সঠিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের guidance ছাড়া কোন দেশেই যথার্থ সর্বহারা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে যে দলটির সাথে যুক্ত ছিলেন, সাম্যবাদী নাম দিয়ে গড়ে উঠলেও যেহেতু সেটি প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর দল হিসেবে কোন দিনই গড়ে উঠতে পারল না, যেহেতু আসলে সেটি পেটি বুর্জোয়ার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়েই এদেশে দেখা দিল, তাই সেই দলের পক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে সঠিক পথে পরিচালনা করাও সম্ভব ছিল না। এদেশের নবজাগরণের সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়ে এরা বরং এক দিক থেকে সাহিত্যিকদের বিভ্রান্তই করেছেন। তাই যারাই এই দলের সংস্পর্শে এসে সর্বহারার সাহিত্য রচনায় ঐকান্তিক উদেশ্যে শ্রমিক জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েছেন, তারাও একই বিভ্রান্তিতে অনেকটা 'কল্লোল' সাহিত্যিকদের মতই মূলতঃ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতেই বস্তিবাসী, অশ্লীল গালি-গালাজে অভ্যস্ত শ্রমিকের জীবনের বাইরের কুশ্রীতাকেই দেখেছেন, তাকেই সাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং এর সাথে কিছু আন্দোলন, সাম্যবাদের কিছু গরম বুলি জুড়ে দিয়ে সর্বহারা সাহিত্য বলে প্রচার করেছেন। এঁরা বুঝতেও পারেন নি যে, শ্রমিক-জীবনের অশেষ দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অশিক্ষার মধ্যে ঐ কুশ্রীতা ও নোংরামির দিকগুলি আসলে পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই নানা বিকৃতির প্রকাশ—এর সাথে সচেতন শ্রমিকের সংস্কৃতি বা সর্বহারা সংস্কৃতির কোনও সম্পর্কই নেই।

মূলতঃ এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের এই দুর্বলতার জন্যই আজ পর্যন্ত এদেশে শরতোত্তর সর্বহারা সাহিত্য সৃষ্টির সর্বরকম প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির এই ব্যাপক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তার বিকাশের সঠিক পথটিকে যিনি প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তিনি হলেন বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। এদেশের বুর্জোয়া মানবতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট দুটি ধারা পাশাপাশি কাজ করেছে, সে-কথার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "তার মধ্যে মূলতঃ মানবতাবাদের uncompromising, যৌবনোদ্দীপ্ত ও বিপ্লবাত্মক ধারাটিরই continuity-র পরিণতিতে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম— যে ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র ও

নজরুল। আজ আপনারা যাঁরা যথার্থ অর্থে শরৎচন্দ্র ও নজরুলের উত্তর-সাধক হবেন, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই শরৎ-চিন্তা ও নজরুল-চিন্তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের চিন্তার একটা বিরোধ দেখা দিতে বাধ্য। আজকের সর্বহারা সংস্কৃতির উদ্‌গাতারা শরৎচন্দ্র ও নজরুলেরই উত্তরাধি-কারী আর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হওয়ার মানেই যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের সঙ্গে আপনাদের চিন্তাগত বিরোধ।" এইভাবে না বুঝে, যদি আজকের সাহিত্যিকরা বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকেও কেবল রবীন্দ্র-চিন্তা এমনকি শরৎচন্দ্রের বিপ্লবাত্মক মানবতাদের চিন্তার মধ্যেও নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখেন, শরৎ-চিন্তা, রবীন্দ্রচিন্তার সীমাবদ্ধতাকে বোঝবার চেষ্টা না করেন, তাহলে তাঁরা আসলে রিভাইভলিজমের চর্চাই করবেন, পুরানো চিন্তার জাবরই কাটবেন, শরতোত্তর সাহিত্যসৃষ্টি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার

ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শরৎ প্রতিভার প্রাণশক্তি হল, তিনি দেশ ও কালের চিত্ত পরিচয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁর বাস্তববাদের মধ্যে সমাজের প্রাণশক্তি ছিল। বিশ্বস্তভাবে যুগকে চিত্রিত করার কর্তব্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য সমাজে প্রাণশক্তির সন্ধানের মধ্যে, যুগকে চিত্রিত করার চেষ্টায়, দেশ ও দেশবাসীর যথার্থ মুক্তির সন্ধানে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ছিল, যে সীমাবদ্ধতা গোর্কীর ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে, দেশ ও কালের চিত্তপরিচয়ের সঙ্গে লেখকের আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক রচনা করতেই হবে। গোর্কীর মত শরৎচন্দ্রও মনে করতেন লেখককে হতে হবে সময়ের কণ্ঠস্বর, সময়ের শ্রুতিযুগল, নেত্রযুগ্ম। দেশজ ও কালজ না হয়ে আন্তর্দেশিক হওয়া যায় না। সে চেষ্টা 'দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাস' হয়ে উঠবে।

শরৎচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে লেখকের দেশজ ও কালজ হবার একটা পর্বের আরম্ভ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎ প্রতিভার মূল্যায়নে এই দিকটা প্রথম দেখিয়েছেন এবং এই দিকটাকে অভিনন্দিত করেছেন—"শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই ছিলেন নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়।" দেশের হৃদয় যে তাঁকে ধরে রেখেছে তা এরই জন্য। এবং একালের সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষের লেখক ও পাঠক সমাজ যখন শরৎচন্দ্রকে গৌরবী ঐতিহ্য বলে সগর্বে গ্রহণ করেন তখন এই দিকটার কথাই বলেন। এই প্রাণশক্তিকে তাঁরা শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার বলে সযত্নে চয়ন করে প্রচার করেন। কিন্তু এও লক্ষ্য করছি, আজকের বাংলা সাহিত্যে যাঁরা ক্ষমতাবান লেখক বলে পরিচিত তাঁরা শরৎচন্দ্রের এই উত্তরাধিকারকে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা দেশ ও কালের যথার্থ চিত্তপরিচয়ের সঙ্গে লেখকের আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক রচনায় শরৎ-শিক্ষাকে সদম্ভে বর্জন করে চলেছেন।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকালে দেশের চিত্তভূমির পরিচয়ে ছিল নিদারুণ দারিদ্র্য, বেদনাকর অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, গ্রাম দেশের হরেক রকমের

ব্যাধিপীড়া ; জমিদার মহাজন, মধ্যস্বত্ব ভোগী ও তাদের পেটেলদের প্রবঞ্চনা, শোষণ, অত্যাচার ; ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ, পীড়ন। 'ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লেখে,' দেশ থাকে অবহেলিত। এ হ'ল ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র। অর্থাৎ এক সামাজিক প্রবল দুর্দশা। তারই মধ্যে পরাধীনতার জ্বালাবোধ, স্বাধীনতার আকাংক্ষা, কংগ্রেসের আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিক অসন্তোষ, ইংরাজের হিংস্র দমননীতি, সংগ্রামীর আত্মদান ছিল। শরৎচন্দ্র পরাধীন দেশের এই চিত্ত পরিচয়ের সঙ্গে লেখকের আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক রচনা করলেন।

এই সংযোগ থেকেই তিনি দেখেছেন দেশী ও বিদেশী শোষণে দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল— তার বাঁচবার পথ দিনের পর দিন সংকীর্ণ ও নিরন্তর দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, জ্ঞান গেল, নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠেছে। চাষী পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরী করে। দেশে জল নেই, অন্ন নেই। ম্যালেরিয়ায় ভর্তি বাংলার পল্লী জননীর আকাশ বাতাস। মামলা-মোকদ্দমা, দলাদলি, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক বিষে বিধ্বস্ত বাংলার গ্রাম। সামাজিক-পারিবারিক ভূমিতে মেয়েদের কত সমস্যা। নারীত্ব লাঞ্ছিত, পঙ্গুতা প্রাপ্ত।

দেশের এই গভীর বেদনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে অভিজ্ঞতার যে পুঁজি হয়েছে, তাকেই সাহিত্যের জীবন্ত পরিবেশে উপস্থিত করলেন শরৎচন্দ্র।

কিন্তু দেশের প্রবল দুর্দশাকে সাহিত্যে প্রতিচ্ছবিত করে দিয়ে তিনি কর্তব্য শেষ করলেন না। এই "অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশের" ভেতরকার বাসনাটা কী, ভবিষ্যৎ গতি কী, তাও আভাসিত করতে চাইলেন। লক্ষ্য করলেন সে বাসনার প্রত্যয় হল—বিদেশী শাসনতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে স্বরাজ নিশ্চিত হলেই দুর্দশার গ্রাস থেকে দেশ রক্ষা পাবে। এরই পথ শরৎচন্দ্র ভাবতে লাগলেন। রমেশ, শ্রীকান্ত, সাধু ঠাকুরপো, অভয়া, কমল, দ্বিজদাস, পণ্ডিতমশাই, অমরনাথ, সব্যসাচীরা সমাজ ও দেশের দুর্দশামুক্তির নানা পথ ভেবেছে। সে পথের চিন্তায় ফাঁক আছে, স্ববিরোধ আছে, মতদ্বৈধতার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু সে চিন্তা ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের অনুকূলে যায় নি, স্বার্থান্ধ সমাজপতিদের পক্ষে যায় নি, অথবা ভূস্বামীদের স্বার্থ-রক্ষণে যায় নি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সেদিন জনগণের পক্ষেই কাজ করেছে। শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের তাৎপর্য ও সুকৃতি এখানেই।

লেখকের এই চিত্ত-চিন্তা যখন দেশ ও কালের চিত্ত-পরিচয়ের সঙ্গে অব্যবধানে এসে পড়ে, তখন আর কোন লেখকই রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এই জন্যই শেলী, বায়রন বার্নসকে, গোর্কী, রোলাঁ, বারবুসকে রাজনীতি-তপ্ত সময়ের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না। নজরুলকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। সুকান্তকে রাজনীতি করতে হয়েছে। এই সত্য অনুধাবন করেই ইলিয়ট বলেছেন, "all genuine poets are fervid politicians"—সকল সত্যিকারের কবিরাই অত্যন্ত আগ্রহশীল রাজনীতিবিদ। এই জন্যই ইংলণ্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ অংশগ্রহণকারী তাদের আন্দোলনের পথে শেলী, বায়রন বার্নসকে প্রিয় কবিজন বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। রুশ দেশের সংগ্রামী মানুষ গোর্কীকে তাঁদের একজন করে গ্রহণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রও সক্রিয় রাজনীতির ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বোস, সূর্য সেন প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা ও অগণিত দেশবাসী শরৎচন্দ্রকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহিত্যিক মিত্র বলে মর্যাদার আসন দিয়েছেন। দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় ধর্মঘটে সমর্থন নিয়ে বিতর্কে তিনি ধর্মঘটের পক্ষে দাঁড়ালেন। রাজনীতিতে নরমপন্থী চরমপন্থীর ক্রমিক বিরোধের সংগে নিজেকে তিনি সাগ্রহে যুক্ত করে দিলেন। দেশের মধ্যে ও বহির্ভারতের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ ছিল তাঁর। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স দলের প্রতিষ্ঠাতা, বি. পি. সি. সি.-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, শরৎচন্দ্র সশস্ত্র সংগ্রামে অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে গুলি এনে সে-গুলিতে বিপ্লবীরা ইংরেজ মেরেছেন। চৌরিচেরার কৃষকদের আন্দোলন সহিংস পথ নেওয়ায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলন প্রত্যাহার করলে শরৎচন্দ্র প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হন। গান্ধীজীর সংগে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে। গান্ধীজীকে বলেন, "I think attainment of Swaraj can be helped by soldiers and not by spiders"।

এইভাবে শরৎচন্দ্র সময়কার তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই চলেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভব এবং চিন্তাকে সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালের লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার কতটা, তা জানা যাবে কতটা তাঁরা দেশ ও কালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মত অব্যবধানের সংযোগ রক্ষা করতে পেরেছেন, তার থেকে। শরৎচন্দ্র নিজে সমকালীন কল্লোলিত নবীন সাহিত্যিকদের কাছে এই আবেদন রেখেছিলেন, তাঁরা যেন দেশ ও কালের তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে চলেন তাঁরা যেন সময়কার যথার্থ চিত্তপরিচয় নিয়ে সাহিত্যের কাজ করেন। তাঁরা যেন দেশের ভেতরটা দেখেন, মানুষের ভেতরটা দেখেন। 'লিখবার শক্তি আছে' এমন অনেক তরুণই সেদিন তা করেন নি। মানুষের অবচেতনার উৎসে আছে সেক্স,—ফ্রয়েড-হ্যাভলক-এলিসের কাছ থেকে এই সূত্র পেয়ে তাঁরা মত্ত হয়ে উঠলেন। দেহের রহস্যে বাঁধা সব কিছু—এই সুতীব্র দেহচেতনাকে রিয়ালিস্ট, বিদ্রোহ ইত্যাদি বলে উচ্চকণ্ঠ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। শরৎচন্দ্র এই তরুণ লেখকদের আধুনিকতার কল্লোলে প্রথম দিকে বিভ্রান্ত হলেও সে ঘোর কাটিয়ে এই তরুণদের সেদিন সাহিত্যভূমিতে করণীয় সম্পর্কে যা বলেছিলেন তারই মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারের স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত—"বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানবজীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব তো রয়েছে। এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে, এ সব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনাটি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে। কিন্তু সাহস কেবল একদিকে হলে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব। এদিকে তো শাস্তির ভয় নাই, কেউ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে সত্য সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নিরব।" [স্বদেশ ও সাহিত্য]

দেশ ও কালের যথার্থ রূপ চিত্রণে এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে তার প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ গতি নির্দেশে সাহসের দরকার। কারণ তাতে পীড়ন, লাঞ্ছনা, শাস্তির ভয় আছে। কিন্তু এই ভয় স্বীকারের মধ্যেই সাহিত্যের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও গৌরব। লেখকের স্বাধীনতার অর্থ এই সাহস প্রদর্শনের, এই কর্তব্য পালনের স্বাধীনতা। এর অন্যথা স্বাধীনতার নামে অরাজকতা, আর সাহসের নামে বিপদে গা বাঁচিয়ে চলার আবিষ্কৃত সুবিধাবাদী নানা

কৌশল। সে কৌশলে বই কাটতি হয়, কিন্তু গৌরবী সাহিত্যিক জন্মায় না। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি প্রবন্ধে লিখলেন—"সাহিত্যে স্বাধীনতার নামে অরাজকতা বা anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ক'রে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাই না। কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। সিডিশন (sedition বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয় বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না।"

১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ এই বছরে দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে যদি কেউ গবেষণা করেন, দেখবেন, এই দশ বছরে দেশের বই-কাটতি লেখকরাও সিডিশন বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে কী ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, কী নিদারুণ চারিত্রিক পঙ্গুতায় প্রাণশক্তি হারিয়েছেন। পাশাপাশি শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যে একাংশ লেখক সাহস নিয়ে চলতে চেয়ে কী ভাবে পীড়িত, লাঞ্ছিত হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের বর্জন ও গ্রহণের মেরুকরণ ঐ ক'বছরে বড় চমৎকার হয়ে গেছে। শরৎ শতবর্ষে দেশবাসী তা বিচার করে নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র এই চারিত্রিক পঙ্গুতাকে নানাভাবে আঘাত করেছেন। লেখকের চারিত্রিক পঙ্গুতা থেকে আসে অসারতা, ছলনা, নোংরামো—যাতে সাহিত্য-ভূমিতে আগাছা জন্মায়। পঙ্গু লেখক আত্মসম্ভ্রমহীন। সেদিন শরৎচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন নবীন লেখকরা অনেকেই আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছিলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত একখানা চিঠিতে লিখেছেন, "যা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড়লোকের নির্লজ্জ খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে যদি তোমার সঙ্গে সাহিত্যিক সম্বন্ধ রাখি? তোমরা টাকা দেবে। তোমাদের influence ছোট সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে প্রচুর—কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয়, টাকার কাঙালও নয়। অন্তত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে নয়। আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্বটাই তোমাদের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। টাকা সবাইকে কিনতে পারে না। একটু সৎ, একটু honest হওয়া চাই।"

এই আত্মসম্ভ্রমকে শরৎচন্দ্র লেখকের চরিত্র বলেছেন। এবং নবীন লেখকদের মধ্যে তিনি সেদিন এই গুণের প্রত্যাশাও করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এসব কথা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী সেদিন উদ্দিষ্ট নবীন সাহিত্যিক-দের ভালো লাগেনি। শরৎচন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যে রাজনীতি লক্ষ্য

করে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। উল্টো তাঁরাই শরৎচন্দ্রের কাছে অনুযোগ করলেন, শরৎচন্দ্র রাজনীতির দিকে বড় ঝুঁকে পড়েছেন; এতে করে বাংলা সাহিত্যের খুব ক্ষতি হচ্ছে। অনুযোগ পরবর্তীকালেও তাঁদেরই একজন— বুদ্ধদেব বসু তুলেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে। সুকান্ত ও শরৎচন্দ্রের জবাব ছিল স্পষ্ট। সুকান্ত উত্তর দিয়েছিলেন, যাদের জন্য আমার কবিতা তাদের সংবাদপত্রে (স্বাধীনতা) প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি ততোধিক গর্বিত। বুদ্ধদেবের অনুযোগ ছিল, স্বাধীনতা একটা রাজনৈতিক পত্রিকা। ওতে লিখে সুকান্ত তাঁর ক্ষমতার ক্ষতি করেছেন। শরৎচন্দ্রের উত্তর ছিল, "আমি যদি একেবারে ওদিকে (রাজনীতির দিকে) না যেতুম তাহলে যত ক্ষতি হত, গিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় তাকে ক্ষতি বলে মনে করি না।" আবারও তিনি আবেদন রাখলেন, "এদিকটাকে অস্বীকার করো না। অন্যান্য দেশের যে দু'চারখানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি এ জিনিষে তারা কখনও চোখ বুজে থাকে নি। এরজন্য তারা অনেক সহ্য করেছে, অনেক শাস্তি ভোগ করেছে। তোমরা তাই কর না কেন?" 'স্বদেশ ও সাহিত্য' রচনারই একটি ছত্র হল, "তারা তা করবে কিনা আমি জানি না।" এই ছত্রটির মধ্যে রয়েছে সাম্প্রতিককালে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের তাৎপর্যপূর্ণ জিজ্ঞাসাটি। শরৎচন্দ্র সন্দীহান ছিলেন ঃ

(১) তাঁর উদ্দিষ্ট লেখকরা সমাজের ভেতরটা, সমস্যার ভেতরটা, মানুষের ভেতরটা নজর করে দেখবেন কি না।

(২) লেখকরা শাস্তির ভয় সহ্য করে সময়ের তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে চলবার এবং তার যথার্থ পরিচয় চিত্রণের সাহস রাখবেন কিনা।

(৩) আধুনিকতা যে নোংরা-চিত্রণ নয়, সংযমহীনতা নয়—এটা উপলব্ধি করবেন কিনা।

(৪) আত্মসম্ভ্রম বিসর্জনের প্রশ্নে লেখকরা গর্জে উঠবেন কিনা—সৎ, honest হবেন কিনা।

সাম্প্রতিককালের বই-কাটতি-লেখকদের দু'একজন বাদ দিয়ে সকলেই শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার বর্জন করে, তাঁর সন্দেহকে প্রমাণিত করেছেন।

দেশের সাম্প্রতিককালের চিত্তপরিচয়টা কি? শরৎচন্দ্র পরাধীন দেশের যে প্রবল দুর্দশার কথা বলেছেন, স্বাধীনর দেশে দুর্দশা সমচিত্রের নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু দুর্দশার নতুন নতুন রূপ অস্বীকার করবার উপায় নেই। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার সমস্যা ও তজ্জনিত উদ্ভূত সমস্যা তীব্র।

বন্যা, খরা, সেচাভাব গ্রাম বাংলাকে মুমূর্ষু করে তুলেছে। ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে বিপুল হয়েছে। ভাগচাষীরা দুর্দশাগ্রস্ত। বর্গা অপারেশন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাংলায় নতুন একটা আশার পথ খনন করে দিলেও ভৌমিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ও গোষ্ঠীরা তাকে ভালো চোখে শুধু দেখছে না তা নয়; বর্গা রেকর্ডকে বানচাল করবার জন্য তারা বর্গাদারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টির ও বর্গাদার হত্যার ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। ভাগচাষী উচ্ছেদের ফলে ক্রমাগত ক্ষেতমজুরের এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের খারাপ অবস্থা সরকারকেও স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯২৬-২৩ সালের পশ্চিমবঙ্গের ৫টি জেলায় কৃষিমজুর সম্পর্কে একটি সরকারী সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে ক্ষেতমজুর পরিবারের লোকদের মাথাপিছু দৈনিক আয় ২৬ পয়সা মাত্র। তারা সারা বছর কাজ পায় না। (ইণ্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস—বু ১) বেকার সমস্যা দেশের বুকে রাতের চাপা কান্নার মত। এর থেকে কত সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে। জনসংখ্যার সমস্যা তীব্র, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা সুকঠিন। হরিজন প্রশ্ন, দাসশ্রমিক প্রশ্ন লজ্জাকর। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থান্বেষীরা মদত দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আঘাত হানা হচ্ছে নানা ছলে কৌশলে। বিশাল মধ্যবিত্ত অংশের চিত্তপরিচয়ে কত বৈচিত্র্য, যন্ত্রণা জটিলতা, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা। দেশের চিত্তপরিচয়ের আরো চিত্র রয়েছে কলে কারখানায় শ্রমিক মালিকের সম্পর্কে, মজুরি দাসত্বের বহুবিধ সমস্যায়।

সাম্প্রতিককালের সাহিত্য ভূমিতে যাঁদের লেখার শক্তি আছে তাঁদের অধিকাংশই শরৎচন্দ্রের আবেদন সেদিনকার মত আজও গ্রহণ করতে রাজি নন। সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে জীবিত ও সদ্যপ্রয়াত শক্তিশালী অনেক লেখকই শরৎচন্দ্রের কালের সেই নবীন লেখকগণ যাঁদের উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র আবেদন রেখেছিলেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রের আবেদন ঠিক মেনে নিতে পারেননি

বলেই তাঁদের সাহিত্য চর্চায় শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার মানেন নি। সেদিনের যে-সব নবীন লেখক যাত্রারম্ভের চিন্তায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একমত ছিলেন— যেমন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল প্রমুখ—তাঁরা অনেকেই আরম্ভের অঙ্গীকারে অনেকদূর এগুলেও শেষপর্যন্ত চলেছেন বলতে পারলে উৎসাহিত হতাম। নজরুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত প্রমুখরা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য দর্শনের সঙ্গে শুধু একমত হননি, তার বিস্তার ঘটিয়ে দেশসহ অন্তর্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। এই উত্তরাধিকার নিযে এসে-ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার প্রমুখ। কিন্তু তাঁরা আর পূর্ব-ভাবে সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় বলে মনে হচ্ছে না। এক শ্রেণীর লেখক শরৎন্দ্রের উত্তরাধিকার মেনে না নিয়ে শরৎচন্দ্রের উদ্দিষ্ট সেদিনকার কল্লোলিত নবীন লেখকদের উত্তরাধিকারই শ্রেয় ও প্রেয় বলে গ্রহণ করেছেন। এদের লেখায় সেক্স, ক্রাইম, রহস্য, মনো-বিকলনতত্ত্ব প্রধান বিষয়। সময়কার অনেক ছবি ক্ষেতমজুর কৃষক, শ্রমিকের জীবন চিত্রও এনেছেন। তা এনে বাস্তবতার একটা প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যটা তাঁদের শরৎচন্দ্র থেকে ভিন্ন, দৃষ্টিটাও তাই সমাজের ভেতরটা, সমস্যার ভেতরটা মানুষের ভেতরটা নজর করে দেখে তার যথার্থ বাসনা দ্যোতিত করতে শরৎচন্দ্র যে বলেছেন, এরা তার বিপরীতটা করে চলেছেন। শরৎচন্দ্র জীবনে যত পাঁক ঘাটিয়েছেন এরা তার কাছে শিশু। কিন্তু শরৎসাহিত্যে কোথাও পাঁকের গন্ধস্পর্শ নেই। জীবনপঙ্কজ সেখানে বিকশিত। এরা 'বিবরে' প্রবেশ করে, মধ্যবিত্তের সংসারে ঢুকে কৃষক-শ্রমিকের জীবনযাত্রাকে বিষয় করে, একালের তারুণ্যকে আশ্রয় করে তার দুর্বলতা, গোপনতা ও বিকারকে টেনে বার করে চিত্রিত করে বলেন - 'এই'-তো জীবন। তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়-বৃত্তির একটা ভাগ নিয়ে অনবরত পুনরাবৃত্তি করে সাহিত্যিক নিষ্ঠা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞাননিষ্ঠার আত্মপ্রসাদ বোধ করেন। এই নিষ্ঠা থেকে সম্প্রতি কিশোর কিশোরীর নিস্তার নেই। সময়কার যথার্থ চিত্র ও প্রাণশক্তি থেকে সরে থাকার আরেকটা বীথিপথ রচিত হচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে। সে হ'ল 'রহস্যরচনা। লেখার এক নয়া ঝোঁক। সত্যজিৎ রায় একেবারে সম্প্রতি এই পথে বহু কাটতি লেখক হয়েছেন। অন্যরা কলম ধরছেন। এই লেখাকে বলা হচ্ছে—"নানাবিধ লেখার ফাঁকে লেখকের রিল্যাক্স মুডের

ঝিলিক।" কিন্তু শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের প্রত্যাশামত এরা কখনই এ সবের প্রাণশক্তি ও ভেতরের বাসনা আভাসিত করছেন না। 'মহাকালের রথের ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি ও গতিপথ কখনই এরা দেখাচ্ছেন না। যেমন দেখিয়েছেন শরৎচন্দ্র। আরো একটা তাৎপর্যপূর্ণ কথা। শরৎচন্দ্রের এমন একখানা উপন্যাসও নেই যা নামে উপন্যাস গুণে ও ধর্মে নয়; যার "প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।" কিন্তু সাম্প্রতিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের এই কৌতুকটাই সত্য। শত শত প্রজ্ঞার প্রগলভ বাণী বহন উপন্যাস নাম নিয়ে স্থবির জীবের মত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময় ভূমিতে থপ্ থপ্ করে চলছে। 'অতিপরিমাণ ঘাসপাতা খাইয়ে পেটমোটা এই সব ভারবাহী জীব' সৃষ্টি করে 'সাহিত্যের কোন কাজ হবে"—এ বিষয়ে সম্প্রতি অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার এই বহু কাটতি লেখকদের হাতে সম্পূর্ণ বিসর্জিত। এইসব লেখকদের ওপর যাদের শরৎচন্দ্রের ভাষায় influence প্রচুর, তারাও দেখছি এসব লেখার জন্য প্রসারিত ক্ষেত্রই তৈরি করে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের আবেদনের সঙ্গে তাঁরাও একমত হতে পারেন নি। টাকা সবাইকে কিনতে পারে না, কিন্তু টাকা যে অনেককে কিনতে পারে, আত্মসম্ভ্রম সব লেখক বিসর্জন দেন না, কিন্তু আত্মসম্ভ্রম যে অনেক লেখক বিসর্জন দেন সাম্প্রতিক দেশের সাহিত্য তার গবেষণার ক্ষেত্র।

এদের রচনা পড়ে বেশ মনে হচ্ছে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম যেমন দেশের জনগণের পক্ষে গেছে, এদের লেখা জনগণের পক্ষে কাজ করছে না। বিপক্ষেই করছে। দেশের চিন্তাশীল, শুভানুধ্যায়ী পাঠকবর্গ এ বিষয়ে ভাবিত, উদ্বিগ্ন।

৩

তবে অনুকূল স্রোতও বইছে। শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারের অঙ্গীকারের লেখাও সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে। লেখার শক্তি এদের সকলের নেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি নেই কখনই বলা চলে না। নাটকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদীপ্ত একচ্ছত্র। ছোট গল্পে অঙ্গীকারে শানিত। উপন্যাসে ও কবিতায় উদ্ভিন্ন। বাংলার শ্যামল ভূমিতে সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক বহু পত্রিকায় এবং influence-ওয়ালাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েই স্বচেষ্টায় বা অ-প্রভাবী প্রকাশকের চেষ্টায় এই নবীন লেখকেরা শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারকে ঐতিহ্যের স্বীকৃতি বলে অভিনন্দিত করে চলেছেন, অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছেন। ততোধিক এই উত্তরাধিকারের সম্পদকে তাঁরা প্রসারিত করে দিয়ে দেশ-কাল ও বহির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে লিখে চলেছেন। এরা লড়তে লড়তে লিখছেন, লিখতে লিখতে লড়ছেন।

ভালবেসে যদি
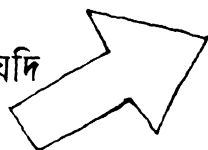
সন্তোষকুমার ঘোষ

বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কথাটা কার? যদ্দুর মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের। কী আশ্চর্য, শরৎবাবুর বিষয়ে কিছু লিখব বলে যে-ই বসেছি, অমনই কিনা বঙ্কিমবাবুর প্রখ্যাত উক্তিটিই সর্বপ্রথম মনে এল! কেন এল, একটু রয়ে-সয়ে তাও টের পাচ্ছি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, সেটাও বাল্যপ্রণয় যে! এবং ওই অভিশাপের কথাটাও সত্য। অকপটে স্বীকার করছি। কম বয়সেই আমি শরৎচন্দ্রের প্রেমে পড়ি। উল্টে-পাল্টে, ফিরে ফিরে মেখে-চেখে তাঁর কত গ্রন্থাবলীর যে পাতা ছিঁড়েছি, সেই আসক্তির, সেই মোহের, সেই ভালোবাসার কথা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই। লজ্জা হত যখন বাল্য-কৈশোর টপকে যৌবন-মহলের দোরগোড়ায় দাঁড়াই। আমাদের অগ্রজতুল্য কোন কোন লেখক—তাঁদের কেউ প্রগাঢ় "বোদ্ধ" কেউ বা "প্রবুদ্ধ"—যেন তখন জিগির ছাড়লেন শরৎচন্দ্র ফাঁপা, বড় ভাবালু, আর অমনই খটকা লাগল। মাথা হেলিয়ে বিশ্বাসও করলুম। সোজা কথায়, মনে মনে একটা অনাস্থা প্রস্তাব তখনই পাস্ করে দিই।

ফলে যত কাল জুড়ে প্রগাঢ় যৌবন, তত কাল আর পারতপক্ষে শরৎ-বাবুর কোনও বইয়ের পাতা ওল্টাইনি। তাঁর লেখা নাটক, তাঁর গল্পসর্বস্ব ছায়াছবি নিয়ে মাতামাতির যুগও ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি। পরবর্তী সময়ে কালে-ভদ্রে যদি বা দেখতাম, তখন গোপনে চোখের জল মোছা-টোছার কারবার ছায়াছন্ন প্রেক্ষাগৃহেই সারতাম। অনেক সিনেমার বেলায় আবার একগুঁয়ের মতো সজোরে মাথা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে স্বগত বলতাম, ভালো লাগছে? কখ্খনও না। ভালো লাগতে দেব না, না-না। যেন সেই রামগরুড়ের ছানাদেরই প্রতিধ্বনি, যারা নিজেরাই নিজেদের বলত—হাসব না না না না।

তখন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল ভড়ং দেখে মাথা ঘুরে যায় যে!

আমার মতো অনেকেরই। রচনা মাত্রেরই আড়ালে একটা ডিমেল মাথার ছায়া দেখা না গেলে নাক সিঁটকে পাশ কাটাই। দন্তস্ফুট করতে পারি কি না পারি 'ইউলিসিস্' হাতে ঘোরাঘুরি করি—পরিচিত-পরিচিতাদের ইমপ্রেশ করবার ওর চেয়ে আর চওড়া হাইওয়ে নেই। শ-এর নাটকে মজে ভাবি এই তো বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা। আর হাক্সলির নভেল? সে তো পরাতর-কাষ্ঠা। ওই হুজুগে শরৎবাবু তলিয়ে যাবেন না তো থাকবেন কোথায়, করবেন কী? বাল্যপ্রণয় হায়, ঘোলা জলের ঘূর্ণি-দহে হারিয়ে গেল। অভিশাপের কথাটা দিয়ে সেইজন্যেই শুরু করেছি।

অভিশাপের পরেও বৃত্তের চক্রবৎ আর একটি আবর্তন থাকে—তখন জানতাম না। জানলাম বেশি বয়সে। এই অধ্যায়টার নাম প্রতিশোধ—খুব সূক্ষ্ম আর অলক্ষ্য অর্থে—প্রত্যেকটি মহৎ লেখক যে-প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন, যে-উপায়ে শতজীব হন। শরৎচন্দ্রও হয়েছেন। না, তিনিও যে তাঁর আয়ুর কোনও ক্লান্ত প্রহরে কখনও একটু আঁতেল হতে চেয়েছিলেন, সেই ঈষৎ লুব্ধ মুগ্ধ বিচ্যুতির কথা তুলছি না। বইয়ের নাম যা-ই হোক, ওই পর্যায়ের সৃষ্টি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শেষ প্রশ্ন কখনোই না। যে-কারণে তিনি এখনও ফিরে ফিরে আসেন, সেটি হ'ল তাঁর ঘরকন্নার নৈপুণ্য, অধিকাংশ লেখাতেই একটি অসামান্য অনায়াস গার্হস্থ্য দ্যুতি। এক-কথায়, এই বয়সের আমি বলতে চাইছি, ব্যক্তিগত জীবনে যিনি দীর্ঘকাল ছিলেন ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, কখনও বা বাউণ্ডুলে সন্ন্যাসী, সাহিত্যে কিন্তু গৃহস্থ তিনিই। আটপৌরে বলেই, অপরূপ বাতাসের মতো মিলে-মিশে যান বলেই নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে নিয়ত। তাছাড়া গল্পের নাম যত দিন শল্প, তত-দিন তাঁর তুলনা আমাদের সাহিত্যে অল্পই। বিশ্বসাহিত্যেও যতটুকু টের পাই, শরৎ-সদৃশ উদাহরণ যত্রতত্র যথেচ্ছ প্রাপ্তব্য নয়।

অপিচ শিল্প-বিচারে, তুলনা অরুচিকর! কোন শৃঙ্গ তুষারশুভ্র সুদূর দুরারোহ হবে, আর কোনও কোনোটি হবে শষ্পশ্যামল—এই দুটি দৃশ্যই তো প্রকৃত এবং স্বাভাবিক। কোনও জ্যোতিষ্কের দিকে তাকাতে চোখে একটি নরম নীলাভ পরকলা পরে নিলে ভালো হয়, আবার কোনও কোনও শুভ্রজ্যোৎস্নায় যামিনী হয় পুলকিত, দ্রুমদল ফুল্লকুসুমিত। শারদ চান্দ্র-প্রতিভা এই দ্বিতীয় দলে বিন্ধ্য কেন হিমাচলয় নয়, এ নিয়ে হাহাকার করে কেবল উন্নাসিক বাতুলে। কোনও গহিন গাঙের পাড়ে বসে আমরা দৃষ্টিকে

উদাস করে দিই, আবার কোনও কোনও টলটলে দীঘির জল ঘড়া ভরে ঘরে নিয়ে আসি। একটাতে আমরা নিজেকে পাই, অন্যটা দিয়ে নিজেকে বাঁচাই। চাই দুটোই।

এই বারণ-কোলাহল সহ-অবস্থিতির কথা বলে দু'চার কথায় শরৎচন্দ্রের স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রসঙ্গে আসি। সেই কত কাল আগে ভাগীরথীর উভয় তীরে চটকলের চিমনিগুলো যখন সবে আকাশের মুখে কালি ছড়াতে শুরু করেছে, কিন্তু তখনও সব চিমনি মিলে একটি ঘন অরণ্য তৈরি হয়নি, তখনই হুগলির একটি গ্রামের বালকের চোখে বোধহয় ভাবীকালের চেহারাটা ধরা পড়ে। "মহেশ" গল্পটির নতুবা সৃষ্টি হত না। শিল্পায়নের এক হৃদয়হীন রূপে নিশ্চয়ই অনুভব করেন শরৎচন্দ্র—তাই সব কারুণ্য ছাপিয়ে পাই এক গভীর দূরদৃষ্টি। এই দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টিরও বুঝি আত্মীয়। "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন"- এটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনার উচ্চারণ মাত্র। নিজে ঠিক ওই বেদুইন হননি, যাযাবর-মন সত্ত্বেও হননি। হওয়াটা অপেক্ষা করে ছিল বিদ্রোহী নজরুলের জন্য। তেমনই, আনিলাম "অপরিচিতের নাম" লিখেছিলেন কবি, কিন্তু সেই সংকল্পটি পূর্ণ করেন শরৎচন্দ্র "অপরিচিতের নাম" শুধু তাঁর অঙ্কিত চরিত্রে নয় লেখক হিসেবেও প্রোথিত করেন তিনি, নতুবা আমার মতো আকাট মূর্খ সাহিত্যক্ষেত্রে বাচালতা করতে সহায় পেত কি? পরবর্তীকালের অনেক লেখকের হয়েই রচনার সনদখানি এনে দেন শরৎচন্দ্র।

একালেও তাঁর প্রবল প্রভাব আর বিপুল জনপ্রিয়তা, তবু কোনও কোনও মহলে এখনও একটু খুঁতখুঁত কেন জানি! তিনি নাকি সমস্যার পর সমস্যার জাল ছড়িয়েছেন, অথচ সমাধানের কোনও ডাঙায় পৌঁছে দেননি। প্রত্যুত্তরে বলি, রোগ নির্ণয়টাও কি সোজা কাজ? আর দাওয়াইয়ের দায় একা কি লেখকের? সেজন্যে তো সমাজপতি, রাজনীতি-পতি, বিচক্ষণ আরও কত মহাজনই রয়েছেন। সাহসের সঙ্গে যিনি ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে দেন, তাঁর কীর্তিকে ছোট করে দেখার মধ্যে যুক্তি কী? একনিষ্ঠ প্রেম আর সতীত্ব যে এক চিজ নয়, শরৎচন্দ্র জানতেন, মানতেন আর ওই অন্তর্বিরোধকে যথাযোগ্য ঠাঁইও দিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। "আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই"—এটি তাঁরই স্বীকারোক্তি। মানে প্রেম মঞ্জুর

কিন্তু প্রতিষ্ঠা নয়। তবে এই অসম্পূর্ণতা, অতৃপ্তি, এই খণ্ডন—এ তো শুধু শরৎচন্দ্রই নয়! ভালোবেসে যদি সুখ নেই "তবে কেন মিছে ভালোবাসা ?" এই লাইনটি কি তাঁর পূর্বসূরী কবির নয় ? তিনি কী দেননি, তার চেয়ে বরং যা দিয়েছেন, তারই একটু আন্দাজ পেতে চেষ্টা করি। দিয়েছেন "বিন্দুর ছেলে" "নিষ্কৃতি" "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর মতো মরমী, মানবিক চিত্রাবলী। সেই সঙ্গে সাবিত্রীও। হয়তো এমন সব মানুষ একালে আমাদের চোখে অহরহ পড়ে না, কিন্তু পড়ত যদি ? পড়লে এই ক্লিন্ন খিন্ন, সংকীর্ণ জীবনটাকে কি আর একটু মহৎ, চওড়া, ভরাট আর ভরপুর লাগত না ? ছবিতে দেখা কত সূর্যাস্তই তো রোজ রোজ ঘটে না। তবু কখনও কখনও অলীক মায়া-সিঁদুর ছড়ানো সূর্যাস্ত দেখতে কার না সাধ যায় ? যা আছে তা তো আছেই, আবার যা নেই অথচ আকাঙ্ক্ষা করি, থাকলে দিব্যি হত, এই নিয়েই তো মানুষের স্বপ্ন। আদর্শের সংজ্ঞা এই তো। নেই, কিন্তু থাকলে কি ভালো হত না ?—জীবনের সন্ধান এই।

•

তাই আজ পুনরায় শরৎচন্দ্র পড়তে শুরু করেছি। পরিণত বয়সে, পরিণত মন নিয়ে। চমকে উঠি যখন পড়ি "তাহার মুখ মড়ার মতো সাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।" (গৃহদাহ) – নরনারীর নৈশ মিলনের পরে ভোরের এমন একটি ছবি এ যুগের যে-কোনও লেখকের ঈর্ষা। এই আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল" যখন এই ধিক্কার-বাক্যটি পড়ি, তখন এর পিছনের বিদ্রোহী স্রষ্টা মনটিকে করি শ্রদ্ধা। চমকে উঠি। মনে মনে মানি, দেবদাস-এর মতো খাঁটি কিছুই নেই, কারণ জীবনের কোনো-কোনো পর্বে আত্মঘাত বৈ কোনো আশ্রয় থাকে না। যাদের থাকে, তাঁরাই কাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও সেই কথা। "সাধারণ মেয়ে" আর "দেবদাস" উভয়ই সত্য। নিজস্ব পরিচয় আর অভিজ্ঞতা থেকে জানি। তাই বলতে পারছি যৌবনকালের প্রত্যাখ্যান এই বয়সে ফিরে আসে স্বীকার হয়ে, মধ্য অঙ্কের "অভিশাপ" ফিরে আসে আশীর্বাদ হয়ে, বাল্য প্রেমাস্পদকে নতুন করে পাই।

পুনশ্চ: শেষ করে ফের খেই ধরছি। কারণ শুধু শরৎবাবু যে আমাদের লেখার জন্যে জায়গা করে দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে লেখাটার জন্যেও একটুখানি জায়গা রয়ে গেছে। কোন্ কথা বলা হয়নি—কোন্টা—কোন্টা? - তাঁর ভাষা? যে-ভাষা (অন্তত আমার মতে) সচরাচর সাধু-রীতি মেনে চলেও আসলে একেবারে মুখে একটি গ্লাস তোলার মতোই সাবলীল ক্রিয়া, সহজ। আসলে মুখের ভাষাকে কলমের মুখে আনবেন বলে বীরবল কড়ার করেন বটে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও জপান, তবু প্রকৃতপক্ষে মুখের কথাকে লেখায় টেনে এনে একেবারে দেওয়ান-ই-আম বসিয়ে দিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কিছু কিছু নারী চরিত্র ছাপে অসতী কিন্তু প্রকারে সাধ্বী। তাঁর ভাষার ব্যাপারে উল্টোটাই দেখি। প্রকারে সাধু কিন্তু, চলনে-বলনে সে চলিত। আমার কাছে শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয় এইটেই।

আজকাল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উদ্দাম তোলপাড় চলেছে, অথচ কিছু 'আধুনিক' খেতাবতুষ্ট লেখনীকারের তাতে বিন্দুমাত্র চিত্তবিকার ঘটছে না। কেননা তাঁরা জানেন এসব হলো বালখিল্য উত্তেজনামাত্র। শরৎচন্দ্র এলেই বা কি, গেলেই বা কি। তাঁর একশো পুরলেই বা কি, পাঁচশো পুরলেও বা কি। লোকটা তো শরৎচন্দ্রই। বাড়ির মেয়েরা বুকে বালিশ চেপে আঁচলে চোখ মুছে আর পানের পিক গিলে যার সঙ্গে তক্তায় শুয়ে দুপুর কাটায়। তা লোকটা গল্প বলতে জানতো বটে কিন্তু তার লেখার কথা কিছুই ছিলো না। কেবল লোকের হৃদয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে কাঁদানোকে তো আর 'শিল্প' অভিধা দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, বিক্রি হয় বটে। পঞ্চাশ বছর ধরেও ওকে টেক্কা দেওয়া যায়নি। তবে বিক্রি তো হয় পঞ্জিকাও। যার যেমন রুচি। শিল্প তা-বলে অতো সোজা ব্যাপার নয়। কেবলই কি কাঁচা সেন্টিমেন্টালিটি। উহু! আরো আছেঃ ঢের। শরৎচন্দ্রের কাঁচা কাজের সীমা নেই। এক্ষুণি তাঁর ত্রুটি-দুর্বলতার একটি লম্বা ফিরিস্তি দিতে পারেন তাঁরা। যথাঃ

[ক] হৃদয়ে সুড়সুড়ি, ভাবসর্বস্বতা অর্থাৎ শস্তামাল। হ্যাঁ, ওটা অবশ্য অর্ধ-শিক্ষিত, প্লিবিয়ান রুচিতে চলে যাবে কিন্তু নাগরিক শিল্পবোধসম্পন্ন, আলোকপ্রাপ্ত, মার্জিত রুচির পাঠক মহলে অচল, অমন কাঁচা হৃদয়াবেগ শিল্প-কৃতির বিঘ্নস্বরূপ। কে না জানে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণই শিল্পকুশলতার মুখ্য শক্তির খনি?

[খ] তত্ত্ব আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। লেখক বড় রক্ষণশীল। নজর আছে, সমস্যা কিছু কিছু তুলে ধরেন, অথচ সমাধান দেন না। আসলে ভীরু কিনা তাই এড়িয়ে যান। এদিকে ফোকটে নাম কিনে ফেলেছেন সমাজ সচেতন লেখক বলে। পরিবর্তন আনার ইচ্ছে আছে, কিন্তু বিদ্রোহের সাহস নেই। অসামাজিক প্রণয়ের পরিস্থিতি উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করেন বটে, কিন্তু মিলন ঘটাতে পারেন না। পারবেন কেন? অন্তরে অন্তরে রক্ষণশীল যে!

[গ] বড্ডই রোমাণ্টিক। চরিত্রগুলোতে ভারসাম্য থাকে না প্রায়ই। প্রথমত তারা হয় একপেশে, অর্থাৎ ভালো, তো খুব ভালো। দেবদূত। শাদা ধবধবে। যেমন ইন্দ্রনাথ। আর কালো, তো এককেবারেই কালো। শয়তান। যেমন গোলক চাটুয্যে। কিন্তু মানুষ তো হবে ধূসর, শাদা-কালোয় মেশা? দ্বিতীয়ত, নয়তো একমেরু থেকে আর এক মেরুতে ছুটোছুটি করছে তাদের চিত্তবেগ। রাজলক্ষ্মীর বাল্যকাল, পিয়ারী বাঈজী, আর প্রৌঢ় রাজলক্ষ্মীতে কোথাও কোন মিল নেই। আন্তর্বিরোধী চরিত্র আঁকেন রোমাণ্টিকতার আতিশয্যে।

[ঘ] যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজের কথা শরৎচন্দ্র লিখেছেন, সে সমাজ এখন আর নেই। জমিদারী প্রথা উঠে গেছে, তাদের অত্যাচারও গত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন শহরেই অন্ন সংস্থান করছে। সমস্যার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা পালটে গেছে বলে তাঁর আলোচিত সামাজিক মূল্যবোধগুলিও এখন মৃত। যে শ্রেণীর কাহিনী তিনি রচনা করেছেন সেই শ্রেণীই সমাজে নাস্তি।

[ঙ] সমাজ অনেক এগিয়েছে। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ এখন চালু। এমন কি বিবাহ বিচ্ছেদ, সধবার পুনর্বিবাহও। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন-বিষয়ক ট্রাজিডিসকলও এখন বেমালুম বিগত। অতএব তথাকথিত 'বাস্তবধর্মী' কাহিনী বর্তমান সমাজে রূপকথা। গতায়ু সমস্যা-গুলি তাত্ত্বিকেদের পক্ষে উৎসাহজনক হলেও হতে পারে, কিন্তু বর্তমান পাঠকের কাছে রক্তহীন। পাংশু। কৃত্রিম।

কথাগুলি ভেবে দেখলে কী মনে হয়?—তাই তো! শরৎচন্দ্র পড়তে পড়তে চোখে জল এসে যায় ঠিকই! আর সমস্যাগুলির সমাধান তো বাপু সত্যিই দেন না। তাছাড়া বিয়ে আর অমন কড়াক্কড়ি সমাজে এখন আর কই? এও ঠিক যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। আর চরিত্রগুলো সত্যি কিন্তু প্রায়ই স্ববিরোধী। অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলিও তো প্রায় মিটেই গেছে। তাহলে? তবে কি অভিযোগগুলো মেনেই নেবো?

এসব যুক্তি কিন্তু আজকের নয়, এখন যদিও বেশি বেশি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এ তর্ক গত পঁচিশ বছরের। ছেলেবেলায় প্রথম কলম ধরতে শিখেই আমিও কিন্তু হবু-লিখিয়ে-পাঠক হিসেবে শরৎচন্দ্রকে অস্বীকার

করেছিলুম। তখন সেটাই ছিল ফ্যাশান। আমার ফ্যাশানের লোভ তখন ষোলো আনা! সদ্য-লিখিয়ে বন্ধুবান্ধব, মায় সিদ্ধ-লিখিয়ে গুরুমশাইরা পর্যন্ত বলতেন 'শরৎচন্দ্র কিছু না।' আমিও তাই শুনে বৃথা সময় নষ্ট করিনি। আমি তো হতে চাই 'আধুনিক-লেখক', আমার ওসব বড়দি-মেজদির গল্পে কিবা কাজ!

এমনই এক সময়ে হঠাৎ মনে মনে বুঝে গেলুম, আমা দ্বারা হবে না। এমন করে আধুনিক-লেখক হয়ে ওঠা আমার মালমশলায় কুলোবে না। তার চেয়ে আমার পক্ষে ওই শরৎচন্দ্র-টন্দ্র পড়াই ঠিক।

শরৎচন্দ্র পড়লুম বড় হয়ে। আর সেটা আমার পক্ষে হলো প্রায় কলম্বাসের তুল্য রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। বুঝলুম একদার কাঁচি সিগারেটের সেই প্রসিদ্ধ দার্শনিক বিজ্ঞাপন আমার মতো নির্বুদ্ধিদের জন্যেই বিরচিত —'আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন।' এখন আমি জানি কী হারাতে বসেছিলুম। আরো জানি, যে লিখিয়ে-পাঠকদের মধ্যে প্রচলিত অভিযোগগুলি কতো ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তিকর। আমার মনের মধ্যে যে জবাবগুলি উঠে আসে, সবিনয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছি ঃ

[ক] কাঁচা ভাবালুতা পরিণত যুগের শরৎচন্দ্রে খুব বেশি নেই। প্রথমদিকে অবশ্য কিছুটা ছিল। তিনি লেখেন সম্পূর্ণ বাইরে থেকে, দ্রষ্টার নিরপেক্ষ ভূমিকা তাঁর। চরিত্রের কলিজার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' হন না। তিনি দেখিয়ে যান কেবল বাইরের ঘটনাবিন্যাস। শোনান চরিত্রদের বাক্যালাপ! নিজের মুখে কথা প্রায় বলেন না। রচনা-শৈলীর দিক থেকে কিন্তু ভাবালুতা প্রকাশের 'কাজে' মোটেই সহায়তা করে না এই নির্বিকার বাহ্যিক (objective narration) দলিল পেশ করা। তাঁর রচিত বাক্যালাপও তেমন সেন্টিমেন্টাল হয় না। বুক চিরে ফেলে হৃদয়াবেগের ভাঁজ খুলে দেখায় না শরৎচন্দ্রের চরিত্রেরা। পাঠককেই পড়ে নিতে হয় লাইনের ফাঁকে ফাঁকে ভরে দেওয়া অদৃশ্য শব্দহীন, বায়ু তরঙ্গিত ভাবাবেগটুকু। এই চরম নিয়ন্ত্রিত, সংবৃত্ত, সূক্ষ্ম শিল্প-শৈলীকে সেন্টি-মেন্টাল স্টাইল আখ্যা দেওয়া বিভ্রান্তিকর। শরৎচন্দ্র নিজেও কাঁদেন না, চরিত্রদেরও বড় একটা কাঁদান না। অথচ পাঠক যদি কাঁদে, সেটা কি শিল্পের ত্রুটি, না গুণ?

শরৎচন্দ্র যে 'গল্প বলতে জানেন' এটা তাঁর পরম দোষগ্রাহীও স্বীকার

করেন। এই গুণটিরও শেকড় কিন্তু আটকে আছে শিল্পকুশলতায়ঃ সংযমেঃ ভারসাম্যের সহজ আন্দাজের ওপরে তা নির্ভরশীল।

[খ] তত্ত্বই বা কেন, প্রয়োগই বা কিসের? লেখক তো সমাজ সংস্কারক অথবা কোনো বিপ্লবী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক নন। সমাজের খোলা চোখের সামনে একটি স্পষ্ট, সততার দর্পণ তুলে ধরাই তাঁর কাজ। বিপ্লবীর বা সমাজসেবীর মতো সংশোধন-সংগঠনের দায়িত্ব, হাতে-কলমে সমস্যার মীমাংসা ঘটিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্যের মধ্যে নয়। শিক্ষক বা জননেতার ভূমিকায় নামেননি বলে তাঁকে শিল্পী হিসেবে খারিজ করা অযৌক্তিক নয় কি?

মনুষ্যহৃদয়ের সমস্যাগুলি সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, কিন্তু সমাধানগুলি হয় ব্যক্তিগত। এক এক যুগে এক এক সমাজে এক একটি মানুষের কাছে এক এক রকম সমাধান সত্য। শরৎচন্দ্র যদি একটি করে 'last word' আউড়ে যেতেন, ফাইনাল বিধান দিয়ে যেতেন, তাহলে হয়তো সমস্যাগুলিও লেখক-প্রদত্ত সমাধানের কারণেই মৃত হয়ে পড়তো। তার চেয়ে সমাপ্তি তো মুক্ত রাখাই ভালো? পাঠক নিজেই সমস্যাটি নিয়ে ভাবতেন, নিজের যুগচরিত্র মতো, আপন বিশ্বাস ও স্বভাব অনুযায়ী সমাধান খুঁজবেন সেটাই কাম্য। এটা মোটে তত্ত্ব-প্রয়োগ-বিপ্লব-রক্ষণশীলতার প্রশ্নই নয়। তিনি যা 'ঘটা উচিত' তা লেখেননি, লিখেছেন জীবনে যা 'ঘটে'। যদি উপন্যাসের শেষ অধ্যায়গুলিতে তাঁর স্বকল্পিত 'আদর্শ হিন্দু সমাজ'কে উপস্থিত করতেন তাহলে তাঁর রচনা বাস্তবগুণে সার্থক শিল্প হয়ে উঠতো কি? সমস্যার সমাধান করে দেওয়া মানেই তার সীমা বেঁধে দেওয়া।

[গ] প্রথমত তাঁর লেখায় শাদা-কালো-ধূসর তিন জাতীয় চরিত্রই আছে। জগতে আমরা তো কারুরই পুরোটা দেখতে পাই না। এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো কখনো পুরো সাদা বা পুরো কালো তো দেখিযেই থাকে মানুষকে। সাহিত্যে কি ইয়াগো ডেসডিমোনা এরা বেঁচে নেই? যদিও বুদ্ধি দিয়ে হিসেব করে আন্দাজ করা চলে যে এগুলোই তাদের সম্পূর্ণ রূপ নয়। দ্বিতীয়ত—মানুষ্যচরিত্রে 'সামুদ্রিক পরিবর্তন' (Sea change) ঘটে। সেই প্রবল, প্রচণ্ড, অবিশ্বাস্য অদল-বদল সেই দুর্বোধ্য, দুর্লঙ্ঘ্য অযৌক্তিকতাই বাস্তব। মানুষ বাঁধা চরিত্রের আশানুরূপ ছাঁচে চলে না। একই মানুষ এক জীবনে অনেক রকম মানুষ হয়ে যেতে পারে। সেই স্ববিরোধ, সেই অন্তরীণ ছন্দহীনতাই মানুষের স্বভাব।

[ঘ] গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ থাকুক বা না থাকুক সেটা পরের কথা। না থাকলেও তাতে শিল্পর স্বাদ নিতে অসুবিধা হয় না। সমাজচিত্রণটাই বড় কথা নয়, সেটা পশ্চাৎপট মাত্র। বড় কথা মানুষ। মানুষ তো আছে? হোমারের সমাজও নেই, বোকাচ্চিওর সমাজও নেই। আমরা কি তাঁদের শিল্পী বলে মানি না? শ্রেণী নির্ভর, সমাজ নির্ভর, কালাশ্রয়ী মূল্যবোধ ছাড়াও সাহিত্যে আর এক জাতের শিল্প মূল্য আছে, যা দেশ-কাল-শ্রেণী নিরপেক্ষ। তার ভিতরেই মহৎ শিল্প তার শাশ্বত প্রাণের ভোমরা-ভ্রমরী লুকিয়ে রাখে। তাই আমরা সোফোক্লিস পড়ি, কালিদাস পড়ি।

[ঙ] তা ছাড়া আমাদের সমাজ কার্যত ব্যবহারিকভাবে মোটেই ততটা এগোয়নি যতটা আইনে, বাক্যে ও আপাতদৃশ্যে। শিক্ষিত বিশ শতাংশ মানুষের বড় জোর ইংরিজি-জ্ঞানী ক্ষুদ্রাংশটুকু বিদেশী সমাজের মূল্যবোধ ধার করে কিছু দূর এগিয়েছেন। বাকি সুবৃহৎ অংশ, বাংলা সাহিত্যের প্রধান-পাঠককুল তথৈবচ। শরৎচন্দ্রের লেখক-সমালোচক-গোষ্ঠী এই মুষ্ঠিমেয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এলীট-প্রাণী, তাঁদের সাহিত্যরুচিতে ভারতের আশিভাগ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত সাক্ষ্য নেই। তাই তাঁদের টবে-সাজানো সাহিত্যবুদ্ধিতে শরৎচন্দ্রকে যতটা সুদূর, অতীত, অবসোলীট বলে মনে হয়, মধ্যশিক্ষিত 'সাধারণ' বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে মোটেই তা মনে হয় না। তাঁরা জানেন, দুর্ভাগ্যবশত শরৎচন্দ্রের সমাজচিত্র আজও গ্রামবাংলার (এবং মফস্বল শহরেরও) ঘরে ঘরে প্রতিবিম্বিত। ট্রানজিস্টার আর বেলবটমে কেবল বহিরঙ্গেই দৃশ্য বদল হয়েছে। ভিত বদল হয়নি। গভীর, মৌলিক প্রগতি এখনও তেমন করে আসেনি সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে—গ্রামে তো বটেই, এমনকি শহরের মানুষেরও আভ্যন্তরীণ গ্রাম্যতা ঘোচেনি। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা নামেই ভেঙেছে, তার বহু দায় ও দোষ নতুন সম্প্রসারিত পরিবার প্রথার মধ্যে বেঁচে আছে। জমিদারী ঘুচেছে, জোতদারীর উপদ্রব এসেছে। জাত-বেজাতের বিয়ে, বিধবার বিয়ে, অসামাজিক প্রণয় সম্পর্কে লৌকিক বাধা-বিঘ্ন কিছুমাত্র তিরোহিত হয়নি। স্ত্রী-জাতি এবং বিত্তহীন অর্থাৎ শরৎ-সাহিত্যের 'অত্যাচারিত' শ্রেণীর সামাজিক মুক্তি যে আজও হয়নি, 'গরীবী হটাও', 'নারীবর্ষ উদ্‌যাপন কর' ইত্যাদি ধ্বনিতেই তার প্রমাণ।

এ তো গেল লিখিয়ে পাঠকের সঙ্গে শুদ্ধ পাঠকের সওয়াল-জবাব।

এবার দেখি কী কী প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র অনস্বীকার্য পথিকৃৎ।

(ক) এক তো মঞ্চ এবং পর্দার কাহিনী রচনায়। তপন সিংহকে একবার বলতে শুনেছিলুম ভারতবর্ষে সর্বাধিক চলচ্চিত্রিত কাহিনীকার (সব ভাষা মিলিয়ে) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর ফল কিন্তু বহু দূরগামী হয়েছে। আজ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যত 'জনপ্রিয়' সামাজিক কাহিনী চলে তার মূল কাঠামোটা এখনও শরৎ-সাহিত্য থেকেই নেওয়া হয় প্রধানত। শুধু বাংলাতেই নয়, হিন্দী, ওড়িয়া, গুজরাতী, মারাঠী, অসমীয়া ইত্যাদিতেও।

এ ছাড়া, দুভাবেই শরৎচন্দ্র আধুনিক লেখকদের সহায় হয়েছেন, শিল্পবিন্যাসে, এবং জীবনবিন্যাসেও। (খ) উপন্যাসের আঙ্গিকে, বিষয়বস্তু চয়নে তো বটেই। বাংলা উপন্যাসের বন্দ্য-ত্রয়ী, তারাশংকর, মানিক ও বিভূতিভূষণ তাঁর কাছেই উপন্যাসের গড়ন ও বক্তব্য বাঁধতে শিখেছিলেন বললে কি ভুল হয়? তাঁরা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পথে যাননি।

(গ) এছাড়া বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উদাহরণে বাঙালি লেখক জীবনের সামাজিক শ্রেণীগত ঐতিহ্য যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, শরৎচন্দ্র তাঁর বেপরোয়া বেচালে সে সবও পাল্টে দিলেন। অনায়াসে 'বাবু'-ঐতিহ্যটা ভেঙে ফেলে 'ছোটোলোক' হতে তাঁর বাধেনি। হাকিমি বা জমিদারী দূরে থাক, চালচুলো না থাকলেও, শুধু একটা কলম আর কব্জীর জোরেই যে লেখক হওয়া যায় - সেটা তিনিই পরবর্তীদের দেখালেন।

(ঘ) প্রসঙ্গত ভারতের প্রথম পেশাদার লেখককে আজ আমরা যেন প্রাপ্য সম্মান দিতে ভুলি না। যে দেশের আশিভাগ মানুষ নিরক্ষর, সে দেশে লেখাকেই পেশা করে নেওয়ার মধ্যে শিল্পের অহংকার আছে, (আর তা 'কমার্শিয়াল রদ্দিমাল' নয়, প্রকৃতই সৎশিল্প) তাকে আমরা নমস্কার করি।

(ঙ) শরৎচন্দ্র যে এই সঙ্গে একটা অতিরিক্ত পথও দেখিয়ে ফেলেছেন তাতেও সন্দেহ নেই। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, যে লেখকদের অসামাজিক জীবনযাত্রা তাদের শিল্পক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার ক্ষতি করে না। বোহিমিয়ান ধরনে বেঁচে, নেশাতন্ত্র করে, অনির্দেশ্য ঘুরে বেড়িয়ে 'অভিজ্ঞতা সঞ্চয়' করার যে সব পন্থা আজকের বহু তরুণ লেখকের মধ্যে দেখতে পাই, সেই উড়নচণ্ডে লেখক-জীবনের সামাজিক লাইসেন্সটা বের করে এনে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রই।

তিনিই এই উচ্ছন্ন-ঐতিহ্যের নাটের গুরু—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ নন। ভালো লিখলে যে পাঠকসমাজ শিল্পীর সবরকম বেচাল সইতে রাজি, এ কথাটা শরৎচন্দ্রই ফাঁস করে দিয়ে গেছেন।

আজকের লেখকরা, এই কথাটা জেনে ফেলবার পর থেকেই শরৎচন্দ্রকে 'কিছু নন' বলে ফুৎকার দেন, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে। এ মনোবল তাঁদের জুগিয়ে গেছেন শরৎচন্দ্রই।

শরৎচন্দ্র নিজেকে এলীট শিল্পী, অর্থাৎ 'লেখকের লেখক' মনে করেননি। তিনি চেয়েছিলেন 'পাঠকের লেখক' হতে। তাই সব ঋণ ভুলে গিয়ে লেখকেরা যদি আজ তাঁকে অস্বীকার করেন, আমরা, তাঁর পাঠকরা, কি সর্বংসহা ধরিত্রী হয়ে থাকবো? এমন কি আজ তাঁর শতবর্ষের জন্ম-তিথিতেও? না। তর্পণ মানেই ঋণ শোধ, ঋণ স্বীকার।

শরৎ সাহিত্যে সাময়িকতা ও দেশকালনিরপেক্ষতা

তারাপদ লাহিড়ী

১

কাব্যে অথবা সাহিত্যে কোন আলম্বন বা আশ্রয় চিরায়ত আস্বাদন সুখের আকর হতে পারে কি না—এ প্রশ্নের উত্তরে অদ্যাবধি প্রচুর তর্ক হয়ে গিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ক কূটতর্কে প্রবেশের ইচ্ছা নাই। মানব-সমাজ যেহেতু পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল, সেইহেতু সমাজ মানসেরও পুনঃ পুনঃ রূপান্তর গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী - এটুকু স্বীকার করে নিয়েই এই আলোচনা সুরু করছি। এই প্রকার রূপান্তর গ্রহণের ফলে কালে কালে মানুষের সুখদঃখ আস্বাদনের আশ্রয়। বিষয়বস্তু ও রীতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটলে সমাজের বাস্তব কাঠামো যেমন নবরূপে অভিষিক্ত হয়, সমাজমানসও তেমনি তার খোলস বদল করে। অতএব কোন এক কালপ্রেক্ষিতের সীমার মধ্যে যে বস্তুপুঞ্জ ও যে সকল ভঙ্গী মানুষের অন্তরে হর্ষশোকাদি সহজাত-ইমোশনের-আলোড়ন জাগায়, তারা ভিন্নকালের মানুষের হৃদ্‌গত ইমোশনগুলির উপরে পূর্বের মত আলোড়ন-সৃষ্টির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে—অর্থাৎ রসসৃষ্টির ব্যাপারে তাদের কার্য্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

এই বিশ্লেষণ একান্ত বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের রসাঢ্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে একে শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া যায় না। এটাই যদি শেষ কথা হত, তা হলে যাবতীয় সাহিত্যিক সৃষ্টিকর্ম-ই হত সাময়িকতা-ধর্মী। প্রয়াতকালের সাহিত্যকর্ম সমস্তই আগন্তুক কালে অনাদৃত হয়ে শুধু অতীতের স্মারক হিসাবে সাহিত্যের যাদুঘরে স্থানলাভ করত। কিন্তু সেরকম ত হচ্ছে না। মহাভারত, রামায়ণ শকুন্তলা—শত শত শীত বসন্ত পার হয়ে এসেছে। তবুও আজও তারা পূর্বের মতই পাঠকজনের মনোহরণ করে। সেক্ষপীয়র, শেলী, বায়রন, দান্তে প্রভৃতির সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। সেই-সব লেখকদের সমকালীন সমাজ তো আজ অবলুপ্ত ইতিহাসের ক্ষয়জীর্ণ

অস্থিপঞ্জরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কালিদাসের অপরূপ সৃজনকর্মের বয়স কত হল তা নিয়ে তর্কের অন্ত নাই। কবির ভাষায় বলা যায় "হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল/পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন নিয়ে তারিখ সাল।" কিন্তু শকুন্তলা নাটকের দুই একখানা ছবি যা সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপ্ত করে পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করেছে তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্। নির্জন তপোবনে দুই সখীর সহচারিণী সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা শকুন্তলার সাথে সুপুরুষ দুষ্যন্তের আকস্মিক সাক্ষাৎকার ঘটলো। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হলেন। শকুন্তলা আশ্রমাভ্যন্তরে প্রস্থানোদ্যতা। অথচ তাঁর মন বলছে 'আর একটুখানি দেখে নিই'। পিছন ফিরে দুই এক পদক্ষেপের পরেই শকুন্তলা তাঁর সখীকে সম্বোধন করে বলছেন—"অনসূয়ে! আমাকে ধরু ত। সদ্যোদ্ভিন্ন সূচীমুখ কুশতৃণ আমার চরণতল বিদ্ধ করেছে। আর, আমার বল্কলের আঁচল কুরুবক বৃক্ষের শাখায় আটকে গিয়েছে। আমাকে ধরু—আমি নিজেকে মুক্ত করে নিই।' এই ছলনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রণয়াস্পদের মুখে আর একবার সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। রাজা দুষ্যন্তকেও স্থানত্যাগ করতে হল। রথের মুখ ফিরিয়ে ফিরে যাচ্ছেন রাজা। যেতে যেতে আপন অন্তরকে সম্বোধন করে বলছেন—'শরীরটা সামনের দিকে এগিযে চলেছে বটে, কিন্তু আমার চঞ্চলীকৃত মন মুখ ফিরিয়ে রেখেছে পিছনের দিকে। এ যেন বায়ুর গতির বিপরীতে রথ ছুটেছে সম্মুখ দিক্ লক্ষ্য করে। আর তার ধ্বজের কেতন উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে'। এই ছবি থেকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার নাম দুটি উহ্য রাখলে কে বলবে যে ছবি দুখানির অন্ততঃ দেড়হাজার বছর বয়স হয়েছে? আজও জার্মানী, সোভিয়েত রাশ্যা ও কম্যুনিষ্ট চীনে শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ ঐ সব দেশের পাঠক সমাজ সমাদর সহকারে পাঠ করছে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ঐ নাটকের অভিনয় হচ্ছে। কিংবা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটক থেকে একটা ছবি উপস্থিত করি। বনবাসে তৃণশয্যায় জানকীর প্রসারিত বাহুতে শিয়র দিয়ে রামচন্দ্র শয়ন করেছেন। ভবভূতি শ্রীরামের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"ন জানে সুখমিতি দুঃখমিতি বা। তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণাঃ" অর্থাৎ—'এই যে আমি তোমার হাতে শিয়র দিয়ে শুয়ে আছি—এতে আমার সুখবোধ হচ্ছে কি দুঃখবোধ হচ্ছে—তা আমি জানিনা। তোমার স্পর্শে স্পর্শে আমার সকল

জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকল হয়ে গিয়েছে। সুখদুঃখের পার্থক্যবোধ বিলুপ্ত হয়েছে।' এই কথা অনুরূপ অবস্থায় যে কোনো আধুনিক নায়কের মুখ দিয়ে আজও বলানো যায়। সুতরাং কাব্য, নাটক আদি শিল্পগত সৃজনকর্ম শুধু তাদের সমকালীন মানসকেই আকৃষ্ট করে—উত্তরকালে তাদের আকর্ষণীয়তায় ভাটা পড়ে—এরূপ সিদ্ধান্ত বিচারসহ নয়। শিল্পদক্ষতার মান উন্নত হলে সাহিত্যিক সৃজন কর্ম কালোত্তরণ যোগ্যতা লাভ করে।

শিল্পের যে বিশেষ ধরণের প্রয়োগ নৈপুণ্য পুরাতন কালের রচনাকে বিশেষ দেশ ও কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে তার মধ্যে দেশকাল-নিরপেক্ষ সুচিরকালীন স্বাদ্যতা সঞ্চার করে, আমাদের প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ সেই প্রয়োগনৈপুণ্যের নাম দিয়েছেন—'সাধারণীকৃতি' (universalisation)।

এই 'সাধারণীকৃতি' বা 'সাধারণীকরণ' ব্যাপারটির সামান্য একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানুষের স্বভাব, ন্যায়, অন্যায় সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সম্পর্কে তার মনোভঙ্গী কালে কালে পরিবর্তনশীল—একথা তর্কাতীতরূপে সত্য। সেই জন্যই [illegible] লেখকের রচনাতেই সাময়িকতার প্রভাব থাকে। সামাজিক রূপান্তরের ফলে মানুষের বোধের, জীবন ও জীবনাশ্রিত জাগতিক ব্যাপার-গুলি সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে যায়। এককালে যা রসাঢ্য থাকে, কালান্তরে তার রসাঢ্যতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়—অথবা সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয়। কিন্তু মানবমনে কতকগুলি আদিম ও সহজাত প্রবৃত্তি থাকে যা থেকে কোন দেশের বা কোন বিশেষ কালের মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ দেশকালনিরপেক্ষরূপে মনুষ্যকর্তৃক অনতিক্রমনীয় এই প্রবৃত্তিগুলির সংখ্যা নির্ণয় করেছেন নয়টি। রতি (অর্থাৎ amorousinstinct), হাস, শোক, (অর্থাৎ দুঃখ বা বেদনাবোধ), ভয়, উৎসাহ, ক্রোধ বিস্ময়, জুগুপ্সা এবং প্রশান্তি—এই প্রবৃত্তিগুলি সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের চিত্তে অনুবিষ্ট থাকে। এগুলি শিক্ষালব্ধ, পরিবেশ প্রভাবিত কিংবা চর্চাসাপেক্ষ নয়। এই প্রবৃত্তিগুলি প্রকৃতিদত্ত। আলঙ্কারিকরা এগুলির নাম দিয়েছেন "স্থায়িভাব"। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এগুলিকে ইংরাজী ভাষায় "dominant instinctive emotions" বলে বর্ণনা করেছেন। (কেহ কেহ 'প্রশান্তি'কে একটি স্থায়িভাবরূপে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে স্থায়িভাব আটটি,—শান্তরস'

বলে কোন রস নাই)। আমার মনে হয় পূর্বোক্ত আটটি বা নয়টি মৌলিক প্রবৃত্তিকে আমরা মানবমাত্রের primary emotion বলে বর্ণনা করতে পারি। সর্বদেশের ও সর্বকালের মানুষ এই ইমোশনগুলির অধীন হয় স্বভাবজরূপে। 'রতিভাব' অর্থাৎ পুরুষের সাথে নারীর এবং নারীর সাথে পুরুষের দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন মানবপ্রবৃত্তি। এর মাধ্যমেই জাগতিক জীবন-প্রবাহকে নিরন্তর প্রবাহমান রেখেছেন প্রকৃতি দেবী। গণনাহীন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে জীবনগুলির অবসান ঘটছে, নূতন নূতন জন্মের মধ্য দিয়ে সেই ঘাটতি প্রতিনিয়ত পূরণ করে চলেছেন প্রকৃতি-ঠাকুরানী—শুধু মানুষ নয়—প্রাণবান যা কিছু জগতে দৃষ্ট হয় তাদের প্রতিদিনের ক্ষয় প্রতিদিনের নূতন নূতন জন্মের দ্বারা পরিপূরণ করে চলেছেন প্রকৃতি—'রতি' নামক মৌলিক ইমোশনকে কাজে লাগিয়ে। আমাদের পুরানকারেরা একটি সুন্দর চিত্রকলা রচনা করে এই রতিভাবের একটা মনোরম রূপ দান করেছেন। পুরাণকারদের কল্পনায় এই 'রতিভাবে'র যিনি দেবতা তাঁর নাম অতনু—তাঁর কায়া নাই—তাই বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র তাঁর অনায়াস বিচরণ। নর বা নারী প্রজননক্রিয়া সম্পাদনের উপযোগী বয়সপ্রাপ্ত হলেই অতনু তাঁর পুষ্পধনুতে পাঁচটি পুষ্পশায়ক যোজন করে তাকে বিদ্ধ করেন। আর অমনি 'রতি' নামক ইমোশন পুরুষের সাথে মিলনের জন্য নারীকে এবং নারীর সাথে মিলনের জন্য পুরুষকে প্রমত্ত করে তোলে। পাঁচটি কল্পিত পুষ্পশায়ক তাঁর অস্ত্র। এই জন্য এই পুষ্পধনুর মালিকের অপর নাম 'পঞ্চশর' আর মানুষের অন্তরে ঐ আদিম instinctive ইমোশনে সাকাঙ্ক্ষ অভ্যুদয়কে পঞ্চশরের প্রভাব বলে বর্ণনা করা হয়। প্রণয় প্রকাশের রীতিপদ্ধতি হয়ত কালে কালে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু যে মৌলিক ইমোশন মানবচিত্তে প্রণয়ের উদ্গম ঘটায়—তা সার্বজনীন এবং সর্বকালজীবি।

সুতরাং, মানবসমাজ কালে কালে রূপান্তর গ্রহণ করে। সেইহেতু সমাজমানসও বিভিন্ন কালে সমকালোপযোগী পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করে। তার ফলে কালের গতির সাথে সাথে সাহিত্যের রসাস্বাদনের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্য সম্পর্কে এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও সাথে সাথে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মানবপ্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ পূর্বোক্ত মৌলিক ইমোশানগুলি যেহেতু বিশেষ দেশ ও কালের সীমা বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ থাকে না, সেইহেতু রূপদক্ষ শিল্পী যদি তাঁর

সৃজনশৈলীর উৎকর্ষের সহায়তায় কোন ব্যাপারের অন্তর্নিহিত আবেদনকে দেশ ও কালের বন্ধন মুক্ত করে কোন না কোন মৌলিক ইমোশনের সাথে তার একাত্মতা সম্পাদন করতে পারেন—তবে সে সাহিত্য দেশ ও কালের সম্পর্ক-চ্যুত হয়ে সর্বলোকসামান্যতা অর্জন করে এবং সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও তার স্বাদ্যতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কবি নাট্যকার বা সাহিত্যিক তাঁর দ্বারা পরিবেশিত বিষয়বস্তুর সাধারণীকরণে যতটা সাফল্য অর্জন করবেন, তাঁর সৃজনের স্বাদ্যতা সেই পরিমাণে স্থায়ী হবে।

তাই, শরৎচন্দ্র যে সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সেই সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে বলেই তাঁর সকল রস বাসি হয়ে গিয়েছে এরূপ ধারণা যুক্তি-গ্রাহ্য নয়।

২

গল্প-উপন্যাসের লেখকেরা সকলেই যে আপন আপন সমকালীন সমাজকে আশ্রয় করে কাহিনী রচনা করেন এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত অধিকাংশ উপন্যাসের কাহিনীর সাথে তাঁর সমকালীন সমাজের কালব্যবধান সুপ্রচুর; আধুনিক কালেও অনেক বিশিষ্ট লেখক সুদূর অতীতকালের পটভূমিতে উপন্যাস রচনা করেন এবং সে সকল উপন্যাস সুখপাঠ্যও হয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের প্রায় সকল গল্প উপন্যাসই তাঁর সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত। নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি, কদাকার নিষ্ঠুরতা, নীচতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে তিনি লোক-লোচনের সমক্ষে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যে সকল জায়গায় তিনি সমকালীন সমাজকে আঘাত করেছেন তার প্রায় সর্বত্রই তাঁর আঘাত খুব স্পষ্ট এবং তীব্র।

সমকালীন সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ছিল সীমাবদ্ধ—খুব ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছেন বলে মনে হয় না। শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল কেটেছে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে। কিন্তু কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁর নিবাস স্থানান্তরিত হয় ভাগলপুরে। বয়স যখন ১৩ বছর সেই সময়ে ভাগলপুর ছেড়ে পুনরায় তাঁকে আসতে হয় দেবানন্দপুরে। তারপর বছর তিনেকের মধ্যেই ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন। ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স বোধহয় ১৬ বছর। মধ্যে কিছুদিন অর্থাৎ ১৬ বছর বয়সেরও আগে কয়েকমাস সন্ন্যাসী হয়ে

এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান এবং কলকাতায় ছয় মাস কাল অবস্থান করে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবার ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্রপাড়ি দিয়ে বর্মা মুলুকে চলে যান। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্মা মুলুকেই তাঁর অবস্থান। ঐ বৎসরই স্থায়ীভাবে বর্মা ত্যাগ করে দেশে আসেন এবং প্রায় ১০ বৎসর হাওড়া শহরের কাছে শিবপুর অঞ্চলে কাটিয়ে বাগনান থানার অধীন সামতাবেড় নামক গ্রামে নিজে বাড়ী করে তথায় বাস করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে নিজে বাড়ী করে তথায় বাস করতে থাকেন - এর চারবছর পরে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালীন বাংলার গ্রামীণ সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অর্জনের যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। আঞ্চলিক দিক দিয়ে গ্রাম বাংলা বলতে রাঢ়ের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের মধ্যে আকরণ, সংস্কার, জীবন-চর্চার পদ্ধতি ও সামাজিক ধ্যানধারণার একটা মৌলিক ঐক্য থাকলেও পার্থক্যও ছিল বিস্তর। পূর্ববঙ্গের ও বারেন্দ্রভূমির সামাজিক জীবন ও আকার আকরণ এবং রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ সামাজিক জীবন এক ছাঁচে ঢালা ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারা যায় 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ প্রথার যে ন্যক্কারজনক চিত্র শরৎবাবু উপস্থিত করেছেন সে ধরনের বহুবিবাহ পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত ছিল না। আমাদের বাল্যকালেও (অর্থাৎ আজ থেকে ৭০।৭৫ বছর পূর্বেও) একই ব্যক্তির ১০০।১৫০ বিবাহের কোন গল্প তৎকালে যাঁরা বয়সের দিক দিয়ে আমাদের পিতামহ তুল্য ছিলেন তাঁদের মুখেও আমরা কদাপি শুনতে পাইনি। এমন কি একই সাথে একাধিক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে অথবা যাঁর একাধিক স্ত্রী একসাথে জীবিতা আছেন, ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ দৃষ্টান্তও আমরা যা দেখেছি সেটা নিতান্ত নগণ্য। এবং দুইয়ের বেশী পত্নী এককালে জীবিতা আছেন এমন ব্রাহ্মণ আদৌ দেখি নি। 'বামুনের মেয়ে' গল্পে মুকুন্দ মুখুজ্যে ও হিরু নাপিতের কাহিনী শরৎচন্দ্রের সমকালীন সমাজের ঘটনা বলে মনে হয় না। তবে বহু পূর্বকালে রাঢ় অঞ্চলে হয়ত কৌলীন্য-প্রথার ঐ ধরনের ন্যক্কারজনক পরিণতি প্রচলিত সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত জনশ্রুতি মধ্য দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের ঐ ধরনের ঘৃণার্হ অথচ

করুণ কাহিনী শরৎচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হয়েছিল। কাহিনীর মধ্যে লম্পট জমিদারের চক্রান্তে নিরপরাধিনী দুইটি নারীর ও একজন সৎ ও হৃদয়বান্ পুরুষের বিচূর্ণিত ভাগ্যের অন্তরালে যে মর্মভেদী পুরুষের হাহাকার লুকানো ছিল, সামাজিক কদাচারের প্রতি কশাঘাত করবার জন্য শরৎচন্দ্র মনুষ্যহৃদয়ের সেই হাহাকারকে তুলে ধরেছেন যদিও তাঁর সমকালীন সমাজে ঐ ধরনের কদাচার প্রবহমান ছিল না।

শরৎচন্দ্র যে তাঁর সমকালীন পাঠকদের অন্তরের সাথে খুব বেশী মাত্রায় ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর দ্বারা পরিবেশিত গল্প উপন্যাসের অসামান্য জনপ্রিয়তাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও অধ্যাপক-গণের টেবিল থেকে পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত স্বল্পশিক্ষিতা গৃহিণী-দের রন্ধনশালা পর্য্যন্ত শরৎসাহিত্য নির্বাধে বিচরণ করেছে। সাহিত্য-জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর রচনাগুলি নিরন্তর ক্রমবর্ধমান সমাদর অর্জন করেছে। পাঠকের সাথে লেখকের অন্তরের আত্মীয়তা লেখকের শিল্পদক্ষতার স্বীকৃতি বহন করে। মানবমনের কোন্ জানালা দিয়ে, কোন্ রন্ধ্রপথে শরৎসাহিত্যের জ্যোৎস্নালোক অগণিত পাঠকের অন্তর-লোকে প্রবেশ করে সেখানে রসের জোয়ার এনে দিয়েছিল, শরৎসাহিত্যের আলোচনায় সেই সব জানালাগুলি আবিষ্কার করাই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য।

৩

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কোন দিক দিয়েই শরৎচন্দ্রকে যথার্থ বিপ্লবী সাহিত্যিক বলে চিহ্নিত করা চলে না। নির্য্যাতিত, দুর্গত, ও অধঃ-পতিত জনশ্রেণীর পক্ষে লেখনী চালনা করেছেন—এ কথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা দুঃখের আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হয়েও কেউ বিপ্লবী হয়ে ওঠে নি। অন্যায়ের কশাঘাতে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কিন্তু শরৎবাবু তাদের কাউকেই বিদ্রোহীর ভূমিকায় দাঁড় করান নি। (একমাত্র শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার মধ্যে ও শেষের দিকে বিদ্রোহের অগ্নিশিখার একটুখানি ঝলক আছে)। যে হতভাগ্যেরা সামাজিক অন্যায় ও সামাজিক কাদাচারের বলি, শরৎবাবু তাঁদের দীর্ঘশ্বাসকে ভাষা দিয়েছেন, তাদের অশ্রুকে দিয়েছেন পাঠকের অন্তরকে বিদ্ধ করবার মততীক্ষ্ণতা, কিন্তু তারা সকলেই সামাজিক অন্যায়ের খড়্গের তলায় অসহায়ের মত মাথা পেতে দিয়েছে। কেউ বিদ্রোহ করে ন্যায় বিরোধী;

মনুষ্যত্ববিরোধী সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি। তিনি অন্যায় ও অনাচারের কতকগুলি জীবন্ত ছবি প্রশ্নের আকারে সমাজের মুখের উপরে ছুঁড়ে দিয়েছেন। পাঠকদের দিকে বেদনার্ত চক্ষু মেলে যেন প্রশ্ন করেছেন—'কি বলতে চাও তোমরা ? এই তো তোমাদের সমাজ — তাকে মলিনতামুক্ত করবার পথ কোথায় ?'

সব কাহিনীতেই যে সামাজিক অপশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধের নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে কাহিনীগুলি পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে তা নয়। তাঁর যে সাহিত্যকৃতি প্রথমে বিদগ্ধসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই 'বড়দিদি' উপন্যাসে সুরেন্দ্র ও মাধবীর হৃদয়ে নিরন্তর অথচ গোপন রক্তক্ষরণ উপন্যাসগত ট্রাজেডির আশ্রয়স্থল—কিন্তু ঐ রক্তক্ষরণের জন্য 'সমাজ' প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল না। নায়ক-নায়িকা উভয়ের চিত্তে ন্যায় অন্যায়ের একটি ধারণা দৃঢ়মূল সংস্কারের আকারে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। সুরেন্দ্র বা মাধবী—কেহই এই সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারে নাই, তাই হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষরণকে তাদের পরস্পরের কাছে এবং অপর সকলের কাছে গোপন রাখতে হয়েছে। অবশ্য এই সংস্কারবশ্যতা সামাজিক প্রভাবপুষ্ট। এজন্য পরোক্ষভাবে সমাজকে দায়ী করা যায়। কিন্তু উপন্যাসে সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত অস্পষ্ট। 'পথনির্দেশ' গল্পে গুনেন্দ্র ও হেমনলিনীর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ঐ একই উৎস থেকে উৎসারিত—কিন্তু নায়ক-নায়িকা উভয়েই পরস্পরের কাছে অধিকতর স্পষ্ট। সুলোচনার সংস্কারবশ্যতা থেকে কাহিনীগত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ; হেমনলিনীর মধ্যে হৃদ্‌গত অভিলাষের সাথে আজন্মলালিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব অন্তরালবর্তী নয় —তার আচরণেও ভাষণে সে দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হযে উঠেছে। কিন্তু গল্পের শেষে সমস্ত দ্বিধাসংকোচ কাটিযে হেম যখন তার আত্মনিবেদনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে এনেছে সেই সময়ে গুণেন্দ্র অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে নিয়ে—"অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ"—এই দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে পারস্পরিক প্রণয়ের স্বাভাবিক পরিণতিকে অগ্রাহ্য করলো। এখানে 'সমাজের' প্রায় কোন ভূমিকা নাই, কারণ, যে পরিবেশে লেখক তাঁর নায়ক নায়িকাকে পাঠকজনের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন—তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে, যে গুণেন্দ্র বা হেমনলিনী যদি আপন আপন অন্তরকে মুক্ত করতে পারত, তাহলে 'সমাজ' তাদের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াতো

না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মহিম, অচলা ও সুরেশকে ঘিরে উপন্যাসগত কাহিনী যে করুণ পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে তার মধ্যেও সমাজের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ। 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর পারস্পরিক ভালবাসা যে স্বাভাবিক পথে সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে পারলো না এবং দুটি সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল, ব্যর্থতার বিষের জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে দেবদাস বিষের পাত্র স্বহস্তে তুলে নিয়ে আকণ্ঠ বিষপান করে আপন অস্তিত্বকেই বিষময় করে তুললো—সে ব্যাপারে সমাজ-শাসন কোন বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে নি। দেবদাসের আভিভাবকদের অভিরুচিই দেবদাস ও পার্বতীর মধ্যে দেয়াল তুলে দিল—মিলন ঘটলো না। পার্বতীর পিতৃবংশ "মেয়ে বেচা বামুন" (অর্থাৎ কন্যার বিবাহ দিতে বরপক্ষের নিকট থেকে পণ গ্রহণ করে), এবং "বাড়ীর পাশে কুটুম বেমানান"—এই দুটি আপত্তির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দেবদাস-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব ভূলুণ্ঠিত হল। 'মেয়েবেচা' ঘরের প্রতি ঘৃণা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এখনও প্রবহমান রয়েছে। সুতরাং 'শরৎচন্দ্রের আমলের সমাজ বদ্‌লে গেছে' এ ব্যাপারে এ কথা বলবার সুযোগ নাই। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কিরণময়ীর করুণ পরিণতির জন্য কোন বিশেষ কালের সমাজকে দায়ী করা যায় না। কিরণময়ীর দাম্ভিকতা ও চিত্তের চপলতাই তাঁর ভাগ্যকে নিদারুণ বিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সাবিত্রী সতীশের পারস্পরিক ভালবাসা যে বিবাহগত মিলনের মধ্য দিয়ে সার্থকতায় পেঁছায় নাই—এতে কোন অভিযোগের অবকাশ দেখি না। এদের বিবাহে এমন কিছু বাধা ছিল না। সতীশ সামাজিক বাধাকে অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু এই বিবাহ না ঘটিয়ে লেখক তাঁর শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন নারী যদি জানে যে তাকে বিবাহ করলে তার প্রেমাষ্পদ ব্যক্তি লোকসমাজে নিন্দিত হবে—তা হলে অবশ্যই বিবাহে সম্মত হবে না। সাবিত্রী সতীশের বিবাহ হলে সাবিত্রী ছোট হয়ে যেতো—এবং তার ভাল-বাসার মহিমা খর্ব হত। 'বিরাজ বৌ' 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' 'বৈকুণ্ঠের উইল' 'দত্তা' 'পরিণীতা' প্রভৃতি রচনাতেও সামাজিক অপশাসন কোন পটভূমি রচনা করে নাই। সুতরাং কালের প্রভাবে এসব রচনা স্বাদ্যতা হারিয়েছে, এরূপ অভিযোগের সুযোগ নাই।

'পল্লীসমাজ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'মহেশ'

'একাদশী বৈরাগী' প্রভৃতি রচনায় সমকালীন সামাজিক পটভূমি প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং এই রচনাগুলির আবেদন বর্তমান কালে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে কি না তা আলোচনার যোগ্য। এ ছাড়া 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে' রাজলক্ষ্মীর জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত বহু-বিবাহ প্রথার কদর্যতা কিছুটা উঁকি মেরেছে। আর, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে নীচ স্বার্থ-গৃধ্নু কুচক্রী সমাজপতিদের দ্বারা ষোড়শী নিগ্রহের ব্যাপারেও সমকালীন সমাজ উপন্যাসের একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে।

৪

একথা অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্র সামাজিক সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলকে প্রায়শঃ অতিক্রম করেন নি। তাঁর রচনার মধ্যে অনেক জমিদার ও আধা-জমিদার ভীড় জমিয়েছেন। বড়দিদি উপন্যাসের সুরেন্দ্র, শুভদা'র ভগবানবাবু সুরেন্দ্রবাবু, দেনাপাওনায় জীবানন্দ, দত্তা উপন্যাসে বনমালীর কন্যা বিজয়া, কাশীনাথ গল্পের প্রিয়বাবু, বিরাজ বৌএ লম্পট জমিদার রাজেন্দ্র, বামুনের মেয়ে উপন্যাসে ততোধিক লম্পট ও কুচক্রী গোলক চাটুয্যে, চন্দ্রনাথ, গল্পের নায়ক চন্দ্রনাথ, অসমাপ্ত উপন্যাস জাগরণের ব্যারিষ্টার সাহেব, এবং 'বিপ্রদাস উপন্যাসে উক্ত নামধারী জমিদার এঁরা ত আছেনই। তা ছাড়া 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবদাস ও তার বড়ভাই ধর্মদাস এবং পার্বতীর প্রৌঢ় স্বামী ভুবন চৌধুরী আছেন। পল্লীসমাজ উপন্যাসের রমেশ, বেণী, রমা এরাও জমিদার। এ ছাড়া 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' এবং 'অনুরাধা' এসব গল্পেও জমিদার চরিত্র আছে। শরৎবাবু একদিকে যেমন নীচাশয় পাপিষ্ঠ জমিদারের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, অপরদিকে তেমনি সৎ, মার্জিতরুচি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত প্রজাবৎসল জমিদারের চরিত্রও পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই দুইশ্রেণী মিলিয়েই সমাজতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব ছবি রচিত হয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে এরকম প্রচারধর্মী রচনা দেখা যাচ্ছে যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল—জমিদার হলেই সে ব্যক্তি অবশ্যই পিশাচ হবে। এ ধারণা বাস্তবতাবিরোধী - এবং মার্ক্সের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' তত্ত্বের সাথে ঐরূপ ধারণার কোন সঙ্গতি নাই। ভাল করে মার্ক্সের তাত্ত্বিক রচনাগুলি পড়লে বোঝা যাবে যে তাঁর মতে মানবসভ্যতার আদি যুগ থেকে ঐ সভ্যতার

চূড়ান্ত-যুগ অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজের যুগে পেঁছুতে সভ্যতাকে কতকগুলি মধ্যবর্তী স্তর উত্তরণ করে যেতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে সেইরূপ একটি অপরিহার্য্য স্তর। এটা সেই স্তর যার অন্তর্নিহিত সংকটাবলীর চাপে মানবসভ্যতা পুঁজিবাদী স্তরে উত্তরণ তারপর আবার পুঁজিবাদী সংকটের কাঁধে চেপে সভ্যতার সমাজবাদে উত্তরণ ঘটে। মার্ক্সের মতে প্রতি স্তরেই সভ্যতা প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। তারপর তার অভ্যন্তরে বৈপরীত্য সমাবেশের ফলে যখন তার আর অগ্রসর হওয়ার শক্তি থাকে না—তখন অবক্ষয় আসে। সংকট আসে। এবং সভ্যতার পরবর্তী স্তরে উত্তরণের জন্য মানুষের সংগ্রাম তীব্র হতে থাকে। অতএব সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা বেশ কিছুকাল প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে বাধ্য—এটা ইতিহাসের নির্দ্দেশ। ভারতবর্ষে কৃষি-অর্থনীতির পরিপোষণের উপযোগী বাস্তব উপাদান সমূহের প্রাচুর্য্য ছিল বলেই ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে—এবং তার অবদানও অসামান্য। সামন্ততন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা যতদিন প্রবহমান ছিল ততদিন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির গর্ভেই নূতন নূতন উন্নত মূল্যবোধ জন্মলাভ করতে থাকে। অবক্ষয়ের যুগেও সেইসব মূল্যবোধ একেবারে মুছে যায় না, ভাঙনের পাশাপাশি আপন বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে—যতদিন না সমাজ নবস্তরে উন্নীত হয়ে স্থিতিলাভ করতে পারছে ততদিন। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মস্তকস্বরূপ জমিদারশ্রেণীর মধ্যে ভালো-মন্দ দুইয়েরই সংমিশ্রণ থাকবে। শরৎচন্দ্র আপন অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির আলোকে ভালো ও মন্দ দুই তরফের জমিদারদেরকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অবেক্ষণ ইতিহাসসম্মত।

আর্ত্তের ও নির্য্যাতিতের প্রতি সহমর্মিতা শরৎ-সাহিত্যের যত্রতত্র ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু পরিত্রাণের পন্থা অনুসন্ধান করতে গিয়ে, সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তরের চিন্তা তাঁর চিত্তে উদ্গত হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করেছেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে যে সকল কল্যাণমুখী মূল্যবোধ জন্মলাভ করেছিল সেইসব মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনের উপরে। আকারে ইঙ্গিতে এ কথাই বলেছেন যে উদার মূল্যবোধসমূহ যা পূর্বে—অর্থাৎ সভ্যতার প্রগতিশীল অগ্রগতির যুগে মানুষের চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করত সেইসব মূল্যবোধ থেকে মানুষ দূরে সরে এসেছে

বলেই তাঁর কালের সমাজ (অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ) নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। এই মূল্যবোধগুলি ফিরিয়ে আনতে পারলেই সমাজের কলুষপুচ্ছ অপসৃত হবে। মনুষ্যত্বমণ্ডিত-আদর্শ জমিদারের উপরে তিনি জোর দিয়েছেন—জাগরণ নামক অসমাপ্ত উপন্যাসে এবং বিপ্রদাস উপন্যাসে। 'বিপ্রদাস'-এ তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সমাজের শীর্ষদেশে তাঁর বিপ্রদাসের মত সৎ, তেজস্বী, শিক্ষিত, প্রজাবৎসল, মনুষ্যত্ববোধসমৃদ্ধ জমিদার যদি আসন লাভ করে তাহলে সমাজে কল্যাণ বিরাজ করবে, বর্তমান-কালের দৃশ্যমান কলঙ্কসমূহ অপসৃত হবে। অথচ বিপ্রদাস উপন্যাসের রচনা সুরু হওয়ার প্রায় ১৩ বছর আগে 'অক্টোবর বিপ্লব' সারা পৃথিবীর মনীষিগণের চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। তার ঢেউ ভারতবর্ষের মাটির উপরেও আঘাত হানতে সুরু করেছে। তখনও শরৎবাবু 'আদর্শ জমিদার-শাসিত' সমাজের চিন্তায় মগ্ন। 'পথের দাবী' উপন্যাসে শরৎবাবু শ্রমিক বস্তীর নারকীয় চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। সেখানে আর্তের প্রতি, উৎপীড়িতের প্রতি শরৎবাবুর সহমর্মিতা, তাদের দুঃখকে আপন দুঃখ বলে অনুভব করা - এই দিকটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানেও তাঁর উপলব্ধি শ্রেণীবোধের দ্বারা উদ্দীপিত হয় নাই।

৫

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভজাত মূল্যবোধগুলির প্রতি শরৎচন্দ্রের অণুরক্তির আরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাপে পুরাতন যৌথ পরিবারগুলি অনিবার্য্যরূপে ভেঙ্গে পড়েছে তথাপি তিনি নানা রচনায় পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল যৌথ পরিবারের চিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন।

পরিবারের মাথায় ব্যক্তিগত স্বার্থবোধশূন্য উদারহৃদয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপেন্দ্র (নিষ্কৃতির গিরীশ, 'বিন্দুর ছেলে'র যাদব, বিপ্রদাস উপন্যাসের বিপ্রদাস—ইত্যাদির মত) অনুগত কনিষ্ঠ (নিষ্কৃতির রমেশ, বিন্দুর ছেলের মাধব, বিপ্রদাস উপন্যাসের দ্বিজদাস ইত্যাদির মত), স্বার্থত্যাগিনী স্নেহ-বাৎসল্য মণ্ডিতা গৃহিনী—শ্বাশুড়ী অথবা জ্যেষ্ঠা বধূ (অন্নপূর্ণা, সিদ্ধেশ্বরী, দয়াময়ী, নারায়ণী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির মত) ভগিনীবৎসল ভ্রাতা (বিরাজ বৌ উপন্যাসের নীলাম্বরের মত)—এদেরকে সমাজের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে যৌথ পরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা প্রতিফলিত হচ্ছে।

যৌথ পরিবার যে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির হাড়িকাঠে কাটা পড়েছে—এটা শরৎবাবুর নজরে পড়ে নাই। কোন শিল্পগত সৃজনকর্মের স্বাদ্যতাগুণ শাশ্বতধর্মী না সাময়িকতাধর্মী তা নির্ণয় করবার পক্ষে, পাঠকের মনে সাড়া জাগানোর জন্য লেখক কোন উপকরণটিকে গ্রহণ করেছেন—শুধু সেইটুকুর বিচারই যথেষ্ট নয়। উপকরণ রসসৃষ্টির একটা উপলক্ষ্য মাত্র। ক্ষণকালের ব্যাপারের মধ্যে সুচিরকালীন আস্বাদন-সুখ সন্নিবিষ্ট করা—এটাই শিল্পীর কাজ। অতএব, উপকরণ পরিবেশ ইত্যাদি কোন শিল্পকর্মের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণযের একমাত্র মানদন্ড নয়।

অভাগীর স্বর্গ, বামুনের মেয়ে ও মহেশ—এই তিনটি রচনায় জমিদারের নৃশংসতাকে শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীর উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন। 'অভাগীর স্বর্গ" গল্পে দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়নের সূত্র হল একটি বৃক্ষছেদন। অতীতকালে এরকম নিয়ম ছিল যে জমিদার কোন প্রজাকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময়ে—"বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পারিব" "পাকাবাড়ী নির্মাণ করিতে পারিব না" ইত্যাদি সর্ত লিখিয়ে নিতে পারতেন এবং ঐরূপ সর্ত লেখা থাকলে তা প্রজার উপরে বাধ্যকর হত। সে নিয়ম ১৯২৮ সালে বিলুপ্ত হয়েছে। অতএব বৃক্ষছেদনরূপ যে ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে লেখক তাঁর কাহিনীর জাল বুনেছেন তা আধুনিক পাঠকের মনে কোন রসাঢ্য আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না—কারণ বর্তমানের আইন সকল প্রজাকেই বৃক্ষছেদনের অধিকার দিয়েছে। মহেশ গল্পে জমিদারের যে উৎপীড়নকে কাহিনীর উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছেন, ঐ ধরনের উৎপীড়ন বর্তমানকালে ঘটে না—জমিদারী প্রথাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে প্রায়বৃদ্ধ লম্পট জমিদার যৌনক্ষুধার তাড়নায় তার বালিকা সন্ধ্যাকে বিবাহ করতে চায় বলে সন্ধ্যার মায়ের কাছে প্রস্তাব পাঠিযেছিল—সন্ধ্যার মাতা সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুচক্রী জমিদার সন্ধ্যার মাতামহীর জীবনের এক গোপন কলঙ্কের ইতিহাসকে অতীতের গর্তের মধ্য থেকে টেনে বের করে নিয়ে এসে শুধু যে সন্ধ্যার বিবাহ ঘটতে দিল না তাই নয়, সন্ধ্যা ও তার পিতা মাতা ও মাতামহীকে দুঃসহ অপমানের কূপে নিক্ষেপ করলো। এই অপমানের পশ্চাৎপটে রয়েছে—বহুবিবাহকারী কুলীনব্রাহ্মণ কর্তৃক তার শতাধিক শ্বশুরবাড়ী থেকে 'জামাতার মর্য্যাদা' আদায়ের জন্য হিরুনাপিত নামক এক ব্যক্তিকে প্রক্সি

নিষুক্ত করবার ন্যক্কারজনক কাহিনী। ঐ সকল কুপ্রথা বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হয়েছে। আধুনিক কালের সমাজমানসে আলোড়ন সৃজনের ব্যাপারে প্রয়াতকালের কবরের তলা থেকে সংগৃহীত উপকরণ যথেষ্টরূপে যোগ্যতা-সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং সামাজিক কদাচারের বিরুদ্ধে শরনিক্ষেপ যদি ঐ উপন্যাসের শিল্পকর্মের প্রধান উপাদান হত তা হলে আমরা অবশ্যই উপন্যাসটিকে সাময়িকতাধর্মী বলে চিহ্নিত করতে পারতাম। অভাগীর স্বর্গ এবং মহেশ গল্প সম্পর্কেও এই একই মন্তব্য করা যেতে পারে। যে ধরনের জমিদারী নৃশংসতা ঐ দুটি গল্পের উপজীব্য, আধুনিক অভিজাত সীমার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে সমাজে 'জমিদার' বলে কোন শ্রেণী নাই। পল্লীসমাজ উপন্যাসে যে নীচতা ক্রূরতা স্বার্থগৃধ্নুতায় পঙ্কিল, অবক্ষয়বিভ্রান্ত গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র শরৎবাবু লোকলোচনের সমক্ষে তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্র—কিন্তু আধুনিককালে গ্রামীণ সমাজের চেহারা বদ্‌লেছে। শরৎবাবু যে গ্রামীণ সমাজের ছবি এঁকেছেন সেটা ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজের অন্তিম দশার ছবি। একদা-সম্মানিত গ্রামীণ ভূস্বামীদের দুর্বল ভ্রষ্টচরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন বংশধরেরা তখনও সমাজের মাথা বলে পরিগণিত। আধুনিক সমাজে এই শ্রেণীর সমাজপতির কোন অস্তিত্ব নাই। মানুষের বিশ্বাস ও আচরণ দুইই পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং পল্লীসমাজের কাহিনীর উপরও সাময়িকতার দাগ লাগবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জরাজীর্ণ গ্রামীণ সমাজের ভাঙ্গা বাড়ীটাই ঐ উপন্যাসের পাঠকদের কাছে একমাত্র আকর্ষণ নয়। রমা ও রমেশের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের তলদেশের নিরন্তর ও গোপন রক্তক্ষরণ ঐ উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। এই রক্তক্ষরণে সমাজের ভূমিকা অবশ্যই আছে। কিন্তু সে ভূমিকা গৌণ। তাদের পারস্পরিক মিলনে আইনের বাধা ছিল না। সামাজিক নিগ্রহের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে নিগ্রহকে অগ্রাহ্য করবার বা তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় সুদুর্লভ ছিল না। আসলে সামাজিক ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে আজন্ম লালিত ধারনাকে তারা কেউ অতিক্রম করতে পারলো না। তারা সমাজের সাথে লড়াই করে হয়ত জয়ী হতে পারত কিন্তু উভয়েই আপন আপন অন্তরের কাছে পরাজিত হল। তার ফলে দুটি হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা তার স্বাভাবিক পরিণতি অস্বীকার করতে পারলোনা। দুটি জীবন ব্যর্থ হল হৃদয়ের হাহাকার উভয়েরই আমৃত্যু

সহচর হযে রইল। রমা ও রমেশের ট্রাজেডিকে এই আলোকে অবলোকন করলে আমরা দেখ্‌তে পাবো যে উপন্যাসের ট্রাজেডি সাময়িকতার সীমাবন্ধন অতিক্রম করে দূরবর্তী ভাবীকাল পর্যন্ত তার প্রভাবকে বিস্তার করে দিতে সমর্থ হয়েছে। তা ছাড়া বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ভৈরব আচার্য্য, দীনু ভটচায্‌রা ত পরিচ্ছদ বদল করে একালের গ্রামীণ সমাজেও সদর্পে চলাফেরা করছে। এ কালের সামাজিক ভিলেনদের আঁটো-সাঁটো পরিচ্ছদ আলগা করলেই সেই পোষাকের আড়ালে সেকালের বেণী ঘোষাল-গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের সাক্ষাৎ মিলবে।

তেমনি 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে—একটি সৎ, সরলচিত্ত, পরোপকারী পুরুষ ও কয়েকটি ভাগ্য বিড়ম্বিত নারী—যারা কেউ জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করে নি—তাদের সকলের নিষ্পাপ জীবন এক প্রতিপত্তিশালী পাপিষ্ঠের চক্রান্তের অপঘাতে অকালে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। ক্ষমতাবানের খড়্গে নিরপরাধ দুর্বলের কণ্ঠচ্ছেদ ঘটলো। মহেশ গল্পেও জমিদারের অত্যাচার গল্পের প্রধান উপজীব্য নয়। গফুরের সহজ ভালবাসা ও মমত্ববোধের বন্ধনে মানুষ ও পশু একসাথে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। এই দুর্লভ শিল্পগুণের দ্বারাই 'মহেশ' গল্পটি দেশ ও কালের সীমানা ডিঙিয়ে চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদালাভে সক্ষম হয়েছে। জমিদারের উৎপীড়ন কাহিনীর রসাঢ্যতা সম্পাদনের একটি আঙ্গিক মাত্র।

৬

শরৎসাহিত্যের সাময়িকতা ও কালজয়িতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তার মধ্যে বৈপ্লবিকতার প্রশ্নও এসে পড়ে। পূর্বেই বলেছি – শরৎবাবুকে ঠিক বিপ্লবী সাহিত্যিক বলা চলে না। কালজয়ী রচনাকে যে বৈপ্লবিক হতেই হবে, এমন কোন অলঙ্ঘ্য সর্ত নাই। 'বিপ্লব' কালে সামাজিক পরিবর্তন রূপায়িত করে, মানুষের সভ্যতাকে কোন এক বিশেষ স্তর থেকে উন্নততর স্তরে পেঁছে দেয়। কিন্তু যে গুণে সাহিত্য চিরায়ত স্বাদ্যতায় অভিষিক্ত হয় তাকে কোন এক বিশেষ স্তরের সামাজিক রূপান্তরের পরিচয়বাহী হতে হবে, অথবা যে সকল জটিল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজ কালে কালে তার খোলস বদলায় তার ছাপ বহন করতে হবে এমন চিন্তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। যদিও বৈপ্লবিক সাহিত্যও শিল্পদক্ষতার গুণে চিরায়ত সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করতে পারে। মানবধর্মের যে অংশটুকু পুনঃ পুনঃ সামাজিক পরিবর্তনের

আঘাত সহ্য করেও তার আপন মর্য্যাদা হারায়, সেই অংশটুকুর মধ্য থেকেই সাহিত্যের চিরায়ত স্বাদ্যতার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে, শরৎবাবুর 'পথের দাবী ও 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে কিছু আলোচনা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

'পথের দাবী' উপন্যাস যে পাঠকসমাজে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য্য। এই 'সাড়া জাগানোর' পিছনে উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তার উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি যেমন কার্য্যকর হয়েছিল, তেমনি কয়েকটি পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবও বহুলাংশে কার্য্যকর হয়েছিল। শরৎবাবু 'পথের দাবীর' ছত্রে ছত্রে আগুণ ছড়িয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ধিক্কার এই পুস্তকের সর্বাঙ্গে আগুনের অক্ষরে গ্রথিত রয়েছে। 'পথের দাবী' পাঠ করে বহুতর তরুণ-তরুণী বিপ্লবীদলে যোগদানে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তার সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা—যথা, সরকার কর্তৃক ঐ পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ-করণ, এই সরকারী কুকার্যের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জ্ঞাপন, এবং তার জবাবে রবীন্দ্রনাথের নির্মম মন্তব্য, এগুলির প্রতিক্রিয়া পথের দাবীকে ঘিরে একটি রোমাঞ্চক আলোকবৃত্ত সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পথের দাবী বৈপ্লবিক উপন্যাস হয় নাই। শরৎবাবুর আত্মীয়বর্গ ও তাঁর সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক বিপ্লবীদলভুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের কর্মকৌশল সম্পর্কে শরৎবাবুর কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। সেকালে বিপ্লবীরা এমনভাবে মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেন যে তাঁদের পরিবারের লোকজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও নিজেদের কর্ম বা পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন কথা প্রকাশ করতেন না। ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র বাস করেছেন বর্মা মুলুকে। ঐ সময়ে বর্মামুলুকেও কিছু কিছু বাঙ্গালী বিপ্লবী ছিলেন—কিন্তু তাঁদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে নি। এদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ের দুর্ধর্ষ কর্মকাণ্ড যে কালে অনুষ্ঠিত হয় সে কালে শরৎবাবু ব্রহ্মদেশ নিবাসী। ১৯১৬ থেকে ১৯১৮-এ ২।৪ টির বেশী বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নি। যুগান্তর দলের কাজকর্ম বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধের পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনুশীলনের ধরাইল ডাকাতি, আব্দুল্লাপুর ডাকাতি, গৌহাটী ফাইট, কনতাবাজার ফাইট প্রভৃতি ২।৪ টি মাত্র বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। পথের দাবীর কতকাংশ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ এই সময়ের মধ্যে এদেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং 'পথের দাবী' রচনায় শরৎচন্দ্রকে অনেকাংশই গালগল্প ও কল্পনার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী পরিচালিত বিপ্লবীদলের কর্মক্ষেত্র দেখানো হয়েছে ব্রহ্মদেশ জাপান ও পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে। হয়ত নিষেধাজ্ঞার খড়্গ এড়ানোর জন্য শরৎবাবু ঐরকম অবাস্তব পটভূমি সৃষ্টি করেছিলেন—কিন্তু এ'র জন্য কাহিনীর উপরে কৃত্রিমতার আস্তরণ পড়েছে। বিপ্লবের নায়ক সব্যসাচীকে শরৎবাবু একটি 'অতিমানুষ' রূপে খাড়া করেছেন। প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তার সাথে বাস্তব ইতিহাসের ক্ষীণ যোগসূত্রও আবিষ্কার করা যায় না। বিপ্লবীদলের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর (Inner circle এর) সভায় একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবিণী একটি প্রায় অজ্ঞাত কুলশীল চাকুরীয়াকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো—এ সভার নেতা—যাঁর অবস্থানের ঠিকানা বাইরে জানাজানি হয়ে গেলে তাঁর পরবর্তী গন্তব্য স্থান হবে ফাঁসীমঞ্চ—তিনি স্বয়ং উপস্থিত—সেখানে ঐ অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হল—'আপনি আমাদের সভ্য হবেন ?' —এবং তারপরে ঐ ভদ্রলোকের নাম—মোটা খাতায় সভ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হল—এগুলি বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মকৌশলের ক্যারিকেচার মাত্র। তারপরে—শৃঙ্খলাভঙ্গের সাজা দেওয়ার জন্য অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সভা ডেকে ভোট নিয়ে শাস্তি নির্ণয়—এমনটি ভারতের বিপ্লবীদলে কখনও ঘটে নি। ব্রজেন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে সব্যসাচী বরাবরই সন্দেহযুক্ত—এমন কি সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা সব্যসাচী পূর্ব থেকেই জানতেন—এরকম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বইয়ের মধ্যে। অথচ সেই ব্রজেন্দ্রকেই পুনঃ পুনঃ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর সভায় দেখা যাচ্ছে—কোন বিপ্লবীদলে এ ধরণের ব্যাপার ঘটে না। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্বয়ং সব্যসাচী, তলোয়ারকর এবং ক্ষণিকের জন্য যার দেখা যায় সেই হীরা সিং—এ ছাড়া আর কেউ বিপ্লবী নয়। অপূর্ব ও ভারতী যে বিপ্লব পন্থায় বিশ্বাস করে না একথা শরৎবাবু পুনঃ পুনঃ তাদের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন। সুমিত্রার আকর্ষণ সব্যসাচীর প্রতি এবং সে আকর্ষণও প্রণয়গত, বিপ্লবের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নাই। থাকলে, যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারলো সব্যসাচীকে তার জীবনসঙ্গীরূপে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই—তখনই মৃত আত্মীয়ের

বিত্তবহুল উত্তরাধিকার ভোগ করার জন্য দেশে ফিরে যেতে পারতো না। কোন সুদূরে দুজন বিপ্লবীর ফাঁসী হয়েছে—এই খবর পেয়েই ব্যারিস্টার অঘোর বলে উঠলো "ডান্"—"ওয়াণ্ট' লাক—উই মাস্ট স্টপ"। এরা কোন্ দেশের বিপ্লবী ?

'পথের দাবী'র তথ্যগত উপকরণ শরৎবাবু কোন্ বিপ্লবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এ নিয়ে নানা তরফের নানা রকম দাবী আছে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—শচীন সান্যাল থেকে সুরু করে শেষ পর্য্যন্ত নাম প্রচারিত হচ্ছে হেমচন্দ্র ঘোষের। আমাদের মতে এই বিতর্কের কোন হেতু নেই। মালমসলাগুলি এতই কৃত্রিম যে তা কোন অভিজ্ঞ বিপ্লবীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। পথের দাবী বৈপ্লবিক উপন্যাস নয়। অনেকটা রূপকথাধর্মী রোম্যাণ্টিক উপন্যাস।

শেষ-প্রশ্ন উপন্যাসের নায়িকা কমলকে শরৎবাবু প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে বিদ্রোহ যুক্তিসম্মতরূপে দানা বাঁধে নি। উপন্যাসের লক্ষ্য অস্পষ্ট। বিদ্রোহ কমলের তার্কিকতার মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। সকল সমকালীন ধ্যানধারণাকেই সে তর্কের ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে - অথচ এই তর্কস্নাত বিদ্রোহের কোন গুরুতর সামাজিক পরিণতির এটি আভাস মাত্র ! কমল ও অজিতের বিবাহবন্ধনবর্জিত যৌথ জীবনযাপন নিতান্তই দুজন মানুষের ব্যক্তিগত খেয়ালমাত্র—সমাজকে পাশ কাটিয়ে নতুন কিছু করবার খেয়াল। কমল চরিত্র একান্তভাবে কৃত্রিম। সে যেন শুধু একটা তর্কের পুঁটলি—a bundle of debates। 'পথের দাবী'তেও যেমন শরৎবাবু কোন রাজনৈতিক বিপ্লবের আয়োজনকে যথার্থ রূপ দান করতে পারেন নি, 'শেষ প্রশ্নেও' তেমনি কোন সম্ভাব্য বা আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক বিপ্লবের চিত্র উদ্ঘাটন করতে তাঁর লেখনী ব্যর্থ হয়েছে।

৭

শরৎ সাহিত্যকে যথার্থভাবে 'বৈপ্লবিক' অভিধায় অভিহিত করতে না পারলেও স্বীকার করতে হবে যে তাঁর সাহিত্যিক চেতনা এমন সব উপাদানের সন্ধান লাভ করেছিল যাকে অবলম্বন করে দৃষ্টি প্রসারিত করলে স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজ বিপ্লবের পথের কিনারায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু শরৎ মানস সামন্ততান্ত্রিক সমাজবোধের পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করতে পারে নাই বলেই

যে পথের নিশানা তাঁর চক্ষুর সম্মুখে স্বাভাবিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে—তাকে তিনি আপন চেতনার মধ্যে আয়ত্ব করতে পারেন নি।

শরৎ-মানস প্রধানতঃ গ্রামীণ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভরশীল। যে ত্রিশ বৎসর শরৎ-সাহিত্যের সৃষ্টিকাল—অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮—এ ত্রিশ বছর আমাদের জাতীয় জীবনের প্রচণ্ড আলোড়নমুখর ও সংঘর্ষবিক্ষত কাল। এই আলোড়ন শুধু যে পরশাসনের রাক্ষুসে যন্ত্রটাকে লক্ষ্য করে পুষ্ট হয়েছে তা নয়—মুমূর্ষু ফিউডাল অর্থনীতির অংকলালিত যে সকল কুৎসিত ধ্যান-ধারণা ও আচার আচরণ সমাজ দেহের পৃষ্ঠদেশে যন্ত্রণাকর কার্বাঙ্কল রোগের রূপ নিয়েও অজ্ঞতা ও পরিবর্তন বিমুখতার উত্তাপে তার ব্যাধিগ্রস্ত অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল, কথিত কালের আলোড়ন ও সংঘর্ষ সেগুলিকেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছিল। এই আলোড়ন ও সংঘর্ষ অনেকাংশে নগরকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে শরৎচন্দ্রের গ্রামীন মানসের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। শরৎচন্দ্র গ্রামকে ও গ্রামীণ মানুষকে ভালবেসেছিলেন। গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে, গ্রামীণ পরিবেশের সাথে তাঁর যেমন ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তেমনি অপরিমেয় সহমর্মিতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় তিনি গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের জীবনের সহস্রবিধ দুঃখ ও বিড়ম্বনার সাথে আপন অন্তরকে একাত্মীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং স্বীয় রচনার মধ্য দিয়ে এই আত্মিক মিলনকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের আসরে শরৎচন্দ্রের পূর্বে আর কোন mass writer-এর আবির্ভাব ঘটে নি। তাঁর সাহিত্যিক চেতনা বিপ্লবমুখী হয়েও ফিউডাল সমাজবোধের সীমা-বদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে নি একথাও যেমন সত্য, অবক্ষয়হীন, ব্যাধিগ্রস্ত, অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামীণ সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্র তিনি সর্বপ্রথম বাঙ্গালী পাঠকদের সমক্ষে সার্থকভাবে উন্মোচিত করতে পেরেছিলেন – একথাও তর্কাতীতরূপে সত্য। দুর্গতের বঞ্চনা, প্রতাপশালীর পদতলে মানবিক অধিকারের সদম্ভ পেষণ—এইসব ব্যাপারের উপরে প্রচুর সংখ্যক বিদগ্ধজন বহুবর্ষব্যাপী বাগবিস্তারের দ্বারা যা করতে পারেন নি, শরৎবাবু তাঁর কথাশিল্প চর্চার দ্বারা সে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বৈপ্লবিক চেতনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শরৎবাবু সমাজ-চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যেখানে দাঁড়ালে মানুষের

পায়ের সামনে বিপ্লবের পথটি সহজেই তার দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তিনি এমন একজন লেখক যিনি স্বয়ং বাঞ্ছিত পথে পদক্ষেপ না করেও পাঠকজনকে সেই পথের সামনে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। যোগ্যপুত্র যেমন পিতাকে অতিক্রম করে, যোগ্য শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে, সেইপ্রকার শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি তাঁকে অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে।

৮

পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'শরৎচন্দ্র যে সমাজ-প্রেক্ষিতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন—আধুনিককালে সে সমাজ জীবিত নাই বলে শরৎ-সাহিত্যের স্বাদ্যতা ম্লান হয়েছে'—এরূপ চিন্তা যুক্তিসিদ্ধ নয়; এবং 'তাঁর রচনায় বৈপ্লবিকতা তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় নাই বলে একালে তার মূল্যমান নিম্নগামী হয়েছে'—এরূপ চিন্তাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। শরৎচন্দ্রের হাতে তাঁর সৃজনকর্মের অনেকাংশ যে কালোত্তরণ যোগ্যতা লাভ করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু সেই কালোত্তরণ যোগ্যতার উৎস সন্ধান করতে হলে আমাদের পূর্বোক্ত নেতিবাচক বিশ্লেষণ দুটিকে পরিহার করে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করতে হবে। অনাবিল মানবিকতা-বোধের সাথে করুণার্দ্র হৃদয়বত্তার সম্মিলন—এই বিশেষ গুণের প্রভাবেই শরৎচন্দ্রের নানা সৃজনকর্ম কালোত্তরণ-যোগ্যতার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছে। একে যদি কেউ 'হিউম্যানিজম্' অভিধার দ্বারা পরিচিত করতে ইচ্ছা করেন, তা হ'লে আপত্তি করব না। তা হলে বলব—'হাঁ হিউম্যানিজম বটে, কিন্তু তা গির্জার যাজক সম্প্রদায়ের বা সাধু-সন্ন্যাসীদের, বা দয়ালু মানুষের নির্বিরোধী-হিউম্যানিজম্ নয়। সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মানবিকতাবোধ যে রূপে প্রকাশ পেয়েছে একদিকে যেমন উৎপীড়িতের প্রতি মমত্ববোধে বিগলিত, অন্যদিকে, অন্যায়ের ও কুশ্রীতার প্রতি রক্তচক্ষু। একে সংগ্রামশীল মানবিকতাবোধ বা bellicose humanism নামে আখ্যাত করা যেতে পারে। যে মানুষ সমাজের চক্ষে অপদার্থ সমাজে উপেক্ষিত তার মধ্যে মহৎ মানবিক গুণ যদি লুকিয়ে থাকে শরৎবাবুর গভীর অন্তর্দৃষ্টি তাকে আবিষ্কার করে সমাজের সামনে তার ছবি মেলে ধরেছে। যেন সমাজকে ধমক দিয়ে বলেছেন 'তোমরা এ মানুষের বাইরের অপদার্থতাই শুধু দেখলে অন্তরের মূল্যবান পদার্থ দেখতে পেলে না?' ইন্দ্রনাথ মারামারি করে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু সেই দুর্দান্ত

বালক পাপপুণ্যে ত দূরের কথা—সাপ বাঘের ভয়কে পর্যন্ত মনের কোণে স্থান দেয় না। শ্মশানে পরিত্যক্ত মৃত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে তার হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। দুর্গত পরিবারকে সাহায্যদানের জন্য অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে। শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের অন্তরের রূপকে সহমর্মিতায় খণ্ডিত করে জনচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন—এবং অত্যন্ত শিল্পদক্ষতার দ্বারা তাকে স্বল্পকালমাত্র পাঠকের দৃষ্টি পথে রেখে অকস্মাৎ চিরকালের মত তাকে রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর জনারণ্যে ঐ বালক যখন চিরদিনের মত হারিয়ে গেল—তখন লেখকের সাথে সমস্ত পাঠকের চিত্ত একসাথে হাহাকার করে উঠলো—আর সে হাহাকার কি কোন বিশেষ দেশ-কালের গণ্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ? আজও ইন্দ্রনাথের কাহিনী যে কোন পাঠকের চিত্তেহাহাকার জাগায় না?

শ্রীকান্ত উপন্যাসের মূল কাহিনী থেকে অন্নদাদিদির কাহিনীকে যদি ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়, তা হলে কাহিনীর ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়ে না। কিন্তু অন্নদাদিদির মত ক্লাসিক হিন্দুনারী শরৎপূর্ব কিংবা শরৎ-সমকালীন কোন লেখক পাঠক-সমাজকে উপহার দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আপাতঃদৃষ্টিতে রূপকথার মত, কিন্তু রূপকথার কৃত্রিম বিস্ময় ও মনোহারিত্বকে শরৎচন্দ্র সযত্নে পরিহার করেছেন। সাধারণ পাঠকের মনে হ'তে পারে—তুচ্ছ পাতিব্রত্যের উপরে নির্বোধ আকর্ষণের বলি হয়েছে অন্নদা—তার কুসংস্কার কবলিত -মন তার করুণ পরিণতির রূপকার। কিন্তু অন্নদার গৃহত্যাগের পিছনে শুধুই কি ছিল পাতিব্রত্যের তাগিদ? স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা না থাকলে অন্নদা কি দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে শাহজীর সাথে গৃহত্যাগ করতে পারত? অন্নদার ভালবাসাই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়ে তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে। সে দহণ কী তীব্র! অন্নদার ক্ষমা কী সীমাহীন সহিষ্ণুতায় পরিমণ্ডিত! বর্ণনাতীত দুঃখের কণ্টকশয্যায় নিরন্তর শয়ান থেকেও সে কী অবিশ্বাস্য-রূপে নির্বিকার! অন্নদাদিদিকে উপেক্ষাভরে ডিঙিয়ে যাবে। তার জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না, দুই একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করবে না এমন পাঠক কোনো দূরবর্তী ভাবীকালেও জন্মাবে বলে কি আমরা আশা করতে পারি?

ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতার বহিরাবরণের অন্তরালে হতভাগিনী রাজলক্ষ্মীর

হৃদয়কন্দরে কন্দরে যে বিরামহীন হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে তা হয়ত সহসা পাঠকজনের কর্ণগোচর হয় না। কৌলীন্যপ্রথার হাড়িকাঠে এ নারীকে একবার বলি দেওয়া হয়েছে। আপন গর্ভধারিণী অর্থের লোভে এ নারীকে ঠেলে দিয়েছিল ঘৃণার্হ পঙ্কিল জীবনের মধ্যে। তারপর সে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধারের উপায় নিজেই খুঁজে নিয়ে সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটলো তারই সাথে যার জন্য কিশোরীকালের ভালবাসা মনের গহ্বরে দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে গভীর প্রণয়ের রূপ নিয়েছে। যা ছিল অবরুদ্ধ ঝর্ণাধারার মত নেপথ্যচারী—আকস্মিক সাক্ষাৎ তার উৎসমুখ উন্মোচিত করে দিল। ঝর্ণার জলরাশি হৃদয়ের সকল কোণে ছড়িয়ে পড়লো—কিন্তু মিলনের পথ রুদ্ধ। একদা যে শরীর পঙ্কলিপ্ত হয়েছিল সেই অশুদ্ধ শরীর প্রেমাস্পদকে উপহার দিয়ে হৃদয়ের দেবতাকে তো পাঁকের মধ্যে টেনে আনা যায় না। তাই সেই প্রেমাস্পদের সেবার মধ্যে, মানুষের সেবার মধ্যে আত্মাকে নিমগ্ন রেখে আত্মাকে শান্ত করবার সে কী অনলস চেষ্টা। পরিশেষে অশান্ত মনকে টেনে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের ছলনার মধ্যে নিক্ষেপ করা। এই সকল ব্যর্থ চেষ্টার মধ্য দিয়ে মনের শূন্যতা ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে। তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া সেখানে আর কিছু নাই। শরৎচন্দ্র অভয়াকে বিদ্রোহিনী করেছেন। তার বিদ্রোহে হয়তো তাঁর অনুমোদন ছিল। কিন্তু যে গভীর সমবেদনার রঙে রসে রাজলক্ষ্মীর দুঃখকে তিনি ভাষা দিয়েছেন—অভয়ার বিদ্রোহের প্রতি সেই সমবেদনার স্পর্শ নাই। রাজলক্ষ্মীর দুঃখের তপস্যার পাশে অভয়ার বিদ্রোহকে নিতান্তই মামুলী ব্যাপার বলে মনে হয়। রাজলক্ষ্মীকে কি আমরা কোন বিশেষ কালের গণ্ডীর মধ্যে বন্দিনী করে রাখতে পারি ?

'গৃহদাহ' উপন্যাসে সুরেশের আবেগ-প্রবণতা মাঝে মাঝে তাকে পিশাচ করে তোলে। আবেগের বশীভূত হয়ে সে যে-সকল হীন কাজ করে বসল তার ফলে সে তার নিজের জীবন এবং আরও দুইটি নিষ্পাপ জীবনকে দগ্ধ করল। অচলার জীবনে চরম ট্রাজেডি নিয়ে এলো – একদিকে তার অভিমানপ্রবণতা, অন্যদিকে সতীত্বের চেয়ে সতী নামের প্রতি তার মোহের আতিশয্য। কিন্তু উপন্যাসের সুরেশের মৃত্যুর পরে নির্বাপিত চিতাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে একেবারে ফুরিয়ে যাওয়া অচলা, যার সামনে সমস্ত সংসার শূন্য হয়ে গিয়েছে সেই ফুরিয়ে যাওয়া অচলাকে ধিক্কার

জানিয়ে 'তুমি আপন কর্মের ফলভোগ করছে'—এ কথা বলবার সাহস পাঠকের হয় না। সেই ফুরিয়ে-যাওয়া অচলা এবং বিনা দোষে সর্বস্বহারা মহিমের জন্য পাঠকের অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। শরৎচন্দ্র উৎপীড়িত মানুষ ও বিপথগামী মানুষের প্রতি পাঠকচিত্তে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে দিয়েছেন—দুঃখীর প্রতি তাঁর অপরিসীম সমবেদনার রঙে আপন সৃষ্টিকে মণ্ডিত করে। এই সমবেদনার মাধ্যমেই তিনি পাঠকজনের ঘনিষ্টতম একাত্মতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এই গুণ তাঁর রচনার যে যে স্থানে স্বার্থকরূপে প্রকাশমান—তার রচনা সেই সেই স্থলে কালজয়িতা লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্র সমকালীন সমাজকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কতকগুলি শাণিত প্রশ্ন সমাজের মুখের উপরে ছুঁড়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, সমাজ যদি দুর্বলকে টেনে তুলতে না পারে, তবে তাকে নিচে ঠেলে ফেলবার অধিকার তার কোথা থেকে আসে? রাজলক্ষ্মীর বিড়ম্বিত ভাগ্যকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে—এই প্রশ্ন তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলতে চলতে ক্ষণিকের অনবধানতাবশতঃ যদি কেউ পা পিছলে খানায় পড়ে—তবে সমাজের কল্যাণ কি নিহিত থাকে তাকে চিরদিনের জন্য পাঁকের ভিতর ঠেসে রাখার মধ্যে না তাকে হাত ধরে টেনে তুলে গায়ের কাদা মুছে ফেলবার সুযোগ দেওয়ার মধ্যে! নিরুদির কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নকে সোচ্চার করে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। সমাজ যদি কুপথের দরজাগুলি হাট করে রাখে গণিকাবৃত্তির মত পাপকে আপন বক্ষে সযত্নে লালন করে শতসহস্র পাপকে গোপনতার গাত্রাবরণের তলায় নিয়ত পোষণ করে—তা হলে প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি কুপথ আশ্রয় করেছে তার সুপথে ফিরে আসবার সকল দরজা সমাজ বন্ধ করে দেবে কেন? এতে সমাজের কোন্ কল্যাণ সাধিত হয়—এ প্রশ্ন তুলে ধরেছে চন্দ্রমুখীর আখ্যান এবং আলো ও ছায়া গল্পের কাহিনীর মধ্য দিয়ে। নারী যদি যৌবনে বিধবা হয় তবে সেটা তার নিজের অপরাধ নয়। তার অন্তরে যদি ভালবাসার স্পর্শ লাগে সেটাও তার অপরাধ নয়। ওটা যৌবনধর্ম—মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার অধীন নয়। তাহলে সুরেন্দ্র ও মাধবীর মত কিংবা রমেশ ও রমার মত উজ্জ্বল জীবনগুলিকে সমাজ ব্যর্থতার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে কোন্ ন্যায়নীতি অনুসারে? শরৎচন্দ্র এই সকল শাণিত প্রশ্নবাণের মাধ্যমে সামাজিক বিবেককে উদ্বুদ্ধ

করতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের চিন্তাকে পরিবর্তনমুখী করেছেন বহুল পরিমাণে। কিন্তু তাঁর চ্যালেঞ্জ আজও পর্যন্ত এক বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নের আকারে সমাজের চোখের সামনে ঝুলছে। জবাব মেলেনি।

শরৎসাহিত্যের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিগন্ত প্রায়শঃ একালের মানুষের নজর এড়িয়ে গিয়েছে—যথোচিত মর্যাদা সহকারে এই দিগন্তকে স্পষ্ট করে লোকলোচনের সমক্ষে তুলে ধরা হয় নি। শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বের সন্ধানী। সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবল আঘাতে বিচূর্ণিত মনুষ্যত্বের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বিধ্বস্তপ্রায় সামাজিক ইমারতের আঁধার ঘেরা অবহেলিত কোণে ও কোটরে জঞ্জালপুঞ্জের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেলেও আজও বেঁচে আছে। বঞ্চিত দুর্গত, উৎপীড়িত ও অবহেলিত জনশ্রেণীর প্রতি অকৃত্রিম সহমর্মিতা শরৎ-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর সৃজনকর্মের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। চতুর্দ্দিকে মনুষ্যত্বের অপচয় ও অবমাননা তাঁর চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিল। সেই অস্থিরতার তাড়নায় তিনি মনুষ্যত্বের সন্ধানে পচা-গলা সমাজের অন্ধকার কোটরগুলি হাতড়ে বেড়িয়েছেন। পচা পুকুরের পাঁকের মধ্য থেকে স্বর্ণময় দেবপ্রতিমা উদ্ধারের মত তিনি অবক্ষয়পিষ্ট মুমূর্ষু ফিউডাল সমাজের পঙ্কিল গর্তগুলির তলদেশ থেকে সমুজ্জ্বল মনুষ্যত্বের স্বর্ণ-প্রতিমা উদ্ধার করে সর্বজনসমক্ষে স্থাপন করে একালের মানুষদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন,—'দেখো, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় নি। সমাজের নীচুতলায় যে হতভাগ্য জীবগুলি দুঃখকে জীবনসঙ্গী করে জীবনের ভার বয়ে চলেছে—তাদের মাঝে খুঁজলে আজও উজ্জ্বল মনুষ্যত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট ভৃত্য চরিত্রগুলি, যেমন শ্রীকান্ত উপন্যাসের রতন, পথের দাবীর তেওয়ারী, পল্লীসমাজের ভজুয়া, বিপ্রদাস উপন্যাসের অন্নদা, ইত্যাদি) স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধের এক একটি ছবি। বৈকুণ্ঠের উইল উপন্যাসের প্রিয়নাথ, শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও তাঁর গৃহিণী, এবং সুনন্দা ও তার পণ্ডিত স্বামী যদুনাথ তর্কলিঙ্কার। চন্দ্রনাথ উপন্যাসের কৈলাস খুড়ো, পণ্ডিতমশাই উপন্যাসের বৃন্দাবন, এরা প্রায়ই সমাজের উপেক্ষিত, অবহেলিত স্তরের লোক—পার্থিব সম্পদে দীন—কিন্তু অন্তরের সম্পদে মহীয়ান। আরও দেখতে পাই পল্লী-সমাজের বিশ্বেশ্বরী—কুচক্রী স্বার্থান্ধ সন্তানের জননী কুপুত্রের নিয়ত অসদাচরণে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত - অথচ যে সমাজে গুল্ম ছাড়া কিছু

জন্মে না সেই সমাজের আঙ্গিনায় বিশ্বেশ্বরী চারিত্রিক দৃঢ়তায় ও মনুষ্যত্ব-বোধে যেন এক সুবিশাল বটবৃক্ষ—যাদের গায়ে কাদা লেগে আছে—তাদের মধ্যেও যে মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে—সেদিকেও শরৎচন্দ্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দেবদাস উপন্যাসের চন্দ্রমুখী, 'বিরাজ বৌ' এর সুন্দরী, স্বামী উপনাসের মুক্ত এবং সর্বোপরি চরিত্রহীনের সাবিত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে যেন বলেছে, "পাঁকের ভিতর প্রতিমা পড়ে থাকলে প্রতিমার গায়েত পাঁক্ লাগবেই, তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নেওয়াই ত তোমার কাজ। সোনার প্রতিমার গায়ে পাঁক লেগে আছে বলে সোনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে? পাঁকটার দিকে তোমার নজর - সোনাটা কিছুই নয় '

যে মনুষ্যত্ব মৌলিক মানবধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—সে ত পুনঃপুন: পরিবর্তনশীল মানবসমাজের সম্পদ। কোন বিশেষ দেশ ও কালের সীমার মধ্যে কি তাকে বেঁধে রাখা যায়?

মনুষ্যত্বের ভাবুক শরৎচন্দ্রও তাই তাঁর সমকালের কালসীমা অতিক্রম ক'রে চিরকালের রূপ-স্রষ্টা-রূপে বন্দিত হবেন। শরৎ-সাহিত্য যে মনুষ্যত্ব-ভাবনার বীজ ছড়িয়েছে তার ফসল সর্বকালের মানুষের অন্তর্দৃষ্টির খোরাক যোগাবে—সংগ্রামী মানুষের চিত্তে যোগাবে আশা ও বিশ্বাসের বল। সামাজিক রূপান্তর শরৎচন্দ্রকে বিস্মরণের গর্ভে নিক্ষেপ করতে পারবে না।

শরৎচন্দ্র ও আমরা — ডঃ সুশীল রায়

সাহিত্য জিনিসটা প্রকৃতই কী বস্তু—আজ পর্যন্ত তার কোনো সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হল না। এ সংজ্ঞা যে নির্দিষ্ট হলনা, এটা অনেকটা রক্ষে এবং এইটেই সাহিত্যের রহস্য। এ রহস্য আছে বলেই আমরা সকলে সাহিত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। আবার, কেউ-কেউ এই সাহিত্য ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য করেন।

গণিত দিয়ে, ফরমুলা দিয়ে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাবে না। রাসায়নিক বিচার-বিবেচনা দিয়ে আমরা কোনো ইনফারেন্সেও পৌঁছতে পারব না। সাহিত্যের তাৎপর্য বুঝতে হলে বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োগ করা দরকার, এবং তার চেয়েও বড় কথা—একটা সংবেদনশীল মনের মনন প্রয়োজন।

কোন্‌ রচনা সাহিত্য, কিংবা অন্যভাবে বলা যায়—কোন রচনা সাহিত্যপদ-বাচ্য, এ কথা অধ্যাপকেরা অনেক কথা দিয়ে অনেক নজির নিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। ছাত্রেরা তা কণ্ঠস্থ করে হয়তো মনে করেন যে, তারা বুঝে গেছেন ব্যাপারটা। অধ্যাপকেরাও মনে করতে পারেন যে, তাঁদের কর্তব্যের ইতি হয়ে গেল, তাঁরা তাঁদের ছাত্রদের বোধগম্য করে দিতে পেরেছেন সমগ্র বিষয়টা, সুতরাং তাঁরা সফল।

কাজটা এত সহজ হলে কথা ছিল না। এত সহজেই এমন একটা রহস্য ভেদ করতে পারলে এ রহস্যের রহস্যময়তার কোনো কদর থাকত না।

এ কালে সাংবাদিকতার অনেক উন্নতি হয়েছে। ভাষার ও প্রকাশভঙ্গির অনেক আদর হয়েছে। সংবাদভাষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়েছে। অনেক সুখপাঠ্য হয়েছে এইসব ভাষ্য।

এর ফলে বিষয়টা আরও বিপদসংকুল। সংবাদভাষ্যটাই সাহিত্য, অথবা, সাহিত্যটাই সংবাদভাষ্য, তা বেছে নিতে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, সংবাদভাষ্যই জিতে যাচ্ছে। কেননা, এর প্রচারমাধ্যম অনেক জোরালো। জোর-গলায় বললে অনেক সময় অবিশ্বাস্য কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে সাহিত্য এখন একটু বিপদগ্রস্থ।

কিন্তু, এ কথাও ঠিক যে, বিপদ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী জিনিস নয়। ওটা মানুষের বা সমাজের জীবনে মাঝে মাঝে আসে। সুতরাং ও নিয়ে চিন্তান্বিত না হলেও চলে। মানুষের বা সমাজের জীবনে সময়টাই বড় কথা।

সাহিত্য হচ্ছে আমাদের কাছে সেই সম্পদ।

কিন্তু, সাহিত্য নিয়ে অনেক মতভেদ ও মতপার্থক্য আছে। এ জিনিস থাকবেই। সকলেই যদি সব বুঝে ফেলতেন, তা হলে কোনো জিনিস নিয়েই আর দ্বিমত হত না, সুতরাং মতভেদও থাকত না। পৃথিবীটা তাহলে যেন হয়ে যেত সমতল, সবই তাহলে চলত সমতালে, তা হলে কোথাও কোনো বৈচিত্র্যই থাকত না।

এসব কথা উঠল শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে নানাবিধ চিন্তাভাবনার গুঞ্জন শুনে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শরৎচন্দ্রকে অপরাজেয় কথাশিল্পী নামে অভিহিত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ লেখেন "আমাদের জন্যে, আমরা লিখি তোমাদের জন্যে"। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সমীহ ছিল এতটাই গভীর, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেই তাঁকে অপরাজেয় বলায় শরৎচন্দ্রকে কিছুটা বিব্রত করা যে হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের মাত্রাজ্ঞানের কিছু কিঞ্চিৎ অভাবের জন্যেই এ রকমটা আমরা করে থাকি। প্রশংসা করার সময়েও যেমন আমরা বলগাহীন হয়ে পড়ি, নিন্দা করার সময়েও তেমনি আলগা হয়ে যাই। যাঁদের সম্বন্ধে আমরা এসব নিন্দা-স্তুতি করি তাঁদের বিশেষ কিছু আসে-যায় না। এর দ্বারা যা হবার তা হয় আমাদেরই। আমরা প্রমাণ দিই যে, আমাদের বুদ্ধিমান্দ্য হয়েছে।

সুতরাং আমাদের মনে হয় যে, কোনো সাহিত্যিক বা কবি অর্থাৎ কোনো সৃজনশীল প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করার আগে আমাদের একটু সজাগ ও সতর্ক হওয়া দরকার। একটু মাত্রা রেখে মন্তব্য করা দরকার। কিন্তু সাহিত্য এমনি এক বস্তু যা নিয়ে নাকি কথা বলার অধিকার সবার সমান। সঙ্গীত বা চিত্রকলা, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য করার সময়ে অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন ওঠে। এবং সকলেই হঠাৎ কিছু বলে বসেন না। কিন্তু সাহিত্য যেন মাতৃহীন-পিতৃহীন এক অনাথ, এ'কে শাসন করে সকলেই। এই জন্যেই হয়তো শরৎ-সাহিত্য নিয়ে বিচার তেমনটি হয় নি।

যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা করেছেন তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভব খুব দীর্ঘকাল আগের ঘটনা নয়। গদ্য যখন চিঠিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন অন্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না। উপন্যাস তো গদ্যেই লিখিত হয়, অতএব বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রই বঙ্গের প্রথম সার্থক উপন্যাসকার। বঙ্কিমের উপন্যাসের পটভূমি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশ। তাঁর নায়কনায়িকাও ঐ পরিবেশেরই।

ওয়ারেন হেস্টিংস যে দশশালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন তার দ্বারা জমিদারদের প্রভাব অনেক খর্ব হয়, এবং নিয়মিত রাজস্ব দিতে তাঁরা বাধ্য হন। এ'তে জমিদারদের আর্থিক দাপট অনেক কমে যেতে আরম্ভ করে। তার পরিণামে জমিদারদের সুদিন তেমন আর থাকে না। এতে একটু ভাঙ্গন দেখা দিল, ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল ঐ বংশ। এবং তখনই সূত্রপাত ঘটল মধ্যবিত্ত সমাজের। অনেকে তখন সওদাগরী অপিসে চাকুরী করতে আরম্ভ করলেন।

জমিদারী যখন কিছুটা বিলুপ্তির পথে, এবং মধ্যবিত্ত সমাজ যখন গড়ে ওঠেনি, সেই সময়ে বঙ্কিমের আবির্ভাব। সুতরাং বঙ্কিমের উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল ঐ ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-সমাজ।

তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন মধ্যবিত্ত-সমাজ অনেকটা গড়ে উঠেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ-সমাজের তেমন যোগ নেই। শান্তিনিকেতনে তিনি স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এখানে যাঁরা শিক্ষক ও ছাত্র হয়ে এলেন তাঁরা অনেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের। রবীন্দ্রনাথ এঁদের জীবনযাপন প্রণালী যতটা দেখেছেন ততটাই তাঁর অনেক দেখা, কিন্তু অন্তরঙ্গ দেখা নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই জন্যে মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র আমরা তেমন পাইনে।

অবশেষে এলেন শরৎচন্দ্র। ইনি স্বয়ং মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। সে সমাজের মানুষের আচার-আচরণ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন। এ সমাজ তখন একেবারে গঠিত হয়ে গেছে, তার ভালো-মন্দ-মাঝারি, তার কু এবং তার সু—কিছুই তার দেখা বাকি নেই। এ সমাজের মধ্যে বাস করে তিনি এই সমাজকে একেবারে মন্থন করে নিয়েছিলেন বলেই মনে করা যেতে পারে।

নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করে নিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত হলেন সেই সমাজের কথা নিয়ে, সেই সমাজের মানুষ নিয়ে। তাঁর কলমে তিনি যাদের চিত্র আঁকলেন, আমরা তাদের দেখামাত্রই চিনতে পারলাম। চিনতে পারলাম আপনার জন হিসেবে। আমরা যেন আমাদেরকেই পেলাম তাঁর রচনায়। এর ফলে শরৎচন্দ্রও হয়ে গেলেন আমাদের আপনজন। এ ইতিহাস আমাদের ভুললে চলবে না।

তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম ও প্রধানতম কারণ এই।

তাঁর কাছ থেকে আমরা কী পাইনি তার হিসাব লিখতে আমরা ততটা রাজী নই। পাইনি তো অনেক-কিছুই। শরৎচন্দ্রের জীবনে যে বিপুল অভিজ্ঞতার কথা তাঁর জীবনী পাঠ করে জানা যায়, তার দ্বারা অনেক উপকরণ অবশ্যই এসেছিল তাঁর সংগ্রহে, তার থেকে তিনি যদি কিছু বিতরণ করতেন তাহলে অনেক উপকার করা হত বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের।

কিন্তু কি করেননি দিয়ে মূল্যায়ন না ক'রে কী করেছেন দিয়ে তাঁর মূল্য নির্ণীত হোক।

তিনি সমবেদনার মন্ত্রে নিজেকে সঞ্জীবিত করে আমাদের সমাজের নরনারীর কথা বলেছেন, তাদের কামনার বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই সমাজের যে চিত্র এঁকে রেখে গেলেন তারও মূল্য আছে। এ-সমাজ চিরকাল এমন থাকবে না, এরও পরিবর্তন হবে, কিন্তু একটা জীবন্ত ইতিহাস তো রয়ে গেল। সমাজের বিবর্তন তো আছেই, কিন্তু ধীরে ধীরে এর যে রূপান্তর হয় তার কিছু নিদর্শন অবশ্যই থাকা চাই। মাঝের কোনো সূত্র হারিয়ে গেলে তার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রকে আমরা এদিক থেকেই একজন স্মরণীয় পুরুষ বলে মনে করতে পারি।

অনেকে প্রভাবের প্রশ্ন তোলেন। অনেকে বলেন তার কোনো প্রভাব একালের লোকদের উপর নেই। প্রভাব নেই বলে তর্ক করাটাই কিন্তু প্রভাবের কিছুটা স্বীকার করে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকে তৎকালীন তরুণ কবিরা, বিশেষ করে একজন কবি, রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন, এবং লিখেছিলেন—

হে রবীন্দ্র, কাব্য তব অবসিত হোক —
তোমার অশুভ দৃষ্ট ক্লীব আবির্ভাব

ভারতেরে করেছে মলিন,

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রচুর মলিন

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অবসান প্রার্থনা করেছিলেন কবি। কেননা, সেই 'ক্লীব আবির্ভাব' কবিকে পুরুষত্বহীন করে ফেলেছিল। এই ব্যাপারটা কি প্রভাবকে একেবারে মজ্জায় মজ্জায় স্বীকার করে নেওয়া নয় ?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখনো আছেন, অথচ সেই কবি আজ কোথায় ?

প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক, পূর্বসূরিদের প্রভাব উত্তরসূরির মধ্যে কিছু না কিছু বর্তায়ই। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আছে, ক্রমবিবর্তনও আছে এর। মাঝপথে হঠাৎ আরম্ভ হয় না নদীর ধারা, হঠাৎই গজিয়ে ওঠে না কোনো বৃক্ষ—তারও বীজ দরকার।

এই সবই যদি দরকার। প্রকৃতির দরবারে একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম স্বীকার করে নিতে হলে শরৎচন্দ্রকেও কায়মনোবাক্যে স্বীকার করব, শ্রদ্ধা করব, এবং তাঁর কাছ থেকেও আমরা কিছু পেয়েছি বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখব।

আমরা যদি আমাদের অগ্রজদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম না দেখাই তাহলে আমাদেরই লোকসান। অগ্রজদের আমরা যদি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করি তাহলে আমাদের এই আচরণ দেখে আমাদের অনুজরা আমাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করবে। এটা কি আমাদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ ঠেকবে ? যদি তা না ঠেকে, তাহলে আমরা ঠকতে রাজি হব কেন ? একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পিছনে-পিছনে অনেকেই গোকুলে বাড়ছে।

অশ্রদ্ধা জানাবার ও অস্বীকার করার প্রবণতা আজকাল অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বলেই এত কথা বলা। এইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কাউকে ছোট করলে নিজে বড় হওয়া যায় না। অন্যকে ছোট বলে প্রমাণ করার ইচ্ছে থাকলে নিজেকে মাপসই বড় করে নিতে পারলেই ল্যাঠা চুকে গেল। কিন্তু—

বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার
সংসারে যে বড় হয়, বড় গুণ তার।

নিজের গুণের চর্চা ও অপরের গুণের তারিফ যুগপৎ করে যাওয়ার মধ্যে অসীম আনন্দ আছে। এই আনন্দ থেকে আমাদের নিজেদের বঞ্চিত করতে সম্মত যেন না হই। কেননা, এটা নাকি মানবচরিত্রের একটা বড় গুণ।

আমরা এখন শরৎচন্দ্রের রচনা তেমন পড়িনা। কিন্তু একটা সময় ছিল,

যখন তাঁর লেখা আমরা রাত্রি জেগে পড়ে শেষ করেছি। যখন স্কুলে পড়ি তখন অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে পড়েছিলাম শ্রীকান্ত। শরৎচন্দ্রের রচনা পাঠ করা সেই আরম্ভ। 'এ বিশ্বের দাবাখেলায় কৈলাশচন্দ্র মন্ত্রী হারাইয়াছেন'—তাঁর চন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে এই লাইনে এসে পেঁছেই বই বন্ধ করে উঠে চলে গিয়েছিলাম, করুণরস এত গাঢ় হয়ে উঠেছিল সেখানে, যে আর সহ্য করা গেল না। কিন্তু সেইটেই তো মধুরতম যা নাকি সবচেয়ে বেদনার্ত বার্তা বহন করে। সুতরাং ঝোঁকটা কাটিয়ে নিয়ে আবার এসে পড়ে শেষ করে ফেলতে হয়েছিল বইটা।

কিন্তু এখন আর তেমন পড়িনে। শরৎচন্দ্র, ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, আমার কাছ থেকে অনেকটা সরে গিয়েছেন। আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছেন বলেই তিনি দেশের কাছ থেকে তো সরে যাননি। তাঁর বইয়ের প্রচুর চাহিদা দেখেই তো জানা যাচ্ছে, তার পাঠক এখনো অজস্র।

কিন্তু যেহেতু আমার আর আকর্ষণ নেই সেইহেতু তাঁর প্রতি সকলের সব আকর্ষণ উবে গিয়েছে, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

একদা তাঁকে অপরাজেয় কথাশিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তখন তাঁকে সে আখ্যা দেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন? তাঁর গ্রন্থের বিপুল চাহিদা দেখে এখন আমরা বলতে বাধ্য - তিনি অপরাজেয়।

মানুষের রুচি সমান নয়। কারো কাছে পাঁপড় উপাদেয় বস্তু, কারো কাছে বা পেঁপে। দুটোই খাদ্য। কিন্তু যেহেতু এর একটির উপর হয়তো আমার আকর্ষণ তেমন মজবুত নয়, সুতরাং সেটাকে অখাদ্য বা অপাংক্তেয় বলে ঘোষণা করার অধিকার আমার নেই। তাকে নস্যাৎ করার অধিকার তো নেইই।

কিন্তু সাহিত্য-সংসারে বর্তমানে এই রকম একটা রেওয়াজ উঠেছে। এই রেওয়াজটা কিন্তু উঠে যাওয়া দরকার।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের কথা একটু বলি। তিনি আমাদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। দেশ স্বাধীন করার যে ব্রত কংগ্রেস নিয়েছিল তার সঙ্গে নিজেকে তিনি একাত্ম করে নেন। গান্ধীজি তখন অহিংস মন্ত্রে দেশের মানুষকে দীক্ষিত করে চলেছেন। গান্ধীজি তখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কাছে ও দেশবাসীর কাছে মুকুটহীন

সম্রাট। শরৎচন্দ্র গান্ধীজির প্রভাবে প্রভাবান্বিত এই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েও গান্ধীজির অহিংস-নীতির সমর্থক হতে পারেন নি। তিনি গান্ধীজির বিরোধিতা করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর আকর্ষণ ছিল অন্যত্র। তিনি সমর্থক ছিলেন বাঘা যতীনের, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের, মানবেন্দ্র রায়ের। তাঁর বিশ্বাস ছিল, হিংসার আশ্রয় না নিলে এদেশ থেকে প্রবল-প্রতাপান্বিত ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

তাঁর মনের এই বাসনা ও ভাবনা রূপ পেয়েছে তাঁর 'পথের দাবি' বইতে। তিনি এখানে যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সেই বিশেষ চরিত্র সব্যসাচি। এই চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্র অল্পবিস্তর নিজেই উপস্থিত এ রকম অনুমান অনেকেই করে থাকেন, এবং সে অনুমান সম্ভবত সম্পূর্ণ অসংগত নয়।

দেশাত্মবোধের ব্যাপার নিয়ে শরৎচন্দ্রের এই বইই অবশ্য আমাদের দেশে প্রথম নয়। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু তাঁর এ বইয়ের মেজাজ একটু আলাদা। এ'তে তীব্রতা একটু বেশি।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেই এই বই। ইংরেজ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেন।

মানুষের সবলতা দুর্বলতা মানুষের চরিত্রের ভূষণ, এবং এ তার বৈশিষ্ট্যও। যে শরৎচন্দ্র তাঁর মনের দৃঢ়তা প্রকাশ ক'রে গান্ধীজির আদর্শের অনুগামী হলেন না, যে শরৎচন্দ্র সেই দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অনেকটা জেহাদ ঘোষণা করে। তাঁর এই উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিযে তিনি তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবেরও পরিচয় দিতে পারলেন, তিনিই সহসা কেমন করে যেন প্রকাশ করে ফেললেন তাঁর মনের দুর্বলতা।

'পথের দাবি' বইটি তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন। এ'তে বিচলিত হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র। তিনি দরবার করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন এর প্রতিবিধানের জন্যে তাঁর প্রভাব খাটান।

রবীন্দ্রনাথ জানালেন যে, 'বইটি উত্তেজক।' শরৎচন্দ্র ইংরেজ সরকারকে পছন্দ না করলে, লেখক হিসেবে তাঁর এ অধিকার অবশ্যই আছে যে, তিনি তা জানাবেনই। কিন্তু কোনো বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে সে কথা জানানো এক, কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তা জানানো অন্য। কাহিনীর আকারে তা জানালে তার তীক্ষ্নতা অনেক বেড়ে যায়।

এবং রবীন্দ্রনাথ আরও জানালেন, এ ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকার তো খুব কঠোর কাজ কিছু করেনি। তারা বইটাই বাজেয়াপ্ত করেছে, লেখককে তারা কোনো রকম শাস্তি দেয়ও নি, দিতে চায়ও নি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকার এত নরম পথ নেয় না, এমন কি আমাদের দেশের ক্ষুদে ক্ষুদে জমিদারদের পীড়ননীতি দেখলেও বোঝা যায় যে তারাও অনুরূপ ক্ষেত্রে আরও ভীষণ মূর্তিগ্রহণ অবশ্যই করত।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে পারেননি, তাঁর প্রভাব খাটাবার কথাই আর ওঠে না।

এ'তে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের বিশিষ্টতার মধ্যেই তাঁর মনের দুর্বল দিকটি উদ্ঘাটিত হল বটে; কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা বাড়তি একটা লাভেও লাভবান হলাম। আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারলাম—রবীন্দ্রনাথ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ অবশ্যই, কিন্তু তাঁর সমসাময়িকও, উভয়ে একই সঙ্গে পাশাপাশি লেখনী চালনা করে চলেছেন, সেই সমসাময়িকের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা কতটা, ভরসা কতখানি। এবং রবীন্দ্রনাথও অকপটে তাঁর মনের কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না। অথচ, উভয়ের মধ্যে এর জন্যে কোনো বিতণ্ডার সৃষ্টি হল না।

সাহিত্য-সংসারের হাওয়া তো এমনই হওয়া দরকার। আমরা এঁদের জীবন থেকে এই সার সংগ্রহ করে নিতে পারলে লাভবানই হব।
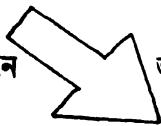
শরৎচন্দ্রের কবিচিত্তে দুই সত্ত্বা ছিলো বটে, পাশাপাশি, দ্বন্দ্ব ক'রে নয় ; কোন বিহঙ্গের দুই গ্রীবার মতো বললে কাছাকাছি বলা হয়, কিন্তু ভুল বুঝবার সম্ভাবনাও থাকে, কেন না কেউই নিরাসক্ত নয় ; ঠিক তুলনা দেয়া হবে যদি অনুমান করি একজন বাইরের দিকে নজর রাখছে, অন্যে ঘরের ভিতরে খুঁজছে ; দু'ইতো অন্তরবাসী, কিন্তু তাদের একটি যেন বা অন্তরতর।

এবং এই দুইএ দুই পৃথক জাতের উপন্যাস লিখে চলেছিলো একই চিত্তে অবস্থান করা সত্ত্বেও ; সুতরাং অনুমান করতে চাই শরৎ উপন্যাসকে দু ভাগ ক'রে নিয়ে পড়তে সুরু করা ভালো। প্রশ্ন হতে পারে, সব মিলে তো একটি সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব তাকে কি দু টুকরো করা যায়। একই ব্যক্তি নিপুণ সংসারী আর ভালো সেতার বাজিয়ে হতে পারে ; তার কাছে আমরা সংসারধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ চাইতে পারি, সেতার বাজানোর অনুরোধ করতেও পারি।

বুদ্ধি-বিবেচনা, সামাজিক-রাজনৈতিক ভালো-মন্দর হিসাব, বইএ পড়া তত্ত্ব, এসবই আমাদের প্রভাবিত করে, কারণ আমরা স্বার্থের খাতিরেই সামাজিক জীব। এসব আমাদের প্রভাবিত করে, আমরা উত্তেজিত হই, চিৎকার করি, নিজের মত ঘোষণা করি, আবেগে মথিত হই, প্রাণ দিয়ে ফেলি। যার সাহিত্যের নিপুণতা আছে অর্থাৎ সেই ক্ষমতা থাকে ফ্রয়েডও রহস্যময় ব'লে ছেড়ে দিয়েছে, সে তার মতামতকে কুশীলবের কথাবার্তা, চালচলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে উত্তেজনা থেকে নিষ্কৃতি পায়, মনের প্রশান্তি ফিরে পায়। উত্তেজনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আরামের, কেননা তাতে কর্মশক্তির ক্ষয় বন্ধ হ'য়ে থাকে।

কিন্তু উপন্যাসের অনুপ্রেরণা অন্য রকমেরও হ'তে পারে। সে অনুপ্রেরণা কবিচিত্তে লুকিয়ে থাকা এক গভীর বেদনাবোধ হ'তে পারে ; যে

বেদনা, (যেমন লরেন্সের জীবনে তার পিতামাতার দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা) নিতান্ত ব্যক্তিজীবনের, সামাজিক জীবনের নয়, হয়তো বা যেমন এসেক্‌সের মৃত্যু দণ্ড এবং সাদাম্‌টনের কারাবাস, অথবা ট্র্যাজিক পিয়ারিয়ডের যে অন্তর্গূঢ় বেদনাকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা গেলো না, অথচ যা পুরনো হ্যামলেটকে নতুন ক'রে লিখতে বাধ্য করে, যে বেদনা মাতৃহারা জীবনের অবক্ষয় ও হতাশায় তৈরী ব্রন্টি ভগ্নিদের নিউরোসিস প্রায় আর্ততা। দেখা যাচ্ছে যে গভীরে প্রবিষ্ট বেদনা সাধারণ মানুষকে নিউরোটিক করতে পারে, আমাদের সৌভাগ্য, তা কয়েকজন মানুষকে সাহিত্যিক করে। এরকম ধারণা হ'তে থাকে উপন্যাসের এরকমের প্রেরণা যেন গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন অন্তরের অন্তরতম কোথাও রয়েছে এমন এক উৎস থেকে উৎসারিত।

যদি বলা হয় সব উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যই পরিবর্তে তৃপ্তি লাভ, কিংবা যদি তা অর্থবহ স্বপ্ন দেখাই হয়, তা হলেও অনুপ্রেরণার এই মৌল পার্থক্য থেকে যাবে। অর্থের অভাবের দরুণ সমাজে প্রতিষ্ঠা না পেলে মানুষের মন পীড়িত হ'তে পারে, সমাজের প্রচলিত রীতিকে অন্যায় মনে হ'তে পারে, অথচ সব সময়েই সমাজকে বদলে দেওয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সমাজ সংস্কারকারী কিংবা সমাজে বিপ্লবকারী সাহিত্য সৃষ্টি পরিবর্তে তৃপ্তি লাভ অথবা অর্থবহ স্বপ্ন দেখা। এমন নয় শুধু যে এতে সমাজকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেয়া হ'লো, বরং সেই ধিকৃত সমাজে ক্রমশ অর্থ যশ, সুন্দরী-স্ত্রী যা অন্যভাবে পাওয়া সম্ভব ছিলো না তা সব হাতের কাছে এসে যেতে পারে। এ রকম কি মনে হয় না যে হঠাৎ লটারিতে টাকা পেলে এ অনুপ্রেরণা শুকিয়ে যেতে পারে? কিন্তু অন্য রকমের অভাব বোধ আছে; যেমন মৃত্যুর অনুভূতি যা প্রাণের সব আয়োজনকে অভাবে পরিণত করে, যেমন পিতার বিবেকে অনাস্থা, যেমন অপ্রাপনীয়া এক রমণীরত্ন। অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, সমাজ ব্যবস্থার রদবদল কিছুই এই অভাববোধগুলোকে দূর করে না। এগুলিকে পূর্বের অভাববোধের তুলনায় কি বেশী আন্তরিক বলা যায়? এ বেদনা-বোধগুলোকে কি অন্তরতর, আদিমতর কারো বেদনা বলা হবে?

অনুমান করি অনুপ্রেরণার এই মৌল পার্থক্য উপন্যাসগুলোকে জাতে পৃথক ক'রে থাকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি শরৎবাবু দুজাতের উপন্যাস

লিখেছেন। কতগুলিতে সমাজ, তার ন্যায় অন্যায়, তার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যগুলিতে নারী এবং তার প্রেম। এই দুইজাতের মধ্যে কোনগুলি ভালো তা বলা নিরর্থক। কেন না এমন অনেকে আছেন যাদের কাছে শরৎবাবুর পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, অভাগীর স্বর্গ শরৎবাবুর সার্থক সৃষ্টি। এই তো সেদিন বর্ত্তমান কালের একজন নাম করা সাহিত্যিক হলফ করে বললেন, অভাগীর স্বর্গ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গল্পের একটি। আমরা জানি এসব উপন্যাস গল্প শরৎবাবুর জন্য বিদ্রোহী, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারকারী এমন অনেক উৎকৃষ্ট প্রশংসা সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে এমন অনেকে আছেন যাদের কাছে শ্রীকান্ত সবচাইতে ভালো উপন্যাস শরৎবাবুর। শ্রীকান্তে এখানে ওখানে সমাজ সম্বন্ধে শরৎ-বাবুর দু একটি মত শোনা যায় বটে, কিন্তু মূলত তা প্রেমের উপন্যাস। সুতরাং এখন এখানে কোন উপন্যাসগুলি ভালো তা না ব'লে শুধু তাদের জাতিগত ভেদটাকে দেখিয়ে দেয়াই ভালো।

এইভাবে ভাগ ক'রে নেয়ার পরে এখন আমি যা কিছু বলতে চাইছি তা সেই উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে—যেগুলিতে প্রেমই যেন শরৎবাবুকে আকর্ষণ করেছে। এখানে কি একবার বলে নেয়া হবে প্রেম সম্বন্ধে এমন কথা এত কথা শরৎবাবুর আগে কেউ বলেন নি? আমরা বৈষ্ণব কাব্যে অনেক প্রেমের কথা পেয়েছি, কিন্তু সে কি নর-নারীর প্রেম? এখন আমরা অনেক উপন্যাসে, অনেক গল্পে অনেক রকমের প্রেমের কথা বলি, কিন্তু শরৎবাবুর আগে এত বেশী করে, এত স্পষ্ট ক'রে আর কবে এমন ক'রে প্রেমের কথা বলা হ'লো? কিন্তু শুধু প্রেমই নয়, একটা হতাশাও যেন, যেন প্রেমের সেই পাত্রী অপ্রাপনীয়াই থেকে যায়। প্রেম যতো উজ্জ্বল তার পাশে পাশে অমিলনের বেদনাও তেমন গভীর। আমার মনে হয়েছে তাঁর এই উপন্যাসগুলো অনুপ্রেরণা পেয়েছে এক গভীর বেদনাবোধ থেকে।

সেই বেদনা তাঁর মানসের কোন অংশের যন্ত্রণা, সে আলোচনা মনস্তত্ত্বের বিষয় হ'তে পারে যা আমাদের বিষয় নয়। এটা কিন্তু গোড়াতেই ব'লে দেয়া দরকার, তাঁর শিল্পের অনুপ্রেরণা, এই তীব্র আর্তিকে বুঝতে না পেরে তাঁর শিল্পের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর মানসের অপেক্ষাকৃত উপরিতল, যেখানে বুদ্ধি-বিবেচনা, প্রতিপত্তির অভাব বোধ, সামাজিক অযোগ্যতা ইত্যাদি একত্র বাস করে, তা উত্তেজনায় প্রেরিত হয়ে যে উপন্যাসগলিকে সৃষ্টি

করেছিলো, আমরা লক্ষ্য করেছি সেগুলি তাঁকে সমাজসচেতন বিদ্রোহী ইত্যাদি অভিধা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে; তেমনি অংশত তাঁর কোন কোনটি বিশেষ করে এই প্রেমে উপন্যাসগুলি তার জন্য নারী দরদী এই বিশেষণ সংগ্রহ করেছে। এসব শুনতে শুনতে মনে হয় এ উপন্যাসগুলিতে শরৎবাবু প্রেমের কাহিনী বলতে বসেছেন, তার চাইতে গভীর যদি কিছু থাকে তবে নারীর জন্য দরদ। যেন বা যারা ভ্রষ্টা তাদের তুলে ধরার জন্যই শরৎবাবু কলম ধরেছিলেন।

তাঁর সম্বন্ধে এই নারীদরদী জাতীয় বিশেষণ যে কত হাস্যকর (যে কোন ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে তা হাস্যকর হ'তো, কেন না ঔপন্যাসিকের দরদ একপেশে হ'লে উপন্যাসই হয় না) তা বোঝাতে শুধু এটুকু বললেই চলে নারী বলতে শুধু তাদেরই বোঝায় না যারা সমাজের চোখে ভ্রষ্টা, এবং এটাও সত্য নয় যে নারী বললে আমাদের জায়া জননী দুহিতাকে বোঝায় না। তাদের প্রত্যেকের জীবনেই, যেমন নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জীবনে, প্রচণ্ড রকমের ব্যর্থতা, অপূর্ণতা ক্লান্তি থাকা সম্ভব যদিও যারা ভ্রষ্টা হন নি, অথচ তাদের সেই বেদনার কথা শরৎবাবু কোথায় বললেন? সব চরিত্রই উপন্যাসিক দরদ দিয়ে সৃষ্টি করে। কোন চরিত্রের উপরে দরদ না থাকলে তা চরিত্রই হয় না। কিন্তু নারীর প্রতি দরদ দেখানোর জন্য শরৎবাবু রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, অচলাদের এঁকেছেন এ ভাবা তখনই সম্ভব যখন আমরা আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারি না। নারী মুক্তি কি, কাকে নারীর উন্নতি বলা হবে এসব কথা যদি প্রবন্ধে ব'লেও থাকেন তার সঙ্গে উপন্যাসের সংযোগ কোথায়? কোন উপন্যাসের প্রবলেম বা আর্গুমেণ্টেই তো নারীর মুক্তি বা উন্নতিকে দেখিনি। দরদ মাঝে মাঝে দেখিয়ে ফেলেছেন বটে; আমাদের মতো কেউ হলে তা প্রশংসা পেতে পারতো, কিন্তু তাঁর পক্ষে সে তো ত্রুটি। অন্নদাদিদিকে কিংবা অভয়াকে অথবা মৃণালকে অতটা দরদ না দেওয়াই উচিত ছিলো উপন্যাসের খাতিরে। অন্নদা উপন্যাসে প্রক্ষিপ্ত, অভয়া অবান্তর, মৃণাল সেণ্টিমেন্টাল সৃষ্টি হ'য়ে সার্থক "ফাইল" হ'তে পারলে না।

তবে কি শরৎবাবু এত বিচার-মূঢ় ছিলেন যে বুঝতেন না উপন্যাস লিখে নারীর জীবনে মুক্তি এনে দেওয়া যায় না, ভ্রষ্টাকে সমাজের সম্মান পাইয়ে দেওয়া সম্ভব নয়? শরৎবাবু কি জানতেন না, বিদ্যাসাগর সমাজে ঢেউ তোলার শক্তিপ্রয়োগ করেও যেখানে বিধবাদের জীবনকে দুঃখ মুক্ত করতে

পারেন নি সেখানে উপন্যাস লিখে রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলাদের জীবনকে আবার আনন্দময় ক'রে তোলা পাগলামি? না, আমি অন্তত শরৎবাবুকে বিচার-মূঢ় মনে করি না। এ রকমের মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো এ আরোপ ক'রে এই প্রেমের উপন্যাসগুলো যারা পড়েন তাদের সম্বন্ধে চালাক শব্দটা প্রয়োগ করা যায়; ভূতের প্রতি বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য সেকশপীয়র হ্যামলেট লিখেছেন বললে আমরা সবাই হাসি, কিন্তু শ্রীকান্তে, 'গৃহদাহ', চরিত্রহীনে যখন নারীদরদ খুঁজি তখন হাসি না কেন সেটাই সমস্যা!

এখন এই প্রশ্ন উঠবে, কি তা হ'লে শরৎবাবুর উদ্দেশ্য ছিলো? কতগুলো বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করা? আর তা করতে গিয়ে কতগুলো গল্প তৈরী করা? তা হলে, যদি এটাও আরোপ করি তা হলেও তো শরৎবাবুকে ঠকে যেতে দেখবো। চরিত্রগুলো বিচিত্র থাকছে কোথায়?—একে অন্যের থেকে ধার ক'রে চলেছে। চন্দ্রমুখী ও রাজলক্ষ্মী, অচলা, সবিতা, সাবিত্রী নানা দিক দিয়েই তো তারা একে অন্যের কাছে ঋণী। এমন কি দেবদাসের পরিণত রূপ যেন জীবানন্দ, ঔদাসীন্যের সমান প্রতীক যেন সুরেন্দ্র এবং শ্রীকান্ত। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিলো তা এই যে, শরৎবাবুর অনুপ্রেরণা এক অপ্রাপনীয়া রমণীরত্নের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলো। এখানে অবশ্যই মানুষ শরৎবাবুর কথা বলা হচ্ছে না। নানা পরিস্থিতিতে যেন তাকে দেখতে পেয়েছে শরৎবাবুর সেই অন্তরতর পুরুষ। দেখতে পেয়েছে কিন্তু গৃহীতা হয় নি; তা হয় না, কারণ চিরদিনই সে অপ্রাপনীয়া। না, সে উর্বশী নয়, যদিও তার মতোই অপ্রাপনীয়া। উর্বশী নয় বরং মানবী; কাব্য নয়, এটা উপন্যাস। কিন্তু তাকে না পেয়ে জীবন ব্যর্থ হয়েছে তা বলা হয় না, কিন্তু তার অভাববোধটা মনের অতলে গিয়ে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা হয়।

এখানে এমন কথা উঠবে কি এই সামান্য ব্যাপারে এত উপন্যাস? একটা তুলনা নেয়া যাক। বিয়াত্রিচে সাইমোন বার্দি'র স্ত্রী ছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু দান্তে ও লেগিযেরির কাব্যের উদ্দিষ্টা নারী ছিলন।

নানা উপন্যাসে নানা ভঙ্গি তার, যেন একই রত্নের নানা মুখক। আর সেই রত্নের সন্ধানযাত্রায় যেন অন্তরতর পুরুষটিকে ধীরে ধীরে বদলে দিযেছে। এরকম অবস্থায় যা হ'যে থাকে। উপন্যাস থেকে উপন্যাসে গিয়ে সেই মুখকগুলি যেন নতুন আলোয় উজ্জ্বল, যদিও সেই একই রত্নের তা বোঝা যায়, আর পাশাপাশি দর্শক সেই অন্তরতর পুরুষেরও চারিত্রিক উত্তরণ ঘটে

যাচ্ছে। একেই কি চূড়ান্ত লাভ বলবো? কেননা এই উত্তরণের একটা লক্ষণ এই যে, বেদনা বিদ্বেষ ক্ষোভ থেকে মুক্তি লাভ করছে সেই অন্তরতর পুরুষ।

উদাহরণ হিসাবে আমরা প্রথমেই দেবদাস উপন্যাসকে হাতে নিতে পারি। আমরা জানি এই উপন্যাসকে কাঁচা বলা হয়েছে। এটা কাঁচা নয় এমন প্রমাণ করার চেষ্টা আমাদের নেই। বোধহয় স্মরণ রাখা ভালো পরিপক্কের দৃষ্টিতে তরুণ প্রেমের টাটকা ভাবটা কাঁচাই মনে হয়। এই উপন্যাসকে প্রথমে হাতে নেয়ার এটাও কারণ নয় যে এটাই অন্যগুলোর আগে লেখা হয়েছে। এই উপন্যাসকে বাছাই করার এটাই একমাত্র যুক্তি যে এখানে সেই অন্তরতর পুরুষকে তার আদিমতম অবস্থায় আবিষ্কার করা সম্ভব। মনস্তাত্ত্বিকেরা তাঁকে ইদের প্রকাশ বলবেন—যখন পর্যন্ত লিবিদোইগো পরস্পর সংবন্ধ—সুপারইগো দূরস্থিত?

সে যাই হ'ক, এই পুরুষ তার প্রেমপাত্রীর অবস্থান জেনেছে, স্বরূপ বুঝতে পারছে না; বাস্তবে তার অবস্থান কোথায়, কি বাধা তার প্রেমপাত্রী হতে তাও যেন অস্পষ্ট নয়। প্রেমপাত্রীর পথের বাধাগুলিকে নৈতিক কিংবা মানসিক ব'লে বোধ হচ্ছে না। যেন সে অনুভব করছে সেই রমণীরত্ন তো কিশোরীর মতো অপাপবিদ্ধা, তার মনে তার নিজের ছাড়া আর কারো ছায়া পর্যন্ত পড়ে নি। কিন্তু বাধা যে আছে তাও মিথ্যা নয়। সে ভাবতে চেষ্টা করে বাধাগুলি সামাজিক স্নবারি, টাকা পয়সা কমবেশী থাকার মতো স্থূল বিষয়, হৃদয়ের বা নৈতিক বাধার তুলনায় যাকে সহজলঙ্ঘন করা যাবে ব'লে মনে হয়; কিন্তু একসময়ে সে বুঝতে পারে বাধাগুলোকে। যুক্তির দিক দিয়ে যত সহজ-লঙ্ঘনীয় মনে হয়েছিলো, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সে বাধা পিতা (চিরকালের প্রতিপক্ষ?) এবং তার সামাজিক বুদ্ধি হয়ে সামনে দাঁড়ায়। যেন প্রতিপক্ষ তাকে বঞ্চিত করে ব'লেই আদিম ঈর্ষ্যায় সে তার রমণীরত্নকে কলঙ্কলাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে তো রমণীরত্নই যার গায়ে কলঙ্ক লাগেনা, কলঙ্ক লাগলেও যে রমণীরত্নই থাকে। সুতরাং আত্মহননের পথই খোলা থাকে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলতে পারেন এই আত্মহননের ইচ্ছার মূলে মহতের বিগ্রহের সম্মুখে বলির পবিত্রতা লাভের আদিম কৌম থেকে আনা কোন সংবাদ আছে কিনা; হয় তো বা তা আড়ালে গিয়ে জননীর স্নেহকে ব্যাকুল করার অভিজ্ঞতাপ্রসূতও হ'তে পারে; এই আত্মহননের একটি সার্থকতা কিন্তু অপ্রাপণীয়া প্রেম-

পাত্রীকে ক্লেশেজ'রিত ক'রে নিজস্ব করার চেষ্টা। আবার, সেই মনস্তাত্ত্বিকরাই একে স্যাডিজমের পরিবর্ত বলবেন কিনা এরকম প্রশ্ন তোলা যায় বটে ; কিন্তু এটা লক্ষণীয়, যে এখানে দেবদাস যেন বলবে, আমি তোমাকে পেলেম না, কিন্তু দেখো অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে, মৃত্যুস্থির অবস্থায় তোমার রইলুম ; কিন্তু তোমারও শান্তি থাকা উচিত নয়, হাহাকার করো, মৃত্যুর অধিক ব্যথা পাও।

এখানে চন্দ্রমুখীকে নিয়ে এক সমস্যা আছে। পারুর চাইতে এটি বিচিত্রতর চরিত্র। যাঁরা মনে করেন 'নারী দরদী হওয়াই উপন্যাসিক শরৎ চন্দ্রের সার্থকতা তাঁরা এখানেই প্রথম দরদ দেখানোর উপযুক্ত সৎ অসৎ-স্ত্রীলোককে (কল্যাণময়ী ভ্রষ্টা) দেখতে পেয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা শিল্প-কৌশলকে প্রথম আলোচ্য বিষয় মনে করেন তাঁরা এখানে সেই ব্যালাস্ট স্থাপনের সুকৌশল খুঁজে পাবেন যে ব্যালাস্টের অভাবে প্রেম গরম ভাপে ভরা ফানুস হ'য়ে যেতে পারতো। এরকম অনুমান করি চন্দ্রমুখী সেই রমণী-রত্নেরই আর এক ধ্যানমূর্ত্তি যাকে সামনে রেখে অনুপ্রেরিত সেই অন্তরতর বলতে পারে, তুমি স্বামীবিচ্যুতা হ'লেও স্বাধীনা হ'লেও, এমন কি ভ্রষ্টা সুতরাং সহজলভ্যা হ'লেও, আমি আমার এই দুরন্ত পাওয়ার তাগাদাকে কত পবিত্র রাখতে পারি, ভালোবেসে কাছে পেতে চাই বটে, বাধা অতিক্রম করা এখানে সহজ হ'লেও, সামাজিক নীতির কোন বাধাই নেই, ভালোবাসার ফল ভোগ করতে চাইনা।

যেন ইদ্ থেকে সপার-ইগো তার রুচি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে মনে করছে—এমন এক ব্যাখ্যা হয় নাকি ? কিন্তু এখানেও একটা শাস্তি থেকে যাচ্ছে সেই রমণীরত্নের জন্য, একই মৃত্যুতে পার্বতীর সঙ্গে হাহাকার করবে—এক হয়ে যাবে, কিন্তু তার চাইতে আরও কঠিন, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া, তুমি টাকা নাও, তোমার রুচি নেই।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই রমণীরত্ন তো চন্দ্রমুখীর মতো ভ্রষ্টা নয়, কেননা সে তো বরং শুচিতার স্বরূপ, শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী, তার আবরণ শুভ্র বেদনা, সে বরং মাধবী হ'তে পারে। বাড়ির কেউ না হয়েও সকলের সুখ সুবিধার সুবন্দোবস্ত করার দরুণ সে প্রায় গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছে, সে বরং বাইরের ঘরের দরজা পর্যন্ত আসতে পারে। তার মৃদুগলা হয়তো শোনা যায়, অদূরে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়, ভাইবোনদের কথায় তার চরিত্র

মাধুর্যের ইশারা থাকে, কিন্তু তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায় কি? আর তার ধ্যানে যেন অন্তরতর পুরুষের উত্তরণ শুরু হয়। সে প্রেমপাত্রীকে কলঙ্কে লাঞ্ছিত করতে চায়না, সে যদি অধরা থাকে তবে তাই থাক, অন্তরতর পুরুষ যেন কামনাকে জয় করতে চায় না, কামনাকে ঔদাসীন্যে ভুলে যেতে চায়, নিজেকে তাই সে কবিপ্রাণ, এক উদাসীন মানুষ কল্পনা করে। কিন্তু এক সময়ে বাঁধ ভেঙে যায়। আবার সেই, জটিল প্রবৃত্তিটা তার ঘাড়ে চেপে বসে, আত্মহননের, যাকে পাওয়া গেলো না সেই রমণীরত্নকে ক্লেশে জর্জরিত করা জট-পাকানো এক নিষ্ঠুরতা।

দেবদাসের এই সুরেন্দ্রে পরিণত হওয়ার বিষয়টা, অনুমান করি, লক্ষ্য করা দরকার। সুরেন্দ্রই সেই প্রথম উদাসীন প্রায় দার্শনিক, পুরুষ যাকে আমরা পরে একের অধিকবার দেখতে পাবো। এ বিষয়ে আমার এক কৌতূহল আছে। গুজব শুনেছি, শরৎচন্দ্রের পিতা কখনও কখনও সাহিত্য চেষ্টা করতেন, জীবনযুদ্ধে জয়ী ছিলেন না, কিছুটা যেন উদাসীনও ছিলেন প্রকৃতিতে। সুপারইগোতে পিতৃ-বিবেকের ছায়া কি এমন অনুকরণ ঘটাতে পারে?

এখানে এই বলে নেওয়া প্রয়োজনবোধ করছি, এই যে রমণীরত্ন সন্ধানে যাত্রা তা কিন্তু আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু পথে হ'লেও দিক না বদলে একই পথে চলা এমন নয়। পাহাড়ের পথে সেটা তীর্থ-যাত্রীর অগ্রগতির মতো নয় কিছু। বরং প্রদক্ষিণ করা, নানা গিরিসঙ্কট, গিরিকন্দর যা বিভিন্ন কোণে স্থাপিত, বারবার তার সাহায্যে যেন এক নন্দাদেবীকে করায়ত্ব করার, অন্তত স্পর্শ করার জন্য ঘুরে ঘুরে চলা। সেখানে পৌঁছে একেবারে কাছে চাইলে নতুন দেশে এলেম মনে হয়, কিন্তু চোখ তুললেই সেই পুরাতন যার অভিনবত্ব কিছুতেই শেষ হয় না। এই প্রদক্ষিণ করায় সেই রমণীরত্নের কোন রূপটা আগে ধরা পড়েছে, কোনটিই বা পরে সময়ের দিক দিয়ে, এসব প্রশ্নও মূল্যবান হয় না; কেননা আগে যেরূপ ধরা পড়েছিল পরের বারে দেখার মধ্যেও সেই রূপকে ইঙ্গিতে ফুটতে দেখেছি; উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দেবদাসে দেখার মধ্যে আর বড়দিদিতে দেখার মধ্যে যে পার্থক্য, যাকে আমরা স্বরূপে দর্শনের দিকে এগিয়ে যাওয়া মনে করেছি, পরের বারে সে পার্থক্য কমে যেতে দেখতে পাচ্ছি। যেন দেবদাসের দৃষ্টি কোণও আবার ফিরছে মনে হয়, উপরন্তু প্রত্যেকবারেই সে মুখককে যেন স্পষ্ট দেখতেও পাওয়া যায় না। এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে, কেননা কোন একটি বিষয়কে বুঝতে

আমরা যখন তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি তখন বর্তমানে কোন একবারের অতীতের দেখার অভিজ্ঞতাকে মনে ফিরিয়ে আনতে পারি।

প্রদক্ষিণে পুরাতনে প্রত্যাবর্তনের উদাহরণ হিসাবে 'দেনা পাওনা' উপন্যাসটাকে আমরা নিতে পারি। মনে হয় নাকি, দেবদাসের যৌবনে মৃত্যু ঘটে না-গেলে সে যেরকম উচ্ছৃঙ্খল জমিদার হ'তে পারতো, যে প্রায় সিনিক, এমন কি নিজের সম্বন্ধেও ; যার জীবন একটা দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুর প্রসেস ; জীবানন্দ কি ঠিক তেমন একজন নয় ? সে যেন নিজেকে খানিকটা শুধরে নিয়েছে যেন অভিজ্ঞতার ফলেই আত্মহননের সাহায্যে নায়িকাকে শাস্তি না দিয়ে, সেই আত্মহননের ইচ্ছা নিয়ে জুয়া খেলে যার পার্টনার হবে নায়িকা ; যে তীব্র বিষ ওষুধও বটে তা অনায়াসে তুলে দেয় নায়িকার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যৌবনে যে আদর্শগুলি ছিলো তা আর নেই, এখন সে জোর ক'রে প্রেমপাত্রীকে দখল করতে চেষ্টা করার মতো লজ্জাহীন হ'য়ে উঠেছে। এখানে এসে বড়দির সেই শুদ্ধাচারিণী শুভ্রবাসা মূর্তির এক রূপান্তরকেই দেখতে পাই ; কেননা ভৈরবীও শুদ্ধাচারিণী নিশ্চয়ই, সেও স্বামী বিচ্যুতা বটে, প্রেমপাত্রকে পাওয়ার ইচ্ছা তার হৃদয়ে মৃত নয়, শুধু তাকে বড়দির তুলনায় নিঃসঙ্গতর করা হয়েছে, যেন বা বড়দি যা পারেনি তেমন করে সমাজের সঙ্গে সংঘাতে নামার শক্তিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ; যাতে যেন মিলনের অন্তরায়গুলো দূর হবে। হয়তো অলকা আত্ম-প্রকাশ করলোও বটে অন্তরায়গুলোকে দূর করে, প্রভাবিত করে ; কিন্তু সেই অনুপ্রেরিত অন্তরতরের কাছে সঙ্গে সঙ্গে এটাকে অসার্থক নিরীক্ষণ মনে হ'ল। জীবানন্দের মৃত্যু (ষোড়শী নাটক এবং দেনাপাওনা মিলিয়ে পড়া যাক) পুরনো সেই আত্মহননই বটে কিন্তু যেন আলগা কিছু হয়ে গেলো, অনুপ্রেরণা ফুরিয়ে গিয়েছে বোধ হ'তে থাকলো। এটাই খুব জোর দিয়ে বলা দরকার কারণ যে সুরেন্দ্র হয়েছে আত্মহননের আগ্রহে ঐক্য থাকলেও সে আর দেবদাসের স্তরে ফিরতে পারে না। প্রদক্ষিণ চলেছে, আবিষ্কার হয়নি, কিন্তু সবই তো বৃথা হতো, সব এসথেটিক—প্রচেষ্টা, সব অর্বহ স্বপ্ন দেখা, সেই অনুপ্রেরিত পুরুষ যদি আরও নিরাসক্ত হয়ে দেখার অভিজ্ঞতা না পেয়ে থাকে। ভালো লাগে নি। অনুপ্রেরণা যেন ফুরিয়ে গেছে, ওয়র্ক অব আর্ট ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সে জন্যই বাইরের বিষয় নিয়ে এসে' (অস্ফুট সমাজ চিন্তা ?) উপন্যাস'কে শেষ করতে হ'লো।

চরিত্রহীন উপন্যাসকে আলোচনার এই পর্যায়ে গুরুত্ব দেয়ার দরকার বোধ করছি। তার কারণ অবশ্যই এই নয় যে, এক সময়ে যেমন মনে করা হ'তো, বিপ্লবকারী সামাজিক চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব এতে আছে। হায়, কত সহজেই বিপ্লবকারিরা নিহত হন এবং হায়, কেউই উপন্যাসটিকে শিল্পের মান দিয়ে যাচাই করলো কি ?

এই উপন্যাসটিকে বরং সমাজ সংস্কারকারী উপন্যাস গোষ্ঠীতে রাখা উচিত বরং বলা উচিত এই উপন্যাসে বুদ্ধি বিবেচনায় যে উত্তাপ লেগেছে তাই যেন অনুপ্রেরণা। এবং আমাদের এই আলোচনায় সেজন্য এর স্থান কোথায় ? কিন্তু এই উপন্যাসে একটা ঝোঁক আছে যা লক্ষ্য ক'রে নেয়া উচিত হবে। এখানে সাবিত্রীকে কতটুকু চন্দ্রমুখীর প্রত্যাবর্ত্তন বলা হবে ? দুই-ইতো ভালো অসৎ-স্ত্রীলোক। কিরণময়ীকে কতটুকু সাবিত্রীর অ্যান্টি-থেসিস ভাবা হবে যেহেতু সে অসৎ ভালো স্ত্রীলোক ? এসব আলোচনাকে মূল্যহীন মনে হয় ; কেননা এখানে সেই অনুপ্রেরিত অন্তরতর নিজেকে কোথাও প্রতিফলিত করেনি। কেউ যদি উপেন্দ্রকে তার প্রতিফলন মনে করেন উপেন্দ্রকে কত কোণঠাসা করেছেন উপন্যাসিক তা বিবেচনা করতে হবে ; বরং যেন ইগো সুপারইগোর দাবিকে অন্তরের সঙ্গে আপোস করতে চেষ্টা করছে দেখা যায় বরং অন্যো-কেউ যদি অনুরূপ কিছু দেখে থাকে এ'যেন তার মূল্যায়ণ, যেন শৈবলিনী এবং/অথবা রোহিনীকে আধুনিক প্রস্থানে এনে তাদের দেখা। এখানে একটা বিষয় খুবই লক্ষণীয়, খুব তর্ক বিতর্ক তোলা হয়েছে, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নির্ণয় না করলেই যেন চলে না। এই দুটি বিষয় ; অনুপ্রেরিত অন্তরতর যে প্রতিফলিত নয় এবং বিতর্ক তুলে কিছু একটাকে বোঝার চেষ্টা এদুটিকেই প্রবন্ধের এই পর্যায়ে উপন্যাসটিকে উল্লেখ করার হেতু বলতে চাইছি। এটিতে সন্ধান যাত্রা নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু এরকম অনুমান করতে চাইছি এ যেন সন্ধানের এক বিরতিতে কিছু একটার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা. কিন্তু স্বরূপকে আত্মস্থ করা নয়। আমরা দেখতে পাবো সন্ধান যাত্রায়, থেমে দাঁড়িয়ে সেই রমণী-রত্নের স্বরূপকে কখনও বোঝার চেষ্টা করা, কখনও বা উপলব্ধি করার চেষ্টা চলেছে। বোঝা আর উপলব্ধি করার চেষ্টা চলেছে। বোঝা আর উপলব্ধি করাতো সাধারণ হিসাবে একই ব্যাপার, বলতে চাইছি ক্রিয়াদুটির কর্তা পৃথকব লে ক্রিয়াতেও পার্থক্য। একটি সজ্ঞান মানসের ক্রিয়া, অন্যটি যেন বা প্রাক্—জ্ঞান মানসের।

বলা বাহুল্য, সন্ধানে সব চাইতে দীর্ঘ স্থায়ী যাত্রা শ্রীকান্তে। তা যেন দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে এমন এক পরিকল্পনা নিয়ে বেরিয়ে পড়া ; যেন যাবজ্জীবনের পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনায় পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে, যে পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে নতুন পথ থেকে পুরনো কোন কোন পথের খণ্ডাংশ চোখে প'ড়ে যায় ; যে পরিকল্পনা অনুসরণ করার সময়ে হঠাৎ একদিন বেপরোয়া যাত্রী পরিকল্পনার বাইরে নতুন এক পথ ধরার চেষ্টা করে, ফলে সে গন্তব্যের এমন কিছু কাছে যায়না, কিন্তু সেই পরম রমণীয়ার মহোত্তম ঈক্ষণ (গ্র্যান্ডেস্ট ভিউ) যা যেন আর কখনই পাবেনা তা পাওয়া হয়ে যায় ; ক্লান্তিহীন পরিক্রমণ চলতেই থাকে, এবার তার অনুসন্ধানে আর একটি বিষয় যোগ হয়েছে ; পথের উপরে দাঁড়িয়ে প'ড়ে ; প্রদক্ষিণকে স্থগিত রেখেও সেই মহোত্তম ঈক্ষণকে আবার দেখার চেষ্টা।

পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা অনুসারে যাত্রার কথা বলছিলুম। শ্রীকান্তে প্রচ্ছন্নভাবে পার্বতী-পারুকে দেখতে পেলেম। এক কিশোরীর বৈঁচির মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়ার কথা শ্রীকান্তর মনে ছিলো না, কিন্তু মনে করিয়ে দিলে সেই বাল্যপ্রেমের স্বপ্নই ফিরে আসে, শ্রীকান্ত অস্বীকার করতে পারে না। কুশারীদের গ্রামে চুল কেটে ফেলে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর সম্মুখে দাঁড়ালে যেন মাধবীই ফিরে এলো ; তেমনি শুদ্ধাচারিণী হওয়ার চেষ্টা, তেমনি দূর থেকে প্রেমাস্পদকে সস্নেহ সেবায় তৃপ্ত করে নিজেকে পূর্ণ করার ইচ্ছা, এমন কি মাধবীর মার্যাদাবোধ যেন বঙ্কুর চেহারা নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। চন্দ্রমুখীকেই আমরা দেখতে পাইনা ? এমন চিন্তা করলে কি হবে রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখীর উন্নীত রূপ ? তাদের পার্থক্য কি সুন্দরী কি বারবণিতা এবং গুণান্বিতা বারবধূর পার্থক্য নয় ? কিন্তু রাজলক্ষ্মী চন্দ্রমুখীর উন্নীত রূপ ? তাদের পার্থক্য কি সুন্দরী বারবণিতা এবং গুণান্বিতা বারবধূর পার্থক্য নয় ? কিন্তু রাজলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীও বটে। এটা খুব সাধারণ কথা যে দর্শকের মনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্যও বদলে যায়। শ্রীকান্ত ছন্নছাড়া হ'তে পারে, পথিককে তা হতেই হয়, কিন্তু সে আর দেবদাস —জীবানন্দ নয়, (অংশত তা'দের মতো বেপরোয়া হলেও) সে বরং সুরেন্দ্র, কিন্তু আমি ধনী এবং গুণবান এই অহমিকাকেও বাদ দিয়ে ; পথে চলতে চলতে এই সব ধন ও গুণকে জঞ্জাল বলে বোধ হয় এক সময়ে। শ্রীকান্ত এমন উদাসীন পৃথিবীর সব বিষয়ে, যে তাকে নাচওয়ালীর ভেরুয়া বলতে

শোনা গিয়েছে। কিন্তু তার এই ঔদাসীন্য তো বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে তার ল্যাবরটরিতে দেখা যায়, একজন সাহিত্যিকের বেলায় সে কলম হাতে ক'রে বসলেই। একে কি তন্ময়তা বলা হবে? এমন মনে করা কি উচিত হবে নিজেকে ধন ও গুণে যুক্ত কল্পনা করে অর্থবহ স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন, যা আদিতে রমণীরত্ন সন্ধানের স্বপ্নে জড়িয়ে যাচ্ছিলো, এখন তা থেকে মুক্ত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সুপারইগো? যার ফলে রমণীরত্নের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে? একি সুপারইগোর তেমন এক প্রস্থানে পেঁছানো যেখানে তার সামাজিক অভাবের বন্দী দশা ঘুচেছে? ফলে কি উপন্যাস সার্থকতা লাভের পথে, যেহেতু এসথেট এখানে মুক্তি পেতে শুরু করেছে? কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে। আত্মহনন এবং প্রেমপাত্রীকে ক্লিষ্ট করার সেই জটিল প্রবৃত্তি যেন অ্যাটাভিজমের মতো ফিরে আসে। শ্রীকান্ত সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়, বসন্তে কাতর হয়, বর্মায় পালায়। সব ত্যাগ করেই এ দিয়ে অন্যান্য নায়করূপের সঙ্গে নিজের ভাবগত ঐক্য প্রমাণ করে। শেষ ফলে কি হলো? একটা এসথেটিক আনন্দ নয় কি? ধনহীন, গুণহীণ, যে বলতে পারে দুঃখিত না হ'য়ে আমি যা তাই, এমন এক শ্রীকান্তর কাছে রাজলক্ষ্মী জননী, জায়া হওয়ার কামনা গোপন রাখতে পারেনা, যে ইচ্ছা প্রকাশে ইচ্ছাটা যেন বড় কথা নয়, গ্রহণযোগ্য হয়েছে, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু কমললতাও উপস্থিত তার সেই গান নিয়ে যা সুন্দর ও মিস্টিক, যা প্রেমের অভিশাপকে উত্তীর্ণ হয়েও মধুর, গহর উপস্থিত তার কাব্য ও প্রেম নিয়ে, যে কাব্য হয় তো অপ্রকাশযোগ্য কিন্তু নিশ্চিতরূপে সুন্দরের সাধনা, যে প্রেম প্রেমাস্পদাকে অপ্রাপনীয়া জেনেও শান্তি, শুভার্থী যে প্রেম তাকে কবি করে। এগুলি কি সিম্বলিক নির্দেশ এই রমণীরত্নের অনুসন্ধান কোথায় গিয়ে শেষ হতে পারে সেই দিগন্তের? একটা ইঙ্গিত যে অনুসন্ধানের শেষ ফল শুধু এসথেটিক আনন্দ?

কিন্তু বলছিলুম মহোত্তম ঈক্ষণ, প্রদক্ষিণ করতে করতে যে পথে চলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা আছে মনে হয় না, অন্তত যে পথ পরিকল্পনার বাইরের বলে মনে হয়, শুধু যেন দেখলে কি হয় চেষ্টা করে এমন এক ভঙ্গিতে এগিয়ে তেমন এক পথে যেন এক নন্দাদেবীর নগ্নশুভ্র রাজকান্তি চোখে পড়ে গেলো। জীবন সার্থক হ'লো। কিন্তু এতো অতিসাধারণ কথা যে, সেই মহিমাময়ীর একান্ত সান্নিধ্য মৃত্যুও। তার সম্বন্ধে

দয়া কঠোরতার কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা বৃথা। এ বিষয়টাকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। সেই রমণীরত্নের সন্ধানের উদ্দেশ্য যেমন তাকে কাছে পাওয়া তেমন তাকে চিনতে পারাও বটে। কাছে পাওয়ার চেষ্টার সঙ্গে চিনতে পাবার চেষ্টা তো অনিবার্যভাবেই জড়িত। রুদ্ধ নিশ্বাস অসমান পথে প্রদক্ষিণ করতে করতে যাত্রী যেন বলছে, গুন্ঠন মোচন করো, তোমার মুখকে দেখতে দাও। আমরা লক্ষ্য করেছি কখনও তর্ক তুলে কখনও প্রচলিত মূর্তির সঙ্গে তাকে তুলনা করতে হয়েছে, কিন্তু গুণ্ঠন মোচন হয় নি। সে গুণ্ঠন যখন হঠাৎ উন্মোচিত হয়, তখন সেই মহিমাময়ীর নগ্নতার সামনে তন্ময় হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না, অহমিকা লুকিয়ে থাকে, যেন আত্মসমাহিতই নয়, তার বিসর্জন হযে গিয়েছে। তর্ক ওঠে না, কারণ কে কবে নিবিড় নিশিথিনী কিংবা শীতল শুভ্র নন্দাদেবীকে লজ্জাশীলা অথবা লজ্জাহীনা বলতে পারে? সুপারইগো ক্ষোভমুক্ত মনে হতে থাকে। সে এখন দর্শক, দেখার আনন্দে নিমগ্ন। একই ক্রান্তি বিন্দু অসীম হয়ে যেন সেই রমণীরত্নের নির্ভুল পরিচয় আর অনুপ্রেরিত সেই অন্তরতরর এসথেটিক স্থিতিকে ধারণ করে থাকে।

শরৎবাবুর গৃহদাহ উপন্যাস এমন এক সাফল্য যে, যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা যাক তাকে অসার্থক মনে হতে পারে না। কেউ যদি বলেন এটা শিল্পী পুরুষের সেই প্রস্থান যখন ভিজন্ চোখে পড়ে, মিথ সৃষ্টি হয়, কিংবা কেউ যদি বলেন যে এ যেন এক স্বপ্ন যখন যার কামনা পূরণের তাগিদ, স্বপ্নায়িত কামনা—চিন্তনকে সেন্সর করে যে, যথেষ্ট সেন্সর করা সত্ত্বেও স্বপ্ন যার উদ্বেগের কারণ হ'য়ে থাকে—সকলেই যেন একমত, যে এমতো সত্ত্বেও ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। কেউ যদি বলেন এটা প্রেম বৃত্তির বিবর্তনের মতোই, আত্মস্বার্থে যার জন্ম তার আত্মবোধের অবলুপ্তি, তুলনাগুলি অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। আমরা বলতে পারি এক অনুপ্রেরিত এসথেট্ তার চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পেঁছে গেলো। প্রেম বৃত্তির উপমাটা নিয়েও বলা যেতে পারে অবদমিত কামনার পরিতৃপ্তির স্বার্থে যার জন্ম সেই স্বপ্ন দেখার ব্যবসায়, ব্যবসায় হিসেবেই ভালো লেগে গেলো; যার স্বার্থ, যার অবদমিত কামনা সেই যেন অনুপস্থিত।

এখানে দেবদাস, সুরেন্দ্র, শ্রীকান্তদের কেউই উপস্থিত নেই, সেই অপ্রাপনীয়া একাই আছে। যদি কেউ বলেন মহিম সুরেশ একই ব্যক্তির

দ্বিধারা তা হ'লে বরং কি এটাও প্রমাণ হয় না অপ্রাপনীয়ার সামনে সেই নিজেকে খুঁজে পেতে চাইছে না। সেই অপ্রাপনীয়া ভালো অসৎ-স্ত্রীলোক নয় চন্দ্রমুখীরা যেমন; কিংবা তার বিপরীতও নয় কিরণময়ীদের মতো। তার সম্বন্ধে সতীত্ব, ভ্রষ্টতার প্রশ্ন তোলা যেমন নিরর্থক তেমনি অর্থহীন তাকে সমাজে পুনরায় স্থাপন করার চেষ্টা। এমন কি সে দ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্বও নয় যে তার মধ্যে স্নেহময়ী মাতৃত্ব আর বিলাসমুখী দয়িতা দ্বন্দ্ব করবে। সে যা তাই সে। মানুষ জাতির জননী ইভ্ কি ঈশ্বরের খুব নিকটে থেকেও তার নির্দেশ লঙ্ঘন করেনি? তাই বলে সে কি আমাদের সব চাইতে আপন নয়? ইভ্ কেন ইডেন-বিচ্যুত হয় তার কারণ খুঁজতে গেলে মনে হয় নাকি?—হায়, ভগবানও, এমনকি ভালোবেসেও যেন, তার ভাগ্য থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি।

চরিত্রের ফাটলটা কত সহজেই না প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। গাড়ি বদলানোর সময়ে সে তো মুহ্যমান অবস্থায় ছিলো না। গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়ানো তার মতো শিক্ষিতা সহরের মেয়ের পক্ষে একটা সহজ বুদ্ধির ব্যাপার হ'তো না? কি বলা হবে, ঠিক সময়ে সহজ একটা কাজ করতে ভুলে যাওয়া? এ যেন পূর্ব নির্দ্দিষ্ট যে-অচলারা নিষিদ্ধ ফলে হাত বাড়াবে তাদের চরিত্রের এই ফাটল অলঙ্ঘনীয় পূর্ব নির্দেশের প্রতিরূপ হ'তে পারে, অন্য নামে ভাগ্য হতে পারে। ট্রাজিডি শব্দটা যে কখনই নাটক ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করা উচিত নয় তা জেনেও এই সিচুয়েশনটাকে ট্রাজিক না বললে ঠিক বলা হবে না।

এসথেটের চূড়ান্ত সিদ্ধি যে বলা হ'লো তাই বা কি রকম। এখানে আমাদের আগ্রহ দিতে পারে অন্যান্য সিদ্ধির সঙ্গে গৃহদাহকে মিলিয়ে নেয়ার। ফ্লোবেয়র বা লরেন্সের উপন্যাসগুলো এখানে উল্লেখ করে লাভ নেই, যদিও সংস্কৃতির পার্থক্যের কথা, যা যেন ব্যর্থতাবোধ আনবে, এমন করেই গৃহদাহে বলা হচ্ছিলো। বরং আনা কারেনিনা যার সঙ্গে তুলনা দেয়ার কথা অন্য অনেকের, অনেকবার মনে পড়ে থাকবে। আনা কারেনিনার সংগঠন কৌশল গৃহদাহের তুলনায় ভালো কি মন্দ বা সেই উপন্যাসটি অধিক-তর কৌশলী শিল্পীর দক্ষতার প্রমাণ করে কিনা, বা সেই ঔপন্যাসিকের শিল্প ঐতিহ্য শরৎ বাবুর চাইতে দক্ষতা লাভে সহায়ক ছিলো কিনা, এগুলি নয়। আমাদের উদ্দেশ্য উপন্যাস দুটিকে পরিসমাপ্তিতে তুলনা করা, স্থাপত্যের

শেষ ফল কি তা বোঝা। আনা কারেনিনার রেলের চাকাগুলি তাদের ইস্পাতকালো, দমবন্ধ করা, সংকীর্ণ হ'য়ে আসা, তীক্ষ্ণ তীব্র বেদনায় নিশ্চিতই আমাদের অন্তকরণকে আহত ক'রে দিয়ে যায়, কিন্তু তাতে ট্রাজিকের আস্বাদ থাকে না। বরং এমন মনে হয় না কি যে এক ক্রিশ্চিয়ান কবি এক পেগান কাহিনী বলতে ব'সে নিজের এসথেটিক সত্ত্বাকে মুক্তি দিতে কুণ্ঠিত হলেন কিংবা, অন্যকথায়, এই অর্থবহ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে সেন্সর করার ভারটা একজন সন্ন্যাসীকে দিলেন যার কাছে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটাই যেন ননসেন্স। এবং সে সন্ন্যাসী বললে ডেথ্ ইজ্ দা ওয়েজ্ অব্ সিন্।

[যদি কেউ বলেন ওই রেলগাড়ি প্রকৃতপক্ষে ব্রনস্কিই বটে চাকার ঘূর্ণ্যমান গতি তারই আলিঙ্গন যার কাছে আনা আত্মসমর্পণ করে, তবে বলতে হবে সে ব্যাখ্যাও এক বৈজ্ঞানিকের সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে রোগ দূর করার চেষ্টা করে, স্বপ্ন যে অলীক জগৎ সৃষ্টি করেছে তাকে ধ্বংস করাই তার উদ্দেশ্য।]

গৃহদাহেও মর‍্যালিষ্ট কথাবার্তা আছে। ফয়েল হিসাবে মৃণালের চলাফেরা আছে। বরং মৃণালকে অত বেশী মর‍্যালিষ্ট করাই যেন শরৎ-বাবুর ত্রুটি, যেন সে অন্য স্তরের থেকে তুলে আনা কেউ, যেজন্য ফয়েল হিসাবে সার্থক হয়ে ওঠে না সব সময়ে। কিন্তু অন্যদিক থেকে তার এই অন্য পৃথিবীর হওয়া সুবিধার হয়েছিল। কাহিনীটি শেষ হয়েছে কি ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন হবে তার হিসাবের মধ্যে দিয়ে এমন মরুভূমি কি আর রচনা হয়েছিল? কোথায় ছিলাম? তা কি নরক? কোথায় ছিলাম? তাকি ঊষর হয়ে যাচ্ছে এমন এক ইডেন উদ্যান? কোথায় এলাম? এই এক পৃথিবীতে খবরের কাগজ পড়লেই যাকে চেনা হয়ে যায় যার নীরসতা জানা হ'য়ে যায়। টাকা পয়সা, তার চাইতে বড় কোন বিষয়ের অনুভূতি যেখানে থাকে না। এক অধ্যাপক বলেছিলেন এটা শরৎবাবুর বাস্তববোধের পরিচয়। ঠিক তাই। এমন দক্ষ পরিচয় না থাকলে এত সহজ আমাদের এই নীরসতায় এনে ফেলতে পারে কেউ? একে ক্যাথারসীস বা সেই জাতীয় কোন পদ দিয়ে ভাবা উচিত হবে না। এটা এক অদ্ভুত কনট্র্যাস্ট যা যেন শুধু ভিজনেই চোখে পড়ে, বুদ্ধির সাহায্যে লজিক্যালি আনা যায় না, যেখানে উপন্যাসটার ভিতর থেকে বাকি অংশটার সঙ্গে এমন কনট্র্যাস্ট যে বিরল, নীরস ঊষরতায় সমস্ত ক্যাকটাসল্যাণ্ড কে ছাড়িয়ে যায়; কোন সন্ধ্যাই এর

চাইতে গভীর সিঁপিয়ার হয় না। কোথাও এত ক্লান্তি নেই, কিছুই আর এত বন্ধ্যা নয়। এখানে শরৎবাবুর মর‍্যালিটির কথা ভাবতে সময় পাননা নয়, কোন কথাই যেন আসেনা, দৃশ্যটা ছাড়া আর কিছুই নয়; স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে এ যেন সেই অবস্থা যখন একজন বলে কথা দিয়ে বোঝাতে পারবো না স্বপ্ন, সাহিত্যের ব্যাপারে এ এক ভিজন যা দেখলুম তাই, ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়; সামঞ্জস্য কিছুই বলতে পারছি না।

কিন্তু সেই নন্দাদেবীর মতো কাউকে হঠাৎ তেমন ক'রে দেখে ফেলা একজনের জীবনে একবারই ঘটে। তেমন নগ্নশুচিতা বারবার চোখে পড়ে না, নয় শুধু, কখন যে তা চোখে পড়েছে তাও যেন বোঝা যায় না। ফলে লোহার শিকল কখন সোনা হয়ে গেছে তা না বুঝেই যেন অনুসন্ধানটা চলতেই থাকে। কিন্তু সোনা হয়েছে তেমন, এ জেনেও তো খোঁজা শেষ করা যায় না। কারণ সেই পাথরটাকে তো দ্বিতীয়বার পেতে ইচ্ছা করে। অন্য কথায় সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে যায়। মন যে হঠাৎ এক ছবি তুলে রেখেছিল পথে চলতে চলতে কখনও কখনও সেই ছবিকে দেখার চেষ্টা যেন। স্মৃতি নিশ্চয়ই কখনও সেই তাৎক্ষণিকতা নয় যখন আবেগ যে অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নয় তাকেই ভোগ করতে থাকে। স্মৃতিতে বরং সেই তাৎক্ষণিকতাকে বুদ্ধি বিবেচনার জালযুক্ত গবাক্ষ দিয়ে দেখা হয়ে থাকে। সেই জালের রেখায় রেখায় অভিজ্ঞতাকে টুকরো টুকরো ক'রে দেখার কাজ ভালো হয় হয়তো, অনেক বিতর্ক করা যায়, সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টাও চলে, কিন্তু তা আর জীবন্ত ক্রিয়াশীল তাৎক্ষণিকতা নয়। উপরন্তু আবেগ থেকে সরতে সরতে ক্রমশঃ বুদ্ধির কাছে চলে যেতে হয়। যেন সকালে উঠে ভাবতে বসা রাত্রির স্বপ্নটা আমার দিনের জীবনে কি কাজে লাগবে?

শেষপ্রশ্নে আশুবদ্যি যেন বা উদাসীন, আত্মসমাহিত, যেন বা সুরেন্দ্র শ্রীকান্তদের আরও পরিণত রূপ, যার ইজিচেয়ারের সামনেই যেন সমস্ত নাটকটা ঘটে চলেছে। এমনকি সেই অসুখ, বিসুখ, আগুন লাগাটাগার ব্যাপারেও আশুবদ্যি এক নিস্তরঙ্গ অক্ষুব্ধতা; কিন্তু অনেক তর্কেও কমল কি আর অচলার পরিপূর্ণতা পায়? একটু তন্ময় হ'লেই দেখা যায় কোন কোন পূর্ব পরিচিত চরিত্র নতুন পোশাকে কমলের চারিদিকে আসছে। কমল নিজের বৈধব্য, ব্যক্তিগত রুচির শুচিতায়, যেন যেখানে সে বাঁধ ভাঙতে চায় তা ছাড়া অন্য বিষয়ে মাধবীর মতো, যেন অচলা যা করেছে তার জীবনে

সে সব বিষয়কেই কমল যুক্তি তর্ক দিযে আমাদের এবং নিজের বুদ্ধি বিবেচনার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চায়, আমাদের এথিক্যাল মনোভঙ্গির সঙ্গে তার ওকালতি ; কিন্তু অচলা—স্বরূপা একবার যেমন স্বপ্রকাশ হয়েছিলো তা আর হয় না। উপলব্ধিতে যা ধরা পড়ে তাকে তর্ক দিয়ে ধরা যায় না। বরং যেন তর্কের গরমে ঘুম ভেঙে যায়। অন্যদিকে তুলনা দিলে বলতে হবে একটি কবিতার ইমেজকে যেমন স্টেটমেন্টে অনুবাদ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তর্ক বিতর্কও তেমন একটা ভিজনকে অনূদিত করতে পারে না।

শেষ প্রশ্ন যদি অচলা-স্বরূপা রমণীরত্নের বিবেকীকরণের চেষ্টা হ'যে থাকে, শেষের পরিচয় তবে সে প্রচেষ্টার স্মৃতিকে (সিদ্ধান্তগুলিকে বলা হবে কি ?) নতুন অভিজ্ঞতার সারিতে ফেলে অনুভব করার চেষ্টা। ইমেজটা, বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান গবেষণা থেকে নেয়া। এটা ভালোই হয়েছে শেষের পরিচয় লেখা সুরু হয়েছিলো এবং শেষ করা হয় নি। যেটুকু লেখা হয়েছে তাতে সবিতা—অচলাকে বুঝতে সাহায্য করে। এমনকি এটুকু লেখা না হ'লে রমণীরত্ন অনুসন্ধানের এই প্যাটার্নটি এতটা স্পষ্ট হ'যে উঠতো না। কিন্তু এমন আশংকার কারণ ছিলো শেষটুকু লেখা হ'লে হয়তো তা আবার এক উত্তেজিত সমাজ-পরিক্রমার রিপোর্টাজ হ'তো ; অন্তত একটা ভিজন্ হ'তো না। স্বপ্নে দেখা ছবি হতো না যা ঘুমের মতো প্রশান্তিকে পেতে সাহায্য করে।

এখানে একটা কথা তাড়াতাড়ি বলে নেয়া দরকার। আমরা একের অধিকবার অচলাস্বরূপা রমণীরত্নের কথা বললুম। তা থেকে কিন্তু এ অর্থ করতে চাইছি না, অচলাই তার স্বরূপ। আদৌ তা নয়। বিশেষ এক সময়ে তাকে অচলার মতো দেখায় কিন্তু তার উপলব্ধি করতে পারলে সন্ধানই তো ফুরিয়ে যায়। শরৎচন্দ্র যতদূর দেখেছিলেন তার মধ্যে মহত্তম ঈক্ষণ অচলা। এই মহমত্ত ঈক্ষণ গ্র্যাডেন্ট কিন্তু নোবলেস্ট নয়। সাহিত্যে গ্র্যান্ডেস্ট হলেই নোবলেস্ট হতে হবে তা নয়। আর দেখাও কি শেষ হয়েছিলো ?

আমি অবহিত আছি যে এখানে নানা প্রশ্ন উঠবে। এমন প্রশ্ন উঠবে আমি জেগে ওঠার চাইতে ঘুমকে, স্টেটমেন্টের চাইতে ইমেজকে, বিতর্কের তুলনায় ভিজনকে পছন্দ করছি কেন। স্বপ্নের ব্যাপারে ঘুমকে মূল্য দেওয়াই স্বাভাবিক্ কেন না ঘুমকে নিরুদ্বিগ্ন করার জন্যই তো স্বপ্ন।

যা কিছু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় সেই বাদ প্রতিবাদ, সেই ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব, যা স্বপ্নকে গড়ে তোলার চাইতে প্রবল, তাকে কুস্বপ্ন বলি। দুঃস্বপ্নও ঘুমকে গাঢ় করে, কিন্তু কুস্বপ্ন সে রকম স্বপ্ন যা অনেক সময়েই ঘুমকে চটিয়ে দেয়। আমরা লক্ষ্য ক'রে থাকবো প্রকৃত স্বপ্নগুলো যেন বরং আঁকা, কথায় বলা কিছু নয়। সেখানে কাথোপকথনও জাগ্রত অবস্থায় যেমন হয় তেমন নয়। বরং গলে-গলে যেন ছবির সঙ্গে মিশে মিশে যায়। অনুরূপ কারণে ইমেজ স্টেটমেণ্ট-এর চাইতে সাহিত্যকে সার্থকতর করে। ঘুম যেমন নৈশ স্বপ্নের, মনের প্রসুপ্তি তেমন অর্থবহ স্বপ্ন দেখার, যাকে সচেষ্ট দিবা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার অন্য নাম সাহিত্য তার উদ্দেশ্য। মনের এই প্রসুপ্তিকে যাকে এসথেটিক ডিলাইট বলা যায় তাকে বৈদান্তিকের যৌগিক উপায়ে পাওয়া মানসিক প্রশান্তির সঙ্গে এক করে দেখা হবে কি না তা অন্যত্র বিচার্য। যা আমাকে উপন্যাসের উদ্দেশ্য থেকে স্বপ্ন দেখা থেকে, ডিজন্ দেখা থেকে, ফ্যাণ্টাজি গড়া থেকে অন্যত্র নিয়ে যায় সে সব তর্ক বিতর্ক সুতরাং প্রীতিপদ হয় না। সেইজন্যই শেষপ্রশ্নকে গৃহদাহের তুলনায় অসার্থক মনে হতে পারে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সেটা অত্যন্ত মূল্যবান। সত্যি কি তেমন কেউ ছিলেন আমাদের বাংলাদেশে যাঁকে প্রদক্ষিণ করেছিলো শরৎচন্দ্রের অন্তরতর সত্তা? আমি শুনেছি কেউ কেউ অনুসন্ধান করেছেন এবং এখনও করছেন রাজলক্ষ্মী কে ছিলো, বড়দিদি মাধবী কে ছিলো, কেউ ছিলো কিনা ইত্যাদি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে শরৎবাবুর ডায়েরি, চিঠিপত্র, স্কেচবুক, কিছু আমার হাতের কাছে নেই। এই সুলভবর্ষণ দেশে সব কিছুই প্রাকৃতিক ও মানসিক ড্যাম্প লেগে নষ্ট হতে হতে এক সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং আমার পক্ষে অন্তত আদৌ বলা সম্ভব নয় শুচিশুভ্রা, নন্দাদেবীর মতোই অপাপবিদ্ধা কোন মানবীর অন্বেষণই শরৎবাবুর রমনীরত্নের সন্ধান নামা অর্থবহ স্বপ্নের প্রয়াসের মূলে ছিলো কি না। যদি তেমন কেউ থেকে থাকে তবে আমরা সেই বাঙালিনীর কাছে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ; যেমন আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারি, বিয়াত্রিচের কাছে, লিসার কাছে, কিংবা কোন এক ডার্ক লেডির কাছে। কিন্তু যে লিসা ডাভিঞ্চির সামনে বসেছিল, হয়তো, ছবিটা আঁকার সময়ে সে আর মোনালিসা কি এক? যে বিয়াত্রিচে স্বর্গের পথেরও দিশারী সে নিশ্চয় কখনও ইটালির

কোন সহরের পথে বেড়ায় নি। ডার্ক লেডিকে যে এখনও খুঁজে পেলুম না তাতে কি সনেটগুলোকে পড়তে অসুবিধা হয়? সাহিত্যিকের আত্মজীবনী থেকে পাওয়া কোন কোন ঘটনা হয়তো কাব্যের কোন কোন বেদনাকে Paignant করে তোলে, কিন্তু সেখানেও আত্ম-জীবনীটা আসল ব্যাপার নয়। শরৎবাবুর রমণীরত্নের সন্ধান নিশ্চয়ই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল কোন ব্যাপার নয়। বরং অন্য রকম। অটোবায়োগ্রাফিক্যাল উপন্যাসে লেখক প্রেমের অপর পক্ষের ভালোবাসার, উপেক্ষার, এবং এই দুই-এর মধ্যস্থিত অন্যান্য নানা আবেগের কথা বলে থাকে। এক্ষেত্রে যদি কেউ তেমন কোন বাঙ্গালিনী থেকেও থাকে তবে তার দূরে সরে যাওয়ার সব রকমের চেষ্টার ফলে, অনুভূতিকে, প্রীতিকে, আকর্ষণকে শাসন ক'রে সংযত ক'রে রাখার ফলেই এই সাহিত্য-সৃষ্টি এমন তত্ত্বটাই বরং সত্য হয়। কাউকে যেন পেলেম না, একজনই সে, এ বোধ ছিলো। কিন্তু কে সে? তা যদি মনের আয়নায় দেখা কোন বঙ্গললনার নিখুঁত ছবি হ'তো তবে আর অনুসন্ধান কেন? কিংবা মনের এই আয়নাটা এমন অদ্ভুত যে এখানে কোন ব্যক্তির ছবি যখন পড়ে তখন সে নতুন সৃষ্টি। যেমন পুষ্পস্তবক, জ্যোৎস্না, হয়তো বা নদীর বাঁক কোন মনের আয়নায় পড়ে উর্বশীকে সৃষ্টি করেছিল। কে সে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—তিনি যদি নির্দিষ্ট এক মানবীই হ'য়ে থাকেন তবে তাঁর পক্ষে শরৎবাবুর পরিণীতা হতেই বা বাধা কোথায়? কেন না আমরা কি বিবাহিতা স্ত্রীর স্বরূপকেই বুঝতে পেরে থাকি? বিশ-ত্রিশ বছর একত্র সংসার করার সুযোগেই চিনেছি এরকম বলা সহজ নয়। সাধারণ পুরুষ যার অনুভূতি ভোঁতা তারও সংশয় থাকে। একজন অসাধারণভাবে অনুভূতি-সম্পন্ন পুরুষের কাছে নারী পরিণীতা হলেও আরও বেশী করে আবিষ্কারের বিষয় হতে পারে। কোন বাঙালিনী যার ঠিকানা খুঁজে বার করা যাবে এমন কেউ ছিলেন কি না এই রমণীরত্নের মূল হিসাবে তাতে আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কিছু নেই; আমরা শুধু লক্ষ্য করি উপন্যাস-গুলোতে একটা প্যাটার্ণ থেকে গেছে যা তন্ময় দৃষ্টির সামনে এক রমণীরত্নের সন্ধান, যে প্যাটার্ণের মধ্যে থাকার জন্যই নায়ক এবং নয়িকাগুলি একে অন্যের চরিত্রের কাছে ঋণ নিতে আগ্রহী।

বাংলা উপন্যাসের ভাষা শরৎচন্দ্র ও উত্তরকাল
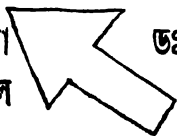
ডঃ নির্মল দাশ

উপন্যাসে ভাষাব্যবহারের উপলক্ষ প্রধানতঃ দুটি ঃ ১ বর্ণনা, ২ সংলাপ। বর্ণনা-অংশে লেখকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ। তিনি সেখানে সমস্ত ব্যাপারটা নিজের অভিজ্ঞতার জবানবন্দী হিসেবে বর্ণনা করে যান। এই জায়গায় লেখকের মানস-প্রবণতা অনুসারে বর্ণনার ভাষার তারতম্য ঘটে। লেখক যদি নিতান্ত বস্তুধর্মী ও প্রতিবেদনশীল হন তবে তাঁর গদ্যে এক ধরনের বর্ণহীন অনাসক্তির ছাপ পড়ে, আর লেখক যদি বর্ণনীয় সম্পর্কে কিছুটা পক্ষপাতী হয়ে পড়েন, তবে তাতে তাঁর পক্ষপাতের প্রকৃতি অনুসারে কোথায়ও বর্ণাঢ্যতা, কোথাও বা কৌতুক-বক্রতা দেখা দেয়। বাংলা কথা-সাহিত্যের বর্ণনার ভাষায় সাধারণতঃ এই পক্ষপাতের লক্ষণই বেশি করে ধরা পড়েছে, কারণ বর্ণহীন অনাসক্তি খুব কঠিন ব্যাপার এবং তা মাত্র দু-একজন লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায় (যথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)। দ্বিতীয়তঃ, সংলাপ-অংশে লেখকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় তথা পরোক্ষ। তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাগুলোকে অবিকল লিপিবন্ধ করে যান মাত্র। এখানে তাদের কথার মধ্যে তিনি যদি নিজেকে ঢোকাবার চেষ্টা করেন তবে সেটা হবে তাঁর অনধিকার-প্রবেশ। কারণ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীগত চরিত্রবৈশিষ্ট্য সংলাপের ভাষাপ্রকৃতিকে গভীর ও ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। সংলাপের ঔপভাষিক কাঠামো, শব্দাবলীর সমাবেশ, অর্থগত (semantic) বৈশিষ্ট্য—সমস্তই সংলাপভাষকের শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য লেখক যে ভাষায় বর্ণনা দেন, তাঁর পাত্র-পাত্রী যদি তাঁর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তবে ঠিক তাঁর ভাষাতেই পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন রচনা করলে সংলাপের তথা পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত বিচলিত হয়। এই কারণে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা বহুক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এমনকি, পাত্র-পাত্রী ও লেখক শ্রেণীবিচারে সমপর্যায়ভুক্ত হলেও (যথা, লেখকও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত, আবার পাত্র বা পাত্রীও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত)

সংলাপের ভাষা ও বর্ণনার ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাটা অনিবার্য। কারণ, বর্ণনায় লেখক সরল-জটিল-যৌগিক কিংবা ইতিবাচক-নেতিবাচক-প্রশ্নবাচক-বিস্ময়বাচক ইত্যাদি যে ধরনের বাক্যই ব্যবহার করুন না কেন, সবটাই তাঁর নিজের উক্তি। এই উক্তি অনর্গল ধারায় তাঁর মন থেকে লেখার মধ্যে চলে আসছে। এইজন্য বর্ণনার ভাষায় বাক্যের গঠন ও অর্থগত বৈচিত্র্য যদি থেকেও থাকে, তবু সমগ্র বর্ণনা-অংশে একটা সার্বভৌম একমুখীনতা ও অবাধ প্রবহমানতা বিরাজ করে। পক্ষান্তরে সংলাপ সাধারণতঃ একেতর ব্যক্তিবর্গের উক্তিসংকলন, সুতরাং তার মধ্যে সার্বভৌম একমুখীনতা আশা করা যায় না। অন্য দিকে, সংলাপ যেহেতু পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের স্বচ্ছতম প্রতিধ্বনি, সেইজন্য সংলাপের ভাষায় ভাবান্তরের বিচিত্র উত্থানপতন সহজেই ফুটে ওঠে। মনোভাবের বৈশিষ্ট্যেরই জন্যই সংলাপবাক্য কোথাও দীর্ঘ কোথাও হ্রস্ব, কোথাও অসমাপ্ত বা এলোমেলো (anacoluthon)। সংলাপ-বাক্যের এইসব বৈশিষ্ট্য ব্যাকরণের সরল-যৌগিক-জটিল বা ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভৃতি মামুলি মাপকাঠিতে মাপা যায় না। অথচ এইসব বৈশিষ্ট্যই সংলাপকে জীবন্ত করে তোলে এবং এইসব বৈশিষ্ট্য আছে বলেই সংলাপের ভাষায় বর্ণনার ভাষার অবাধ প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্ণনা ও সংলাপের কাজ ও স্বভাব এক নয়, এবং এক নয় বলেই এই দুইয়ের ভাষাভঙ্গীর কিছু না কিছু তফাত অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের গোড়ার দিকে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা-ভঙ্গীতে কোন স্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করা হয় নি। গড়-উইলিয়ম কলেজের লেখকেরা প্রচলিত অর্থে উপন্যাস না লিখলেও গদ্যচর্চার অবলম্বন হিসাবে কিছু কিছু উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সহস্রাব্দপ্রাচীন পদ্যভাষার বিকল্প হিসাবেই গদ্যভাষায় নির্মাণকর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের প্রয়াস গদ্যের প্রাথমিক কাঠামো তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, আলাদা করে আখ্যানের উপযোগী ভাষা-নির্মাণের দিকে এঁরা নজর দিতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের মধ্যে সংবেদনশীল শিল্পী-স্বভাব ছিল, এবং কিছু কিছু গদ্য উপাখ্যানও তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল টানা গদ্যে কীভাবে নাটক বা কাব্যের কাহিনীকে প্রকাশ করা যায়। এইজন্য তাঁর আখ্যানেও বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নি। প্রচলিত অর্থে উপন্যাসের প্রথম সফল রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর রচনাতেই বাংলা গদ্য

আখ্যান সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক শিল্পমূর্তি লাভ করেছে এবং আখ্যানের ভাষাকে তিনিই সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধি দান করেছেন। কিন্তু বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষায় সূক্ষ্ম ব্যবধান তিনি সর্বত্র রক্ষা করেন নি। তবে তাঁর রচনার বর্ণনা ও সংলাপের ভাষায় একটা অভিনব বৈচিত্র্য দেখা গেল। লেখক হিসাবে বঙ্কিম ছিলেন গদ্যভাষার বিষয়ানুসারিতার প্রচারক ও অনুশীলক, সেইজন্য বর্ণনার বিষয় অনুসারে বর্ণনার ভাষারও ইতর বিশেষ ঘটেছে (উদাহরণস্বরূপ বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ৩৪তম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে ৩৭তম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ তুলনা করুন)। আবার চরিত্র অনুসারেও সংলাপের ভাষার উচ্চাবচতা ঘটেছে। অভিজাত চরিত্রগুলির মুখে তিনি সর্বত্রই তৎসমপ্রধান সাধুভাষা দিয়েছেন, কিন্তু অনভিজাত কিংবা লঘুভাবাপন্ন অভিজাত চরিত্রের মুখে অনেকক্ষেত্রে মোটামুটি কথ্য ভাষার অনুগত ভাষা দেবার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রে পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য চরিত্রের মুখে লৌকিক বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, হিন্দী ও হিন্দুস্থানী সংলাপ দিয়েছেন। এইসব অ-বাংলা সংলাপের ভাষা ব্যাকরণের দিক থেকে নিখুঁত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু চরিত্রের ভাষাসাম্প্রদায়িক শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের কথা যে তিনি মনে রেখেছেন এটা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষণীয়। বঙ্কিমের উপন্যাসে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা সর্বাঙ্গীণ আত্মস্বাতন্ত্র্য পায় নি বটে, কিন্তু তিনি যে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার বিষয়ানুসারী তারতম্য ঘটাবার কথা চিন্তা করেছেন, অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সেখানেই আধুনিক ঔপন্যাসিক ভাষার সফল সূত্রপাত। বঙ্কিম যার সূচনামাত্র করলেন তার পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুটন রবীন্দ্রনাথে। বর্ণনায় 'সাধু' ও সংলাপে 'চলিতে'র ব্যবহার তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। 'গোরা' উপন্যাস এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'গোরা'র পর 'চতুরঙ্গে' পুরোপুরি সাধুভাষা ও অন্যান্য বইতে পুরোপুরি চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাতে আখ্যানের দুই অঙ্গের আত্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ ঘটেনি। তবে তাঁর গদ্য যেহেতু মহাকবির হাতের গদ্য, সেইজন্য সেই গদ্য অনতি-বিলম্বেই বাঙালীর কথনভঙ্গীর সাধারণ সীমাকে লঙ্ঘন করে এক অ-লৌকিক মহত্ত্বের মাত্রাকে স্পর্শ করল (পাঠককে 'শেষের কবিতা'র গদ্যকেই স্মরণ করতে বলি)। গদ্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদি মুখে বলার 'ভাষা' হয়, তবে রবীন্দ্রগদ্য ক্রমশই তা থেকে সরে গিয়েছে। যে বিপুলসংখ্যক অক্ষরজ্ঞান-

সম্পন্ন জনসমষ্টি জনপ্রিয়তার ভোটদাতা তারা রবীন্দ্রগদ্যে কোন অভ্যস্ত প্রত্যাশার পরিতৃপ্তি পায় নি। এইজন্য রবীন্দ্রগদ্য তথা রবীন্দ্র-উপন্যাস ঐ জনসমষ্টির কাছে সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত হয় নি। তাঁর আন্তর্জাতিক কবি-খ্যাতি তাঁর শ্রদ্ধার আসনকে অবিচল রেখেছে বটে, কিন্তু প্রীতির অর্ঘ্য পেয়েছেন আর একজন, যিনি গদ্যভঙ্গীতে অনেকটাই তাদের কথ্য অভ্যাসের অত্যন্ত নিকটবর্তী। ইনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাসের ভাষায় শরৎচন্দ্র আকস্মিকভাবে কোন নতুন রীতির প্রয়োগ বা উদ্‌ভাবনের চেষ্টা করেন নি। পূর্বগামী প্রথা অনুসারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন (চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন)। বর্ণনার ভাষা অনেকক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কখনো কখনো কথ্য ভাষার বিপরীত মেরুকে স্পর্শ করেছে (যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্ত কর্তৃক আঁধারের রূপ বর্ণনা ; এক্ষেত্রে ঐ অংশ নায়কের বিমুগ্ধ চেতনার আবিষ্ট প্রতিক্রিয়া, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ শিথিল, কল্পনাভাবাতুর বিষয়ের বর্ণনা হিসাবে ঐ অংশ অমন মেদুর, মন্থর ও অন্তর্মুখী হওয়াই স্বাভাবিক)। কিন্তু যে বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবের সাক্ষাৎ যোগ আছে, তার বর্ণনা কেমন সহজ, ক্ষিপ্র ও মৌখিক ভঙ্গীর অনুগামী ('শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের সেই সাইক্লোন-কবলিত জাহাজটির বর্ণনা স্মরণ করুন)।

সমগ্র শরৎসাহিত্যে অনুভূতিগাঢ় অন্তর্মুখী বর্ণনা অপেক্ষা প্রতিবেদন-ধর্মী বহির্মুখী বর্ণনাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। হয়ত উপন্যাসের স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠতা কিংবা লেখকের বহির্মুখী প্রবণতাই এর মুখ্য কারণ। আর এইজন্যই তাঁর সমগ্র রচনায় 'আঁধারের রূপ' বর্ণনাজাতীয় অন্তর্মুখী গদ্যের নিদর্শন খুবই কম। এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে এই ধরনের গদ্যরচনাতে তাঁর নিজস্বতার ভাগ খুবই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ : 'এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার।' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে যে অন্তর্গততার আভাস আছে তাতে তো রবীন্দ্রগদ্যেরই অনুচিকীর্ষা প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। 'শ্রীকান্ত' তাঁর অন্তর্জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল বলে এই গ্রন্থ থেকেই তাঁর অন্তর্মুখী গদ্যের রবীন্দ্রানুকারিতার আরও কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

১ : বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক

বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আছন্ন হইয়া গেছে এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দ্রংষ্টারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। [১ম পর্ব ঃ ২য় অধ্যায়]

২ ঃ অস্তগামী সূর্যের তির্যক্ রশ্মিছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। [১ম পর্ব ঃ ৯ম অধ্যায়]

৩ ঃ আজ সারাদিনটা কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্নসূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সামনের আকাশটা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্তী একঝাড় বাঁশ ও গোটা-দুই তেঁতুল গাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল। হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়, হয়ত যে আলো আর এক নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। [৩য় পর্ব ঃ ৮ম অধ্যায়

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র যে দম্ভোক্তি করেছেন ['ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখ-টুখ তো কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা তো চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।'] তা আসলে রবীন্দ্রপ্রমুখ রোমাণ্টিক লেখকদের অন্তর্মুখী বস্তুবর্ণনার বিরুদ্ধে লোকদেখানো 'বস্তুবাদ'। এই বস্তুবাদের কোন প্রকৃত চেহারা নেই, এটা যতখানি বিজ্ঞাপিত ততখানি

রূপায়িত নয়। নচেৎ যে পদ্ধতিকে তিনি মুখে বিদ্রূপ করলেন, কাজের বেলায় আবার তাকেই অবলম্বন করলেন কেন? এই স্ববিরোধ কি শরৎচন্দ্রের গোটা শিল্পী-মানসের ভিতরেই আমূল প্রোথিত? পাঠকদের ভেবে দেখতে বলি। আমার তো মনে হয়, শিল্পী হিসাবে তিনি রোমান্টিকদের অন্তরীক্ষ ও রিয়্যালিস্টদের ভূতল খন্ডের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত বিরাজ করেছেন। সেইজন্য অন্তর্মুখী বর্ণনার গদ্যে তিনি রিয়্যালিস্টদের মতো পুরোপুরি নীরক্ত হতে পারেন নি, আবার রোমান্টিকদের মতো কল্পনাশক্তির অসাধারণত্বও দেখাতে পারেন নি। এইজন্যই তাঁর অন্তর্মুখীন গদ্যে যে অনুভূতির রঙ দেখা যায় তা মনোহর হলেও অসাধারণ নয়, এবং এই কারণেই ঐ গদ্য কথ্য ভাষার বিপরীত মেরুকে স্পর্শ করলেও তা পাঠকদের অপরিচিত ঠেকে নি, তাদের অভ্যস্ত প্রত্যাশাও প্রতিহত হয় নি। এইজন্য তিনি অন্তর্মুখীন গদ্যাংশেও সমান সুখপাঠ্য।

তবে আগেই বলেছি, তাঁর বর্ণনায় অনুভূতিরঞ্জিত অন্তর্মুখী গদ্যের চেয়ে প্রতিবেদনধর্মী বহির্মুখী গদ্যই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গদ্য বাদ দিলে তাঁর রচনায় অবশিষ্ট থাকে সংলাপের গদ্য। বর্ণনার বহির্মুখী গদ্য ও সংলাপের গদ্যের মধ্যে সাধুচলিত-ঘটিত একটা বাহ্য তফাত অবশ্যই আছে, কিন্তু ওই তফাত নিতান্তই রূপগত, উভয় শ্রেণীর গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের উপর সামান্য কিছু ব্যাকরণসম্মত অস্ত্রোপচার করলেই একে অপরের রূপ ধারণ করতে পারে—এই অস্ত্রোপচারে বর্ণনার রস বা সংলাপের প্রাণ বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত. হয় না। প্রমাণ-ব্যাকুল পাঠকদের জন্য এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই ঃ

১ ঃ "রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ি ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে ঘরের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার, দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি ; তাই বলি—

"রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুই মহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল ; কিন্তু সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।

"লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসন গ্রহণে স্বীকৃত হইল না,

খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইস্কুল, মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র পড়ে। দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্নমেণ্ট সাহায্য আছে, তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়াছিল তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে, উপস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে যে তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্য মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

২ঃ "[বনমালী পাড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

রমেশ। আপনি কে?

বনমালী। আপনাদের ভৃত্য, বনমালী পাড়ুই। গ্রামের মাইনার ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

রমেশ। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি ইস্কুলের হেডমাষ্টার?

বনমালী। আপনার ভৃত্য। দু'দিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয় নি।

রমেশ। আপনার ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা কত?

বনমালী। বিয়াল্লিশ জন। গড়ে দু'জন পাস হয়। একবার নারায়ণ বাঁড়ুজ্যের সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল।

রমেশ। বটে?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এ-বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না।

রমেশ। সমস্তই আপনাদের মাথায় পড়বে?

বনমালী। আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু সে এখনো দেরি আছে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাই নি। মাষ্টাররা বলচেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ আর বেশিদিন তাড়ানো যাবে না।"

পাঠকদের অবশ্যই বলে দিতে হবে না যে প্রথম উদ্ধৃতিটি 'পল্লীসমাজ' (৫ম অধ্যায়) ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি 'রমা' (১০ অংক। ৪র্থ দৃশ্য) নাটক

থেকে নেয়া হয়েছে, তবে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উদ্ধৃতাংশ দুটির বিষয়-বস্তুর দিকে। বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই এক, তবে উভয়ের উপস্থাপনা-পদ্ধতি ভিন্ন। প্রথম উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি অর্থাৎ সংলাপ ও বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা ব্যক্ত করা হয়েছে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে তা-ই সম্পূর্ণ-ভাবে প্রত্যক্ষ উক্তি অর্থাৎ সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে (নাট্যাংশে যে ঈষৎ তফাত দেখা যায় তা নাটকের দৃশ্যপরিকল্পনাগত, মূল বিষয়ের উপর এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র অনায়াসেই বর্ণনাকে সংলাপের ভাষায় এবং সংলাপকে বর্ণনার ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁর এই দক্ষতা দু-একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র রচনাতেই তা পরিব্যাপ্ত। প্রথার মুখ চেয়ে বর্ণনার সময় তিনি হয়তো ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারাটা দীর্ঘতর করে দিয়েছেন, কিন্তু সংলাপের হ্রস্বতর গদ্যের সঙ্গে তার কোন সত্যিকারের বিভেদ নেই। তাহলে তাঁর বর্ণনার গদ্যরূপ ও সংলাপের গদ্যরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও আসলে কোনো অন্তর্লীন অভিন্ন মৌল কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্তর্লীন অভিন্ন মৌল কাঠামো হচ্ছে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীর মুখের গদ্য। এই গদ্যের চেহারা কেমন তা শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্র পড়লেই বেশ জানা যায়। তাঁর চিঠিপত্রেও দেখা যাচ্ছে, তিনি কখনো তথাকথিত 'সাধু' কখনো তথাকথিত 'চলতি' রূপের গদ্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উভয়েরই ধরনটা মৌখিক। চিঠিপত্র ব্যক্তিগত ভাববিনিময়ের ব্যাপার, তাছাড়া কৈফিয়ত দেবার কোন উপলক্ষও সেখানে থাকে না। সেইজন্য চিঠি, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত চিঠি মানুষ স্বাধীন ও অসতর্ক হয়েও লিখতে পারে। সেই স্বাধীনতা ও অসতর্কতা নিয়ে চিঠি লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র যখন একই সময়ে একই ব্যক্তির কাছে কোথাও সাধু, কোথাও চলিত ভাষা ব্যবহার করেন এবং ক্বচিৎ একাধারে উভয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকেন, তখন বুঝতে হবে আসলে তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে উভয় রীতির চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান ছিলেন না। অবশ্য সাহিত্যের পোশাকী ক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক হতে হয়েছে। এই সতর্কতার নমুনা হিসাবে, তিনি সাবেক প্রথার অনুসারে বর্ণনার ভাষাকে সংলাপের প্রত্যক্ষতা থেকে আলাদা করার জন্য ঐ গদ্যের ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপগুলি দীর্ঘতর করেছেন এবং সংলাপের গদ্যে কথ্যরীতির মৌলিক রূপটি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। অবশ্য এই পার্থক্য নিতান্তই নামমাত্র, আসলে ভিতরের

কাঠামোটা এক ও অভিন্ন। এই কাঠামোটির ভাষাতাত্ত্বিক নাম রাঢ়ী উপভাষা। শরৎচন্দ্র একটি আঞ্চলিক উপভাষাকে অবলম্বন করলেও এমন একটি উপভাষাকে অবলম্বন করেছেন নানা দিক থেকে যার ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিশ্রুতি সুবিপুল। এই উপভাষা অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ হলেও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতি প্রভৃতি নানা কারণে সমগ্র বাংলার সমস্ত উপভাষী সম্প্রদায়ের কাছেই এটি সুপরিচিত ও অনুকরণযোগ্য। শরৎচন্দ্র ব্যাকরণের বিচারে সাধু বা চলিত যে রীতিতেই লিখুননা কেন, আসলে তিনি আজীবন রাঢ়ী উপভাষার কাঠামোর উপরই অবিরলভাবে তাঁর ঔপন্যাসিক সৌধ নির্মাণ করেছেন। এইজন্য তাঁর ভাষা বাঙালী পাঠকের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ভাষা। রবীন্দ্রনাথসহ আরও কেউ কেউ চলিত গদ্যে লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ঐ চলিত গদ্য ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারার দিক থেকে 'চলিত', কিন্তু বাক্যবন্ধের ধরন বা শব্দচয়নের ভঙ্গীতে সর্বাংশে বাঙালীর কথনভঙ্গীর নিকটবর্তী নয়। আসলে, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকেরা সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিত ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষাকে উপভাষার সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন। এই জন্য ওই গদ্য চলিত হয়েও গড়পড়তা উপন্যাসপাঠকের কাছে সুপরিচিত ঠেকেনি। কিন্তু শরৎ-চন্দ্র সংলাপের গদ্যে তো বটেই, বর্ণনার গদ্যেও বাঙালীর সাধারণ বাচন-ভঙ্গিমাকে রূপান্তরে রক্ষা করেছেন। এইজন্য মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্যের দুর্মর আভিজাত্য বা অলংকারের নিবিড় প্রলেপ নেই; এই কারণেই তিনি সর্বাপেক্ষা পরিচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্য, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

পরিশেষে একটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ উত্তরকালের বাঙালি ঔপন্যাসিকদের কাছে শরৎচন্দ্রের ভাষারীতি কতখানি গ্রহণযোগ্য হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর-সন্ধান করতে গেলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের সমসময়েই বাংলা উপন্যাসে দু-রকম ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছেঃ একটি কিছুটা শিল্পিত এবং সেই কারণেই খানিকটা কৃত্রিম; প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথ থেকেই তার ব্যাপক আত্ম-প্রকাশ। অন্য ধারাটি অনেক পরিমাণে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ এবং দৈনন্দিন জীবনের বাগ্‌ভঙ্গিমার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ, শরৎচন্দ্র এই ধারায় পুরোবর্তী। প্রথম ধারাটি অনুসৃত হয়েছে যাঁরা বিদগ্ধ বলে পরিচিত, যেমন, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকেরা, যাঁরা লেখার বিষয় ছাড়াও লেখার ভাষার কারুকার্যের কথাও বিশেষ করে ভেবেছেন ও ভাবেন।

বলা বাহুল্য এঁরা সংখ্যায় বেশি নন। সংখ্যায় তাঁরাই বেশি যাঁরা লেখার ভাষায় বৈদগ্ধ্যের চেয়ে প্রত্যক্ষতাকেই বেশি মূল্য দেন। এই আড়ষ্টতাবর্জিত প্রত্যক্ষতাই ঔপন্যাসিক ভাষার ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের স্থায়ী দান। শরৎচন্দ্রের পর বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিত নানাভাবে বদলে গিয়েছে, ফলে বাংলা উপন্যাসেরও নানারকম পালাবদল হয়েছে। কিন্তু যতরকম পালাবদল হোক না কেন বাংলা উপন্যাসে জীবনকে আরো কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে উপন্যাসের ভাষাকেও ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠতে হয়েছে। ভাষার পক্ষে এই স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কেননা এতে বর্ণনা-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রথাসিদ্ধ শব্দাবলী, বাক্যবন্ধ ও 'ক্লিশে' ব্যবহার করা চলে না, নতুন নতুন পরিস্থিতি ও অনুভূতির জন্য নতুন নতুন শব্দবন্ধ ও প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়। এক কথায়, ভাষাকে জীবনের খুব কাছাকাছি আসতে হয়। শরৎচন্দ্রের ভাষায় উন্নত শিল্পগৌরব হয়ত নেই, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য জীবনঘনিষ্ঠতা আছে। এই জীবনঘনিষ্ঠতার সূত্রেই শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গী উত্তরকালের লেখকদের কাছে আদর্শস্থানীয়॥

শরৎচন্দ্র ও লোক সংস্কৃতি — ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
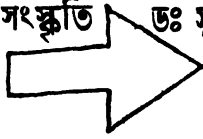
মানুষের গল্পের প্রতি অনুরাগের মধ্যে নিহিত আছে উপন্যাসের মূল সূত্র। গল্প বা কাহিনী শুনবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরায়ত। তাই আদি যুগের পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্যই কাহিনী বা আখ্যানমূলক, আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে ওদেশের ইলিয়াড-ওডিসি প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি মূলতঃ অ্যাখ্যানমূলক। এসব মহাকাব্যগুলির মধ্যে যেমন আখ্যানের চমৎকারিত্ব আছে তেমনি অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ— যা দ্বারা কাহিনীগুলি একটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ঘটনার দুরন্ত প্রবাহের পটভূমিকায় চরিত্রগুলি সজীব ও স্বতন্ত্রতায় ভূষিত হয়ে মহাকাব্যগুলির আখ্যানভাগ চিরকালের মানুষের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম করে আকর্ষিত হয়েছে। এসব মহাকাব্যের মধ্যে চরিত্র ও কাহিনী একসূত্রে গ্রথিত হয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু আর এক প্রকার গল্প আছে যা মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক বা চমক-প্রদ ঘটনাবলীর সমাবেশ। এসব কাহিনীর মধ্যে চরিত্রের চেয়ে সমাজচিত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনের নানা ইঙ্গিতময় উপাদান প্রধান। পরিপূর্ণ বিকশিত স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ম মানব চরিত্র এখানে অনুপস্থিত - ঘটনার ঘনঘটা, কাহিনীর চমৎকারিত্ব বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতময় চিত্রাঙ্কন, রোমান্সের মাধুর্য এখানে গল্পের মূল রসটি জমিয়ে তোলে এবং শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। আমাদের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, কথা সরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, য়ুরোপের ডেকামেরণ, বাংলার রূপকথা—উপকথা—ব্রতকথা এবং ইতিকথা পুরাকথা—এ জাতীয় গল্পের উদাহরণ। এসবের মধ্যে কতকগুলিতে পশুপক্ষীর রূপকচ্ছলে মানবজীবনের নানা তত্ত্বকথা ও মানবপ্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করা হয়েছে, কতকগুলিতে নিরঙ্কুশ রঙীন কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব অসম্ভব আজগুবি ঘটনাপরম্পরার মাধ্যমে জীবনের

রহস্যময়, আকস্মিক কুয়াশাবৃত দিকটাকে সঙ্কেতের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়েছে। এইসব গল্পের কাহিনীগুলি যেমন অস্পষ্ট ছায়াময় ও রহস্যাবৃত ঠিক তেমনি কাহিনীর নায়ক-নায়িকার ও চরিত্রগুলির কার্যাবলী ; আচরণও অস্পষ্ট ছায়াবৃত কুহেলিকায় ঢাকা, আবার ঘটনা—চমৎকারিত্বের অন্তরাল থেকে অর্ধস্ফুট এই সব গল্পকাহিনীতে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ে, ঘটনার প্রবাহ তাদের গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে যায়, গল্পের মাধুর্য ও মায়াময় রসে তাদের আবিষ্ট করে ফেলে। ফলে, পাঠকের আর নিজস্বতা থাকে না। ক্রমশঃ সে গল্পের যে যাদুকরী মোহময়তা আছে তাতে একাকার হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে লৌকিক উপাদানের প্রভাব প্রসঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্যটি প্রথমেই স্মরণ আসে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস রচনার মূল কথাই হোল 'গল্পরস' বা গল্পের আকর্ষণ। একজন নিপুণ কথকের মতো শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে গল্পের পর গল্প সাজিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী রচনা করে, ঘটনার পর ঘটনার মালা গেঁথে উপন্যাসের মধ্যে যে আশ্চর্য গল্পের সম্ভাব্য রচনা করেছেন তা অতি বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্রকে পরবর্তীকালে যে অপরাজেয় কথাশিল্পী রূপে আখ্যাত করা হয়েছে তারও মূলসূত্র বুঝি নিহিত আছে কথার পর কথা দিয়ে, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে 'গল্পরস' কে এক মোহময় পটভুমিকায় স্থাপিত করার মধ্যে। লোকশ্রুতিবিদ লোককথার শিল্পরূপ (Art of Folktale) প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ লোককথা সজীব শিল্প ইহাকে বলা হইয়া থাকে। ইহা বলিবার মধ্যে যে রসসৃষ্টি থাকে, শুনিবার মধ্যেও তেমনই একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে নীরস গদ্যের আবৃত্তি মাত্র শুনা যায় না, বরং একটি অপূর্ব শ্রুতি সুখকর রসের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয়। (বাংলার লোকসাহিত্য ৪র্থ খণ্ড, ২, ৪৬০, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য) রবীন্দ্রনাথও 'গল্পরসের' এই মাধুর্য ও মোহময় আকর্ষণটিকে তাঁর অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

'এক যে ছিল রাজা।'

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চী কনৌজ কোশল অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাঁহার রাজত্ব এসকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। আসল যে কথাটি

শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা……

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তারপরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লংঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।

—উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে আমাদের চিরায়ত লোককথা বিশেষ করে রূপকথার আঙ্গিকের (Form) যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ লোককথার একটি কাহিনী থাকবে, দ্বিতীয়তঃ কাহিনীটি ঘটনার শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে, তৃতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা গল্পের সমাবেশ থাকবে, চতুর্থতঃ ক্ষুদ্র গল্পগুলি একটি মূল কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত থাকবে। পঞ্চমতঃ ঘটনাগুলি চমকপ্রদ, উত্থান-পতনময়, বেগসঞ্চারী হবে। ষষ্ঠতঃ ঘটনা ও গল্পগুলি একটি সুর ছন্দ, স্থাপনের দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে একটি সুরের মায়াময় জগৎ তৈরী করবে। সপ্তমতঃ চরিত্রগুলি ঘটনা-স্রোতের প্রবাহে প্রবাহিত হবে। অষ্টমতঃ লোককথার রচয়িতা বা কথকের বলার ভঙ্গিতে একটি সুরেলা ভাব, মাদকতার মাধুর্য, কল্পলোকের কল্পনা-বিলাস থাকবে। ফলে রূপকথার শ্রোতা এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে যেমন বিচরণ করবে তেমনি তার চারধারে একটি শ্রুতিসুখকর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করবে। নবমতঃ গল্পের মধ্যে এমন আকর্ষণীয় বস্তু থাকবে যার ফলে সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হবে। আর দশমতঃ 'শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ' গল্প স্রোতের মধ্যে' সুষুপ্ত ভেলায়' ভাসিয়ে ভোরের বেলায় দুটি 'মায়ামন্ত্রে' তাকে জাগ্রত করে তুলবে।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসগুলির কথনভঙ্গির শিল্পে' (Art of Story

telling)-র মধ্যে আছে লোককথার রূপকথা উপকথা ব্রতকথার কথনভঙ্গির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য। তিনি যে উপন্যাসের মধ্যে কাহিনী বর্ণনায় গল্প বলার ভঙ্গিই গ্রহণ করে ছিলেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সূচনাতেই আছে তার সার্থক পরিচয়। সেখানে প্রথম পর্বের সূচনাতেই লেখক রূপকথার কথকের মতো শুরু করেছেন ঃ

"আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। লেখক এখানে 'কতকথার' কথকতা শুরু করেছেন—গল্পের কথকতা রচনা করেছেন সমগ্র উপন্যাসে। আবার তিনি একটু পরেই বলেছেন ঃ "কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সেকথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।" এরপরই শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথের গল্প —ফুটবল ম্যাচ সিন্ধিভক্ষ, ইস্কুল পলায়নের কাহিনী। তারপরেই লেখক আবার শুরু করেছেন ঃ 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় না।' আরম্ভ হয়েছে নতুন গল্পের—মেজদার তত্ত্বাবধানে বালকগণের অধ্যয়ন, বহুরূপী রূপ বাঘের আবির্ভাব, পিসেমশাই-এর ক্রোধ, ভোজপুরি দারোয়ানের ভীতি এবং পরিশেষে ইন্দ্রনাথের সাহসিকতায় হাস্যপরিহাসে এই গল্পের পরিসমাপ্তি, তারপরে ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক জীবনের আর একটি নতুন গল্পের সূচনা করেছেন শরৎচন্দ্র। সমগ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিতে এভাবে ঘটনার মালা গেঁথে গেঁথে রূপকথার মতো একটানা একটি গল্পের যাদু রচনার চেষ্টা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা রূপকথার ঘটনাবলীতে যেমন চমৎকারিত্ব থাকে, অভিনবত্ব থাকে কিংবা একটি ঘটনার কৌতুহল ফুরাতে না ফুরাতে আর একটি গল্প বা ঘটনাকে সমভাবে কৌতুহলোদ্দীপক করে তোলার প্রচেষ্টা থাকে শরৎচন্দ্র কেবল শ্রীকান্ত উপন্যাসেই নয়, তার সমগ্র উপন্যাস রচনার মধ্যেই রূপকথার এই গল্প বলার ভঙ্গীটিকে গ্রহণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস-এর উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রূপকথার অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের মধ্যে দিয়ে গল্প বা কাহিনীর সূচনা হয়ে থাকে। পরে আস্তে আস্তে কথক গল্পের গভীরে যায়। 'শুভদা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের একটি অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসের

মধ্যেও লোককথার কথনভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রথম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদেই দেখা যায় 'গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জল পূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে। ঘাটে আরও তিন-চারজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরানীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকরুনকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করে পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকে বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা ?

এই হারাণ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্যেদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে।'

এরপরই শুরু হয়েছে হারাণ মুখুজ্যেদের দুরদৃষ্ট অভিপ্রায় এর কাহিনী। গল্পকার প্রথম পরিচ্ছেদে টুকরো টুকরো সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রতি কৌতুহল সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গল্পের সূচনা করেছেন। 'এ স্থানটির নাম হলুদপুর।...শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধ-লুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।' এরপর ব্রতকথার মতই গল্পটি তরতরে ভঙ্গিতে সুরেলা ছন্দে ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী রচনা করে এগিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' থেকেই—এই বাঙলা দেশের প্রচলিত লোককথার কথনভঙ্গি বা গল্প বলার রীতিটি অনুসৃত হয়েছে। রূপকথা-উপকথার এই ঐতিহ্যানুসারী গল্পকথনের ভঙ্গি (Traditional Story telling Pattern) শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখার সূচনা

থেকে যে অনুসরণ করেছেন 'বড়দিদি' উপন্যাস-এ তার প্রমাণ আছে। গল্প বলার ভঙ্গিতে তিনি আরম্ভ করেছেনঃ 'এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদা সর্বদা একজন লোক প্রয়োজন—সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।... সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ।'...তারপরই শুরু করেছেন আসল গল্পঃ "সুরেন্দ্রর পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙলা দেশের সহিত তাঁহার বেশি কিছু সম্বন্ধ ছিল না।'...এইভাবেই ধীরে ধীরে পাঠককে গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, গল্পরসের মাধুর্যে ও মোহময়তায় আকৃষ্ট করে ফেলেছেন। গল্প বলার এই চাতুর্যটুকু তিনি বাঙলা দেশের রূপকথা-ব্রতকথা-ইতিকথা-পুরাকথার রীতি থেকেই যে গ্রহণ করেছেন তার আরও উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রও তাঁর বহু উপন্যাসে ইতিকথা কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের মধ্যে একটি জমাট ভাব আনার জন্যে। কিংবদন্তী জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর একটি মোহমুগ্ধতা বা আকর্ষণীয় মাদকতা আছে যা পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মত কাহিনীর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। শরৎচন্দ্রও বহু উপন্যাসের প্রারম্ভে এবং ভিতরকার অনেক পরিচ্ছেদের সূচনায় গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সূচনাঃ 'চণ্ডীগড়ে চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বাবুই নদীর উপকুলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চন্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারের ভুক্ত।' তারপরই আসল গল্প শুরু হয়েছে এইভাবেঃ 'সেই জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য পরিদর্শনস্থলে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।' সুতরাং সূচনায় কিংবদন্তীটিকে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রারম্ভ রচনায় উপযুক্তভাবেই ব্যবহার করেছেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ পল্লীর গ্রাম্যমানুষ। তাঁর জন্ম গ্রামে, শিক্ষা

গ্রামে, পরবর্তী জীবনের অনেকটাই কেটেছে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে। তাই তাঁর সাহিত্যের তিনভাগ অংশই বাংলাদেশের গ্রাম-জীবন ও পরিবেশ তার নিজস্ব স্থানটি দখল করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাই এককথায় গ্রামীণ জীবন ও লোকায়ত মানুষের জীবনবেদ। তার কারণ হিসাবে বলা চলে একটি মানুষের জন্ম-কর্ম-ধর্মের প্রেক্ষাপটই তাঁর নিজস্ব মানসিকতাটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের সাতটি গ্রাম বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, ত্রিশবিঘা, এবং দেবানন্দপুর। ভারতচন্দ্র এই গ্রামটির প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশ যার যশ গায়
হয়ে মোর কৃপায় দায় পড়াইল পারসী

প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে উক্ত সপ্তগ্রামে সপ্তঋষি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে এর নাম হয় সপ্তগ্রাম। শরৎচন্দ্রের পিতৃভূমি বা আদি নিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্বপারে কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রামে। এই দেবানন্দপুর ও মামুদপুরের সেদিনের হিসাবে দূরত্ব খুবই কম, মাঝখানে শুধু ভাগীরথী। দেবানন্দপুর সুপ্রাচীন বন্দর এবং ত্রিবেণী সঙ্গম তীর্থের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের মধ্যে অবস্থিত। অপরপক্ষে মামুদপুর ভাটপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতির ঐতিহ্যে প্রতিপালিত। নিকটবর্তী হালিশহরের শক্তি-তান্ত্রিক ভাবধারা এবং খড়দহের বৈষ্ণব ভাবধারার এক মিশ্রিত সাংস্কৃতিক চেতনা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং অপরদিকে শাক্ত আবহাওয়া-পরিবর্ধিত মাতা ভুবনমোহিনী। এ দুয়ের সংমিশ্রণে শরৎচন্দ্র এক উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন রক্তের সূত্রে। তাই পরবর্তী জীবনে গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে এই উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী শরৎচন্দ্র নিজেকে আরো বলিষ্ঠ ও বর্ধিত করতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরসটিকে যথার্থভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজেই বহু জায়গায় আত্মকথনের ভঙ্গিতে নিজের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বার বার পল্লীগ্রামের কথাই বলেছেন ঃ 'ছেলেবেলার কথা

মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙ্গাঁঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি. তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই। এ পাড়াগাঁ নিশ্চয়ই দেবানন্দপুর এবং তৎসন্নিহিত গ্রামগুলি এবং পরবর্তী জীবনের পানিত্রাস সামন্তাবেড়ের হাওড়া জেলার গ্রামসমূহ। শরৎচন্দ্র তাঁর ৬১ বছরের অধিক আয়ুষ্কালের মধ্যে ২২।২৩ বছরেরও অধিককাল দেবানন্দপুর ও সামতাবেড়েতে কাটিযেছিলেন। তাছাড়া ভাগলপুর বিহারের বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হলেও সেখানকার গঙ্গার উদাত্ত পরিবেশে ও সেখানকার বাঙালী সমাজ বাঙলাদেশের একটি গ্রামীণ আবহাওয়া তৈরী করেছিলো। শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদের একটি অংশ শ্রীকান্ত যে আত্মচিন্তা করছে তার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের গ্রামপ্রীতি ও লোকায়ত সংস্কৃতি প্রীতির একটি পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত হয়েছে ঃ রেল স্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য দুই ধারে যদৃচ্ছা—বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন, সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। লেখক তখন গ্রাম-বাংলার সহজ শান্ত আলো আঁধারের পরিবেশে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন-প্রবাহ ও হাজার হাজার বছরের পিতৃ পিতামহদের ঐতিহ্যানুসারিত জীবনযাত্রার এক চিত্র অঙ্কন করেছেন ঃ 'আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিযাছিলেন, সেদিন এই পথই বরযাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধূলো-বালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম।' এই হচ্ছে লৌকিক ঐতিহ্যের (Folk Tradition) অনুসৃতি। লেখক আত্মচিন্তার মাধ্যমে আমাদের লৌকিক সংস্কৃতির ও জীবনচর্চার সুমহান

ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করেছেন। আবার বর্তমানের সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকায়ত জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অধঃপতনের কথাও চিন্তা করেছেন ঃ তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল— তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।

শরৎচন্দ্রের এই গ্রামীণ ঐতিহ্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কত প্রখর এরই পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হয়েছে ঃ দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধূলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে দুঃখে বিপদে-সম্পদে হাসি কান্নায় ভরা ধূলা-বালির পথ তোমাকে বারবার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাল, মা জন্মভূমি। তোমার বহু কোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।

আসলে কোন লেখকই তাঁর দেশ ও দেশজ সংস্কারের উর্ধ্বচারী হতে পারেন না। যে পরিবেশের মধ্যে লেখক তাঁর জীবনরসকে পরিপুষ্ট করে তোলেন সেই দেশ ও সমাজের মানুষ তার আচার আচরণ, ভাললাগা মন্দ লাগা সংস্কার কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোন কিছুকে অতিক্রম করতে ত' পারেন না বরং এসবের মধ্য থেকেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রাণরস পরিস্ফুট করে তোলেন আবার যোগান দেন। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ-এর মধ্যে এ ধরণের লোকায়ত প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

তারাশঙ্করের মানসিকতায় গ্রাম্যজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি। গ্রাম্য মানুষ, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পূজাপার্বণ, সংস্কার, ছড়া, প্রবাদ, গানে পরিপূর্ণ তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে লৌকিক প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে যেমন

অন্তঃসলিলা গুপ্তপ্রায় ফল্গুধারার মত তারাশঙ্কর ঠিক তার বিপরীত। লৌকিক মানসিকতা তারাশঙ্করের জীবনসম্পৃক্ত। লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের জীবনদর্শন। তাই গ্রাম্যজীবনও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে তারাশঙ্করের ভাবমানসিকতাটিকে বোঝা সম্ভবপর নয়। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম থেকে শুরু করে কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, রাধা পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হয়ে চলেছে গ্রামীণ লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি বিচার করলে এর যাথার্থ্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

তারাশঙ্করের মধ্যে সর্বত্রই এই লোকশ্রুতির (Folklore) চিহ্ন। লৌকিক ইতিকথায়, পুরাকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে তারাশঙ্করের গণদেবতা একটি লৌকিক প্রভাবের অভিধান। ধর্মঠাকুর বাংলাদেশের একটি লৌকিক গ্রাম্যদেবতা। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে অজস্র এই লোকদেবতার অধিষ্ঠান, আর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে আছে অজস্র লৌকিক কাহিনী, লোকশ্রুতির বহু পরিচয়। 'গণদেবতার' একস্থানে তারই পরিচয়ঃ হরিজনপল্লীর মজলিসের স্থান ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুল-গাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল। কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্য গর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথাও কোন গাছকে কেউ জীবিত দেখিয়াছে। গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। আশেপাশের ছায়াবৃত বারোমাস পরিচ্ছন্নতায় তক্‌তক্‌ করে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাদুলী দিয়া যায়, সেই মাদুলী-গুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়, হামদু সেখ সেই খানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল।

বাংলাদেশের গ্রামদেবতার স্থানগুলি সমস্ত রকম সংস্কার বর্জিত লৌকিক ধর্মের এক আশ্চর্য কেন্দ্রভূমি। ধর্মঠাকুরের যে পীঠস্থানটি লেখক বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে অস্পৃশ্য হিন্দু থেকে আরম্ভ করে মুসলমান পর্যন্ত সকলের প্রবেশাধিকার আছে। এই দেবস্থানটি যেমন হরিজন পল্লীর মজলিসের

স্থান, ঠিক তেমনি হামদ্ সেখের মত মুসলমান বণিকের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। লৌকিক ধর্মের এই সমন্বয় এবং মিলনের রূপটি তারাশঙ্কর খুব ভাল-ভাবেই জানতেন। তাই তাঁর উপন্যাসের বহু জায়গায় এই লৌকিক রীতি-নীতির ধর্মীয় সমন্বয়টি সত্যরূপে স্পষ্ট।

নবান্ন গ্রাম-সমাজে একটি লোক-উৎসব, এটিকে শস্য পরবর্তী উৎসব (Post-harvasting festival) বলা যেতে পারে। নবান্ন বাংলাদেশের একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব (Folk Festival)। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান তাই নবান্ন একটি শ্রেষ্ঠ কৃষি উৎসব। গণদেবতায় সেই গ্রাম্য উৎসবের স্মৃতিমুখর সেই নবান্ন উৎসবের আয়োজন 'নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল, সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে বেহুলার দল বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে, সেই দলের গান হইবে।"

ডাইনী বিদ্যা (witch-craft) বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীরই একটি লোকবিশ্বাস (Folk belief)। ইউরোপীয় নাট্যকারগণের নাটকে ও অন্যান্য সাহিত্যধারার মধ্যে এই ডাইনী বিদ্যার নানা পরিচয় ও প্রভাব আছে। এই বিশ্বাস যে লোকস্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে জনজীবনের স্তরে স্তরে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার পরিচয় তাঁর সাহিত্য পাঠ করলে বেশ স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। রাধা উপন্যাসের প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট এ আখড়া হল লোহার লোহার বাসর ঘরের চেয়েও নিরাপদ। এর উপরেও লোক-বিশ্বাস যে ঃ

'কৃষ্ণদাসী নিজে অনেক সিদ্ধবিদ্যা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিদ্যা জানতো। কৃষ্ণদাসীকে সে বিদ্যা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কিন্তু এসব বিদ্যা দেওয়া যায়। কৃষ্ণদাসী ঘর বন্ধন জানে অঙ্গ-বন্ধন জানে। যাবার আগে এক মুঠো সরষে হাতে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে, এই সরষের গণ্ডী লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠবে এক একটা সাপ। গণ্ডীর ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীর অঙ্গ-বন্ধন করে দিয়ে যাবে। সে অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে যাবে।

এই ডাকিনী বিদ্যা, ঘর বন্ধন, অঙ্গ-বন্ধন, সরষে নিয়ে মন্ত্র পড়া ও

গণ্ডী দেওয়া, প্রত্যেক সরষের সাপে রূপান্তর, এ সমস্ত আদিম ও লৌকিক বিশ্বাস থেকে অদ্ভূত হয়ে আধুনিক জনমানস ও সাহিত্যের মধ্যেও যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এ তার জীবন্ত উদাহরণ।

বাংলাদেশে সর্প অভিপ্রায় আদিমবিশ্বাস-জাত। সর্পদেবী মনসা বাংলা দেশে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পূজিত লৌকিক দেবী। সর্প সম্পর্কিত বহু লৌকিক বিশ্বাস ব্রতকথা, উপকথা ইতিকথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনীর সর্বত্র এই সর্প সম্পর্কিত কাহিনী, উপকাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কার, লৌকিক ও অতি লৌকিক কথা পরিব্যাপ্ত। তারাশঙ্কর কল্লোল যুগের লেখক। এ যুগের লেখকদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল একেবারে সমাজের নীচু স্তরে যে অসংখ্য মানুষের জীবন প্রবহমান, যে সংস্কার-কুসংস্কার, যে আদিম বিশ্বাসের মধ্যে তারা জীবন অতিবাহিত করে তার সবটুকু তুলে ধরতে হবে সাহিত্যের মধ্যে।

তারাশঙ্কর এই জীবন ও মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, ঘনিষ্ট-ভাবে। ফলে তাদের জীবনকে তুলে ধরেছেন গণদেবতায়, কবিতে, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়, নাগিনী কন্যার কাহিনীতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিংশশতকের সংগ্রামী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দুটি উপন্যাস পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) এবং পদ্মা নদীর মাঝি স্মরণীয়। তারাশঙ্করের পূর্বেই আঞ্চলিক জীবনচর্চা, লোকায়ত সংস্কার লৌকিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দরিদ্রতম মানুষের জীবন সংগ্রামকে উপস্থিত করা হয়েছে। তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাস রাইকমল ১৯৩৫ এ প্রকাশিত হলেও আধুনিক জীবনসমস্যা ও যুগযন্ত্রণার রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যাকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে, নাগরিকতা দ্বারা আবিষ্ট হয়েও, মানব মনের সুগভীর রহস্যের মাঝে পদচারণা করলেও লৌকিক ঐতিহ্য ছিল তাঁর অন্তরের গোপন কেন্দ্র। সচেতন নাগরিকবিদগ্ধতার মাঝখানেই মাঝে মাঝে লৌকিক মানসিকতার প্রতিফলন হয়েছে। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে লৌকিক জীবনাচরণের কথা উপস্থিত আধুনিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও গ্রামীণ জীবন ধারার যে একটা খুব বেশি বদল হয়নি, গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব লৌকিক সংস্কার, কুসংস্কার আচার আচরণ ইত্যাদি নিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকেই গ্রামের ছেলে শশী ডাক্তার এক নূতন

দৃষ্টিতে দেখেছে এবং পর্যালোচনা করেছে। পঞ্চানন চক্রবর্তীর জিজ্ঞাসায় শশী যখন উত্তর দিল 'ভূতো এই মাত্র মারা গেল', তখন চক্রবর্তী মশাই বলতে শুরু করলোঃ "বটে? বাঁচল না বুঝি ছেলেটা? তবে তোমাকে বলি শোন শশি, ভূতো যেদিন আছাড় খেলে। দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি,—যা ভেবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে বারবেলাও হয়েছে খতম। লোকে বলে বারবেলা কি সবটাই সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা। বারবেলা ছাড়ছে। পায়ে কাঁটাটি ফুটলে দুনিয়ে উঠে অক্যা পাইয়ে দেবে—নবীন জেলের বড় ছেলেটাকে সেবার কুমিরে নিলে, সেদিনও বিষ্যুদবার, সেবারেও ছেলেটা খালে নামল, বারবেলাও অমনি ছেড়ে গেল, গাও দিয়ার খালে নইলে কুমির আসে?"

খালের কুমির শুধু নয়, ভূতোর কথায় ভূতের কথাও এসে পড়লো। 'শশী ভাবলো, এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্চর্য ছিল। কারো স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারাগুলি একসুরে বাঁধা। সুখ দুঃখ এক, রসনাভূতি এবং ভয় ও কুসংস্কারে এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারো চেয়ে এতটুকু ছোট অথবা বড় নয়।'

লোক-মানসিকতার এই প্রধান লক্ষণগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য-ভাবে ধরতে পেরেছিলেন, তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন তাঁর উপন্যাসের মধ্যে।

"পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসের মধ্যেও আছে আঞ্চলিকতা এবং লৌকিক বিশ্বাস, মেলা পার্বণের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পদ্মার তীরবর্তী মাঝি ও জেলেদের জীবন সংগ্রামের সার্থক রূপচিত্র। এদেশের মানুষের পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি প্রধান উপজীবিকা। কেউ মাছ ধরে কেউ মাঝিগিরি করে। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা পিপাসায়। কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়, আর দেশী মদে, এরই মাঝখানে প্রবাহিত এদের জীবন ধারা। ঔপন্যাসিক এর মধ্যে এদের লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি তুলে ধরেছেন। রথ উপলক্ষে গ্রাম্য মেলার একটি সুন্দর রেখাচিত্র উপস্থিত করেছেনঃ রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উল্টা-রথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।...গ্রাম্যবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়...কাপড়ের দোকান, মনোহরী দোকান, মাটির খেলনার

দোকান। খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। গোরু ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁঠাল ও আনারসে মেলার একটি দিক ছাইয়া যায়। (মানিক গ্রন্থাবলী ১৩৭৬ পৃঃ ৪৩)

মেলার প্রভাব এই সব গ্রামীণ মানুষদের কিরূপ অসাধারণ ঔপন্যাসিক তারও বর্ণনা উপস্থিত করেছেন ঃ বোবা হাসি মুখে লাল পাছাপাড় শাড়ী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নূতন কাঁচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাঁচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলে মেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে।

গান পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম। লোকসঙ্গীত ও লোকজীবন...একত্রে সুগ্রথিত, তাই হোসেন মিয়া গান গায় ঃ

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফ্যারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইয়া
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রূপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না। (পৃঃ ৬৭)

আবার কখনও গায় ঃ

পিরীত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ-লো-সই।
আগুন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ, আ-লো-সই ঃ
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ, আ-লো-সই !

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গ্রাম্য জীবন ও গ্রামীণ মানুষের ঔপন্যাসিক, সুতরাং তাঁর উপন্যাসগুলিতে লৌকিক জীবন ধারার ছবি থাকবে এতো স্বাভাবিক কথা। লৌকিক সংস্কার, আচার-আচরণ, কথা উপকথা, উৎসব অনুষ্ঠান-এর বহু পরিচয় আছে তাঁর উপন্যাসে। আরণ্যক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে এই লৌকিক মানসিকতার পরিচয় আছে। লেখক বলেছেন। 'গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা ইত্যাদি ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর যে সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য।...গনু আমাকে যে গল্প বলিত তাহা রূপকথা নহে। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়।'

অরণ্য আদিমতার মাঝে নানা শ্রেণীর বনদেবতা। বিভূতিভূষণ এরকম এক দেবতার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন ; টাঁড়বারো হচ্ছে বুনো মহিষের দেবতা। সাঁওতাল বুড়োর কথায় শোনা যাক ঃ তারপর কি হ'ল শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গা কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম। তারা এগিয়ে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল। গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের দশহাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা মূর্ত্তি যেন মনে হ'ল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে, বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে এদিক ওদিক পালাল। ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এলনা একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।' (পৃঃ ১৪৭) পথের পাঁচালী, উপন্যাসটি লোকায়ত জীবনধারার সমস্ত পরিচয় বহন করে আছে। পথের পাঁচালী উপন্যাসে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লৌকিক উপাদান ও লৌকিক ঐতিহ্যের স্পর্শ।

শরৎচন্দ্র ও পুনর্বীক্ষণ

ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়

এক

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব আকস্মিক এবং জনবন্দিত। সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনের এই বিরল সৌভাগ্য অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকেরও ঈর্ষার বস্তু হ'তে পারে। শরৎচন্দ্র অধিকন্তু লাভ করেছিলেন তৎকালীন তরুণ সাহিত্যব্রতীদের শ্রদ্ধিত উচ্ছ্বাস। সাধারণভাবে যাঁরা চিহ্নিত 'কল্লোলীয়' বলে, তাঁরা কবিতায় যেমন গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম এবং কতকাংশে মোহিতলাল মজুমদারকে—কথাসাহিত্যে তাঁদের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন শরৎচন্দ্র। কল্লোল-যুগের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাবকে বরণ করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্রুত প্রতিভাকেও শরৎচন্দ্রের একষট্টিতম জন্মদিনের অভিভাষণে বলতে হয়েছে—"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান-পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি।"

সাহিত্যালোচনায় সহজ সূত্রসন্ধান নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, কিন্তু আকস্মিক আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই বিপুল জনবন্দনার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে পূর্বসূরিদের সঙ্গে তাঁর প্রতিভার পার্থক্য বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য না করে উপায় নেই। বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মর্যাদা নির্দ্বিধায় আজও অমলিন, কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে নির্মোহ দৃষ্টিতে কলাকৈবল্যবাদের সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি ছিল বহুলাংশে নীতি নিয়ন্ত্রিত—বস্তুত 'ঊনবিংশ শতকের পুরুষোত্তমে'র পক্ষে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাঁর মতে 'চিত্তশুদ্ধি জনন।' সেই

কারণে তাঁর উপন্যাস-সংসারের মানুষগুলি অনেকক্ষেত্রেই ছিল Ethical man। সাধারণ মানুষের প্রবেশের অধিকারও সেখানে ছিল না। তাঁর উপন্যাস-বৃত্তে আবদ্ধ ছিল কিছু রাজবংশীয় অথবা অভিজাত পুরুষ—সামাজিক উপন্যাসেও 'মহাধনবান ব্যক্তি' ব্যতীত অন্য কাউকে তিনি স্বাগত জানাননি। প্রথম দুটি উপন্যাসের কথা বিস্মৃত হতে পারলে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য সাধারণ মানুষের দ্বারোন্মোচনের জন্য সাধুবাদ জানাতে হবে। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসের পটভূমিও শহর কলকাতা। কিন্তু একটু সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাঁর উপন্যাস পাঠ করলেই বোঝা যাবে, যাদের তিনি উপন্যাসের জগতে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাধারণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বের প্রাখর্যে ও বৈচিত্র্যে তারা অনেকেই ঠিক 'সাধারণ' নয়। আসলে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টিই তাদের অসাধারণ করে তুলেছে। নীতির প্রশ্ন তাঁর কাছে বড় ছিল না, কথাসাহিত্যে তিনি মানুষের মধ্যে 'পূর্ণ মানুষের' সন্ধান করেছেন। পূর্ণত্বই মানুষকে সুন্দর করে, খণ্ডিত মানুষই অসুন্দর—এই ছিল তাঁর জীবনদৃষ্টি, যাকে ইংরেজি বিশেষণে ভূষিত করলে বলা যায় Aesthetic জীবনদৃষ্টি। বলা বাহুল্য; এই দৃষ্টি যতটা ভাবময় ততটা তন্নিষ্ঠ নয় এবং রবীন্দ্রদর্শনের পরিশীলন চরিত্রগুলিকে সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যের এই প্রেক্ষাপটেই আবির্ভূত হয়েছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কলমে যেসব চরিত্র সাহিত্য-সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে তারা প্রকৃত অর্থেই সাধারণ মানুষ। ইতিহাসের দূরত্বে তাদের ওপর রোমান্সের রহস্যাচ্ছাদন নেই, সামাজিক আভিজাত্যের দুর্মর ব্যবধান নেই, বিশেষ জীবনদৃষ্টির রঞ্জকেও তারা আবৃত নয়। ব্যবহারিক জীবনের স্খলন-পতন, দোষগুণ ও যাবতীয় দুর্বলতা নিয়ে পাঠকের পরিচিত জগৎ থেকেই তারা উঠে এসেছে এবং সহজ সরল ভাষায় তাদের কাহিনী পরিবেষণ করতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র। অধঃপতিত ও স্খলিত চরিত্র পরিস্ফুটনে যে রীতিসিদ্ধ নৈতিক সতর্কতা ছিল, তাও তিনি বর্জন করেছেন। মেরুদণ্ডহীন, মদ্যপ, ভবঘুরে এবং লম্পট চরিত্রকে যেমন তিনি নায়কের ভূমিকায় স্থাপন করতে পেরেছেন, পতিতা নারীকেও সেইভাবে ব্যক্তিত্ব দান করেছেন বিনা দ্বিধায়। রোহিনীর সমগোত্রীয় চরিত্র সৃষ্টি করবার সময় তাকে 'রাক্ষসী' আখ্যা দেবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি, শৈবলিনীর মত দ্বিচারিণী নারীর চরিত্র-

আখ্যানে তাঁর লেখনী কলংকময় হয়ে উঠেছে—এ কথাও কখনও বলেন নি। এখানেই তাঁর জীবনদৃষ্টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলির প্রতি সহানুভূতি এবং ভালবাসাই এদের সজীব হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সামাজিক দৃষ্টিতে পতিত চরিত্রগুলির ওপর তাঁর মমত্ব ও ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। আসলে, ভালবাসাই সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ ঘুচিয়ে দেয়—কারণ প্রেমের দৃষ্টিতে অসুন্দর বলে কিছু নেই; সেখানে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অধঃপতিত সকলেই সুন্দর। প্রধানত এই কারণেই তিনি জনবন্দিত এবং সাহিত্যব্রতী ও সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত। অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন, পল্লীসমাজের প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটনের সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে—এমন কি কল্লোল-যুগের তরুণ সাহিত্যিকেরা তাঁকে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের প্রথম উদ্‌গাতা হিসাবে স্বীকার করে নিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

দুই

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। উত্তরকালে তাঁর রচনার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে তাঁর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করার উৎসাহ ও সামর্থ্য অনেক সমালোচকের মধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, এই ধরনের বিশ্লেষণী সমালোচনার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার স্বপক্ষে রায় দেয়নি। বাস্তবতাবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ জগদীশ গুপ্ত 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে তাঁর প্রতিভার যে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়' প্রবন্ধে তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, বাস্তব চরিত্রচিত্রণের এবং যুক্তিনিষ্ঠ কাহিনী কথনের কোন ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রচিত্রণে যুক্তি ও স্বাভাবিকতার অভাব শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই ধরা পড়ে। সাম্প্রতিককালের জনৈক শক্তিমান সমালোচক 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যক্তি-জীবনের ন্যায়-শৃঙ্খলার অভাব যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁর পুত্রের কি সম্পর্ক ছিল, শরৎচন্দ্র একবারও তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি—তাঁদের একটি সাক্ষাৎকারও উপন্যাসে নেই; অথচ রমা এবং রমেশের জীবনের যে-কোন সমস্যা সমাধানে তাঁর আগ্রহ ও ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল। রমার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের ওপর সামাজিক

বাধার আতিশয্য হয়ে উঠল প্রকট, অথচ জ্যাঠাইমার ক্ষেত্রে সে বাধার অস্তিত্বই বোঝা গেল না।

শরৎচন্দ্রকে বস্তুনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না তাঁর নায়ক-নায়িকা পরিকল্পনার বিশেষ ছকের জন্য, এ কথাও বর্তমানকালের সুধী সমালোচক বলেছেন। তাঁর নায়ক চরিত্রগুলির একটি বিশেষ প্যাটার্ন বা ছক আছে—তারা বেশির ভাগই সংসার সম্বন্ধে নিরাসক্ত, ভবঘুরে বা ছন্নছাড়া, আপনভোলা এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ অজ্ঞ। বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত চরিত্রের কোন বিশেষ ছক থাকে না, তারা একটি শ্রেণীর পরিচয় দেয় না – ব্যক্তিমানুষ হিসাবে অন্তত তারা হয়ে থাকে পৃথক। যখন এই পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে আসে তখন স্বভাবতই মনে হতে পারে, চরিত্রগুলি যতটা উদ্দেশ্য-প্রসূত ও কল্পনা-নির্ভর, ততখানি বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।

শরৎচন্দ্রের নায়িকা-চরিত্র সম্বন্ধে একটি মূল্যবান আবিষ্কার করেছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি লক্ষ্য করেছেন, নারীর সতীত্ব এবং নারীত্ব যে দুটি পৃথক সত্তা– এটি শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে লক্ষণীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। শরৎচন্দ্র যে সত্যই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, গোপালচন্দ্র রায় রচিত 'শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড) গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এক অভিভাষণ তা সমর্থন করবে—"দিদির হয়ত সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্বও থাকবে না কেন?...এই বালবিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না-ই পেরে থাকে তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই পাবে না?"

কিন্তু নারীর প্রতি মমতা ও ভালবাসার উপলব্ধ এই সত্য উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েও শরৎচন্দ্র একজাতীয় ছকের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন। নারীত্বের বিচারে বড় কিনা তার মীমাংসায় সতীত্বের প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর, এ কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু নারী-ব্যক্তিত্বে বড় হলেই তাকে সতীত্বের মাপে খাটো হতে হবে—এই প্যাটার্নকেও মেনে নেওয়া যায় না। অথচ 'আঁধারে আলো'-র বিজলী, 'গৃহদাহ'-র অচলা, 'শ্রীকান্ত'-র রাজলক্ষ্মী ও অভয়া বা 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী ও কিরণময়ী—কেউই এই ছকের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

পারিবারিক যেসব স্নেহ সম্পর্কের উপস্থাপন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম

প্রধান কারণ, উত্তরকালের সমালোচক সেগুলির মধ্যেও অভিভূত হবার মত কোন সাহিত্যিক মহত্ত্ব লক্ষ্য করেননি। তাঁর মতে, স্বামী-স্ত্রী, মা ও ছেলে এই ধরনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদেই শিল্পীর গভীর পরীক্ষা; অথচ শরৎচন্দ্র এই ধরনের সম্পর্ক পরিহার করে প্রায়শই পরোক্ষ সম্পর্কে বেশি আগ্রহী। 'বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি' প্রভৃতি গল্প তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অসামাজিক প্রেমকে শরৎচন্দ্র প্রথম বলিষ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন, এ কথাও সমালোচক স্বীকার করেন না। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের নিষিদ্ধ প্রেমের নায়িকারা রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রের আদর্শেই গঠিত বলে তিনি মনে করেন। বস্তুত, এই ধরনের প্রেমাখ্যানে রোহিণী-বিনোদিনী ও শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যে এক সূত্রে বাঁধা, সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণে এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই জাতীয় প্রেমের কাহিনীতে তিনি একধরনের রহস্যময়তা সৃষ্টি করে সম্পর্কগুলিকে অত্যন্ত অস্পষ্ট রেখেছেন। এই রহস্যময়তা চরিত্রের জটিল অনুধ্যানের জন্য ঘটেছে, একথাও স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, চরিত্রের আচরণ যেখানে রহস্যময় হয়ে পড়েছে সেখানেই তা সংগতি হারিয়েছে। মনোজগতের গভীরতর বা অবরুদ্ধ কোন প্রবণতা দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে রহস্যময়তা তাঁর অসামাজিক প্রেমমূলক উপন্যাসের উপজীব্য তাকে মহৎশিল্পী জনোচিত রহস্যময়তার সৃষ্টি বলা চলে না।

পল্লীসমাজ তার বাস্তব চেহারায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ধরা পড়েছে,—এ কথাও নির্দ্বিধায় বলা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে এবং কয়েকটি ছোটগল্পে সমস্যার মূল কারণটি যেভাবে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছেন, শরৎচন্দ্রের রচনায় সে প্রয়াস দেখা যায় না। পল্লীসমাজের লোকগুলি সংকীর্ণমনা ও নীচ—তারা সৎ হলেই সমস্যার সমাধান, অথবা শিক্ষার আলো ছড়ালেই তারা সচেতন হবে—এতো সরলভাবে এ সমস্যার সমাধান হয় না। তৎকালীন যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্য প্রাচীন পল্লীসমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি সংবদ্ধ থাকতে পারে নি, এবং যে ভূমি-ব্যবস্থার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দুর্মোচনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার বোধ না থাকলে এই সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার প্রভৃতির যে

চিত্র শরৎচন্দ্র উপস্থিত করেছেন সেই চিত্রগুলির উপস্থাপনে সহানুভূতি ও মমত্বের যে আন্তরিকতা আমরা খুঁজে পাই, তার প্রতিকারের যুক্তিতে সে আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায় না।

এক কথায়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উত্তরকাল কিছুটা সন্দিগ্ধ। বর্তমানকালের সমালোচক তাঁকে বাস্তবনিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকার করেন না, কাহিনীগ্রন্থনে ও চরিত্র পরিস্ফুটনে নৈয়ায়িক শৃংখলার অধিকারী বলে মনে করেন না, নিষিদ্ধ প্রেমের বলিষ্ঠ রূপকার হিসাবেও স্বীকৃতি দেন না। সামাজিক সংস্কার ও রীতিনীতির সম্যক্ জ্ঞান ব্যতিরেকে এ জাতীয় সমস্যার উত্থাপন তিনি করেছেন—এ অভিমতও উত্তরকালের। এইসব আলোচনা থেকে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে একালের বিচারে শরৎচন্দ্র একজন সত্যভ্রষ্ট লেখক।

তিন

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উত্তরকালের সমীক্ষার যৌক্তিকতা অনেকাংশে স্বীকার করে নিয়েও বলতে পারা যায়, তাঁর প্রতিভার সার্থক মূল্যায়ন এতে ঘটেনি। পূর্বাপর নেতিবাচক সমালোচনা কখনোই আদর্শ সমালোচনা হতে পারে না, কারণ তাতে সমালোচ্য ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় কিছুই জানা যায় না। শরৎচন্দ্র কি ছিলেন না, তাঁর প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণে তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, তিনি কি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িককাল যদি তাঁর সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিচার করে তবে তার দায় যেমন তিনি নিজে বহন করতে বাধ্য নন, উত্তরকালে সেই ভ্রান্তির নিরসনও তেমনি তাঁর প্রতিভার প্রকৃতিকে বিকৃত করতে পারে না। তাঁর প্রতিভার সত্য প্রকৃতি উদ্ঘাটনই উত্তরকালের সমালোচনার যথার্থ লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে মূল্যবান উক্তিটি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমনি করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

সাহিত্যসাধনায় শরৎচন্দ্র হৃদয়বাদী, সম্ভবত এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। হৃদয়ের রহস্য সন্ধানে যে চাবিকাঠি ছিল তাঁর সম্পদ তার এক নাম ভালবাসা, অন্য নাম সহানুভূতি। তিনি বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন না বলে

বিরক্তি প্রকাশের যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি এ ব্যাপারে তাঁকে সত্যভ্রষ্ট মনে করাও নিতান্ত অযৌক্তিক ও অশোভন। বস্তুর সত্য যেমন সত্য, হৃদয়ের সত্যও তাই। মস্তিষ্কের অবলম্বন বুদ্ধি, হৃদয়ের অবলম্বন আবেগ —এর কোনটাই অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া অর্থহীন। মনোবিজ্ঞানের মতে, আবেগ মানুষের মনের অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় সামগ্রী—এর অস্তিত্বও প্রমাণিত সত্য। ভৌগোলিক মানচিত্র যদি কোন অঞ্চলের সত্য পরিচয় হয়, আবেগের মানচিত্রও তাহলে ব্যক্তিহৃদয়ের সত্য পরিচয়—কারণ হৃদয়াবেগ-বর্জিত মানুষকে আমরা 'মানুষ' হিসাবেই স্বীকার করতে পারি না। মানুষের এই হৃদয়-রহস্যেই ডুব দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র এবং এই ক্ষেত্রে তিনি একান্ত সৎ ও আন্তরিক। ব্যক্তিহৃদয়ে আবেগের সূক্ষ্ম কম্পনগুলি তাঁর অনুভূতিশীল অন্তরে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং হৃদয়-রহস্যের সুনিপুণ রূপকার হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেগুলি তিনি পরিস্ফুট করেছেন তাঁর সাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যকে আবেগতাড়িত বা 'মানুষের ইমোশন্যাল প্রতিরূপ' আখ্যা দিয়ে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা মনে করা অসংগত হবে; কারণ আবেগ নিয়ে তিনি বিলাসিতা করেননি, তাকে তিনি তার সত্যমূল্য দিয়েছেন। এই কথাটি স্মরণ রাখলেই তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগের উত্তর পাওয়া যাবে।

জগদীশ গুপ্তের অভিযোগ, শরৎচন্দ্র কাহিনীবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে যুক্তিনিষ্ঠা অগ্রাহ্য করেছেন। জগদীশ গুপ্তের মত নির্মোহ বস্তুতান্ত্রিকের পক্ষে এ কথা বলা স্বাভাবিক, কারণ তাঁর নিজের রচনা বুদ্ধিনির্ভর। কিন্তু বুদ্ধির প্রকাশ যেমন যুক্তিতে, হৃদয়ের প্রকাশ তেমনি আবেগে। হৃদয়-নির্ভর সাহিত্যিক যুক্তির ওপর ততটা নিষ্ঠাবান হতে পারেন না, যতখানি নিষ্ঠা তাঁর আবেগের অনিবার্য উৎসারণের ওপর। মানুষের যে আচরণ আবেগসম্ভূত, অনেক সময়ই তার কোন যুক্তি নেই। যুক্তির সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক প্রায় বিপ্রতীপ। সেইজন্যই, কোন আবেগনির্ভর সাহিত্যিকের রচনা যুক্তিহীন—এই নেতিবাচক সমালোচনা প্রকৃত সমালোচনা হতে পারে না।

নায়ক-নায়িকার চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার মূলে আছে তাঁকে বস্তুনিষ্ঠ মনে করার ভ্রান্তি। এ ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র হৃদয়াবেগকে মূল্য দিয়েছেন বেশি। আমাদের দেশে পুরুষের আদর্শ

উদাসীন, সংসার-নিস্পৃহ মহাদেব—এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন। সুতরাং হৃদয়সংবাদী লেখকের অজানা থাকবার কথা নয় যে, এই ধরনের ভবঘুরে ও নিরাসক্ত মানুষের প্রতিই নারী-হৃদয়ের আকর্ষণ অনেক বেশি। সুতরাং বিস্ময়ের কোন কারণই থাকা উচিত নয় যখন দেখি ভবঘুরে ও উদাসীন নায়কেরা তাঁর উপন্যাসে বার বার পোষাক পরিবর্তন করে আবির্ভূত হয়; কিম্বা নায়িকাদের, বলা বাহুল্য, পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি উদ্রেক করবার জন্য একই ছকের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হয়।

হৃদয়-রহস্যের গভীরে ডুব দেওয়ার জন্যই শরৎচন্দ্র মানুষের আবেগ-বিহ্বলতার প্রকৃতি সম্যক্ অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন, যে সম্পর্কের মধ্যে স্নেহবন্ধন স্বাভাবিক, মানুষের মনোভূমিকে তা সবিশেষ আলোড়িত করতে পারে না। পক্ষান্তরে যেখানে তা প্রত্যাশিত নয়, পাঠকের হৃদয়াবেগকে তা স্বল্প আয়োজনেই উচ্ছ্বসিত করতে পারে। সুতরাং হৃদয়ের কারবারী এই সাহিত্যিক যদি পরোক্ষ সম্পর্কগুলিকেই বেশী আকর্ষণীয় মনে করে থাকেন তাহলেও তাঁর সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা উচিত নয়, কারণ এই ধরনের সম্পর্কের মূল্যও হৃদয়ের কাছে কম নয়।

যে কারণে 'অসামাজিক প্রেমের স্বীকৃতিতে শরৎচন্দ্র বলিষ্ঠ নন', এ কথা বলার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলে আমাদের মনে হয় না, ঠিক সেই একটা কারণে 'একটি বিধবারও বিবাহ তিনি দেখাতে পারেন নি'—এই জাতীয় উক্তিও আমরা অর্থহীন মনে করি। কারণটি এই যে, শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের নায়ক-নায়িকাদের প্রেমাকর্ষণের প্রকৃতি বেশ রহস্যময়, কারণ· প্রেম যেখানে আবেগনির্ভর সেখানে তা স্পষ্ট হতে পারেনা তার মধ্যে অনেকখানি আলো-আঁধারি রহস্যময়তা আছে বলেই তা আকর্ষণীয়। হৃদয়ের এই গভীর গোপন সংবাদ জানেন বলেই নায়ক-নায়িকার মধ্যে রহস্যের এই ঘেরাটোপ তিনি রাখতে চান। এতে বিহ্বল মস্তিষ্ক বিচলিত হতে পারে, কিন্তু যে প্রেমসম্পর্কের জন্মই যুক্তিহীনতায়—তার বিবর্তনে যুক্তিনিষ্ঠার ভূমিকা কতটুকু! বুদ্ধির দীপ্তি হৃদয়ারণ্যের কতটুকু অংশই বা আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে!

পল্লীসমাজ বিষয়ে শরৎচন্দ্র যে শৌখীন মজদুরি করেননি এ বিষয়ে উত্তরকাল একমত। পল্লীসমাজের বিভিন্ন সমস্যার উপস্থাপনায় তিনি কখনোই অভিজ্ঞানের বাইরে কোথাও যাননি। সে কারণেই এই ধরনের

উপস্থাপন মহানুভব মমত্বে কিছু উপন্যাস এবং কয়েকটি আশ্চর্য ছোটগল্পে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সমস্যা সমাধানের কিছু ইঙ্গিতও শরৎচন্দ্র দিয়েছেন ; এবং সেখানেই তিনি তাঁর ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। ভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে তাঁর সীমা লঙ্ঘনের ত্রুটি সর্বাধিক ; নরনারীর প্রেম সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধিনিষ্ঠ মস্তিষ্ক চর্চা এই আবেগসিদ্ধ সাহিত্যিকের পক্ষে অনধিকার চর্চা হয়েছে। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু পল্লীসমাজের সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে যেসব সাহিত্যকৃতিতে সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। এই জাতীয় সৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত আছে তা কার্যকর নয় বলেই কি সৃষ্টি হিসাবে তারা অকিঞ্চিৎকর! সাহিত্যের সঙ্গে নীতির প্রশ্ন জড়িয়ে ফেলা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি হয়, তবে সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিকের জ্ঞান পরিস্ফুট হয়নি বলে শরৎচন্দ্র অভিযুক্ত হতে পারেন কি!

আসলে, একটি সত্য কথা স্বীকার করলে বলতে হবে, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উত্তরকালের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আর একটি সহজ কারণও আছে। জনপ্রিয়তা সাহিত্যিকের জীবনে কেবল আশীর্বাদ নয়, এখানে দেখতে পাই তার অভিশাপের দিকটি। শরৎচন্দ্রের আবেগতাড়িত জনপ্রিয়তাকে উত্তরকালের বুদ্ধিবাদী সমালোচক সন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করবেন, এটি অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য জনপ্রিয়তা সাহিত্যিক উৎকর্ষের মানদণ্ড—এ কথা আমরা কখনোই স্বীকার করিনা, কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক সর্বত্র অহি-নকুলও নয়। বরং অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, জনপ্রিয় সাহিত্যিক সাহিত্যসাধনায় যে কোন একটি ক্ষেত্রে সৎ ; এবং এই সততাই তাঁকে জনশ্রদ্ধিত স্থায়িত্ব দান করেছে। সেই কারণেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যাবতীয় বিরূপ সমালোচনা আত্মস্থ করেও তাঁকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর বহুপঠিত কোন উপন্যাসও পুনর্বার পড়তে আরম্ভ করলে আমাদের তা শেষ করতে হয় ; বলা বাহুল্য, আগ্রহসহকারেই।

শরৎ সাহিত্যের অনুবাদ পঞ্জি

প্রদীপ চৌধুরী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) কেবলমাত্র বাঙালীদের প্রিয় লেখক নন, তিনি নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় লেখকদের একজন। ভারতের প্রায় সকল বিশিষ্ট ভাষাতেই তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। এমন কি ন'টি বিদেশী ভাষাতেও কিছু রচনার অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মোট ২২-টি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো। আশা করি উল্লেখিত পঞ্জি (নির্বাচিত) থেকে প্রমাণ করা যাবে যে, শরৎ-সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালী লেখকের গ্রন্থের এত ব্যাপক অনুবাদ এবং তার প্রসার ঘটেনি। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ একই ভাষাতে একাধিক অনুবাদকের দ্বারাও অনূদিত হয়েছে। আমরা আশা রাখি, বর্তমান গ্রন্থপঞ্জিটি একাধিক কারণে শরৎচন্দ্র-অনুরাগী এবং গবেষকদের সহায়ক হবে। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি কারণ উল্লেখিত হলো ঃ (১) কোন একটি গ্রন্থ কোন্ কোন্ ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তা' খুব সহজেই পাঠকেরা জানতে পারবেন। যা' ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন গ্রন্থপঞ্জিতে এতটা সহজলভ্য করে তোলা হয়নি। (২) কোন একটি ভাষায় একই গ্রন্থের একাধিক অনুবাদ থেকে বোঝা যাবে, সেই ভাষার লোকেদের কাছে গ্রন্থটির প্রভাব কতটা। (৩) পাঠকেরা অনুমান করতে পারবেন যে ভারতবর্ষ তথা কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র শরৎচন্দ্রকে বিশিষ্ট লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। (৪) আমাদের দেশের বহুভাষী সমাজে ভাবগত ঐক্যের সহায়ক হবে। (৫) পঞ্জিটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে, শরৎচন্দ্র কোন কারণেই আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সাহিত্যিক ছিলেন না। বরঞ্চ বলা চলে, তাঁর কোন কোন সাহিত্যে সার্বজনীনতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বিদেশী পাঠকের কাছে শরৎ-সাহিত্য পৌঁছে দিতে হলে যে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সে প্রচেষ্টা এখনো আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তবে আশা রাখি, একদিন নিশ্চয় বিশ্ব-সাহিত্যের আঙিনায় শরৎ-সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান করে নেবে।

বিন্যাস প্রসঙ্গ

মূলগ্রন্থ কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। তার সাথে কোন্ পত্রিকায় তা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা-ও উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে হয়তো, গবেষকরা শরৎ-মানস বিবর্তনের পরিচয় পেতে পারেন। তবে 'শ্রীকান্ত'-র চা'রটি পর্ব বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হলে-ও প্রথম পর্বের প্রকাশকালের সঙ্গে অন্য ৩-টি পর্ব'ও উল্লেখিত হয়েছে। বিন্যাস কালানুক্রমিক রাখার দরুণ গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি আলাদাভাবে সাজানো হয়নি। আশা করি, গ্রন্থের গঠন বিভাগ (form division) বুঝতে অসুবিধা হবে না। প্রতিটি মূল গ্রন্থের পরে সেই গ্রন্থের অনুবাদগুলি ভাষার বর্ণানুক্রম অনুসারে উল্লেখিত হয়েছে। যাতে কোন পাঠক শরৎচন্দ্রের কোন একটি গ্রন্থ কোন একটি ভাষায় ক'টি করে প্রকাশিত হয়েছে জানতে পারেন। অনুবাদের সংলেখতে (entry) যে সমস্ত তথ্য পরিবেষণ করা হয়েছে, তা' হলো : ১. অনূদিত গ্রন্থের নাম, সংস্করণ সহ; ২. অনুবাদক এবং সম্পাদকের নাম; ৩. প্রকাশ স্থান; ৪. প্রকাশক; এবং ৫. প্রকাশের তারিখ। প্রয়োজনবোধে কিছু তথ্য; যেমন প্রথম প্রকাশের তারিখ; ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সংযোজিত কোন একটি গল্পের আলাদাভাবে অনুবাদ হলেও মূলগ্রন্থের সাথে তা' উল্লেখিত হয়েছে। প্রতিটি সংলেখ খুবই সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হ'লো তিনটি : (১) স্থানাভাব; ২) দ্রুত সংকলনের তাগিদ; এবং (৩) গ্রন্থের প্রকাশকাল ও অন্যান্য কয়েকটি তথ্যের অনুল্লেখ। এমন কিছু অনূদিত গ্রন্থ পাওয়া গেছে, যেগুলি শরৎ-সাহিত্যের অনুবাদ হলেও মূল গ্রন্থের নাম জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই এ ধরণের গ্রন্থগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেনা-পাওনা' 'পল্লী-সমাজ' ও 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যথাক্রমে 'ষোড়শী', 'রমা' এবং 'বিজয়া' নামে। এই নাটকগুলি অনূদিত হলেও মূলগ্রন্থের (অর্থাৎ উপন্যাসের পরে উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে, অনূদিত রচনাবলী, প্রবন্ধ সংগ্রহ ইত্যাদি (যেগুলি কোন নির্দিষ্ট বাংলা মূলগ্রন্থের অনুবাদ নয়) ভাষা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

বড়দিদি। কলকাতা, ফণীন্দ্রনাথ পাল, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ (১৩২০ সন)। প্রথমে নাম ছিল 'শিশু', পরে হলো 'বড়দিদি'। 'ভারতী' (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪) পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল।

ENGLISH

The Eldest Sister and other stories. Tr. by V. Naravane. 1950. Includes also ***Bilasi*** & ***Chhabi***.

GUJARATI

Badi Didi. Tr. by Bhimji Harajiban Parekh. Bombay, N. M. Thakkar & Co., 1938.

—. Tr. by Pravinchandra Ruparel. Bombay, N. M. Thakkar & Co.

Mhoti Bhen. Tr. by Ravikant Bhatt. Bombay, Cinema Bulletin Karyalaya, 1937.

HINDI

Badididi. Tr. by Kamataprasad Srivastav. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1955.

—. Tr. by Narayanchandra Bharati. Delhi, Bal Sahitya Prakashan.

—. Tr. by Onkar Sharad. Delhi, Prabhat Prakashan,

KANNADA

Akkaji. Tr. by Mevundi Mallari. Hubli, Sahitya Bhandara, 1944.

MALAYALAM

Valiyetatti. Tr. by P. V. Rama Variyar. Calicut, P. K. Bros., 1956.

MARATHI

Madhavi, 2ed. Tr. by P. B. Kulkarni. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1953.

SINDHI

Wadi Dadi. Tr. by Jagat Advani. Hyderabad, Kahani Sahitya Mandir, 1939. Reprinted by Zindagi Publications in 1946.

Dadi. Tr. by Chuhermal Hinduja. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1939.

TAMIL

Razikkuppazi. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu, 1959.

TELUGU

Badibahan. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons.

URDU

Badididi. Delhi, Mashvira Book Depot., 1960.

বিরাজ-বৌ। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২য়ে ১৯১৪। প্রথম সূচনা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২০ (ইং ১৯১৩) সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায়।

ASSAMESE

Biraj Bau. Tr. by Shanti Datta and ed. by B. B. Chaudhuri. Shillong, Charu Sahitya Kutir, 1955.

GUJARATI

Virajvahu, 2ed. Tr. by Mahadev Desai. Ahmedabad, Navajivan Prakashan Mandir, 1933.

—. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, Bhogilal Gandhi, 1954.

—. Tr. by Shanti Shah. Ahmedabad, Navachetan Sahitya Mandir, 195—.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Sandesh Ltd, 1956.

HINDI

Biraj. Tr. by Sajal Kumar. Varanasi, Chinagari Prakashan, 1957.

Biraj Bahu. Tr. by Chandrashekhar Pathak. Cal., Gurudas Chattopadhyay, 1919.

—. Tr. by Dayanath Jha. Allahabad, Hindi Bhavan, 1960.

—, 2ed. Tr. by G S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

—. Tr. by Narayanchandra Bharati. Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

—. Tr. by Prakash Agarwal. Allahabad, Surendra & Co.

—. Tr. by Prakashchandra Srivastav. Mathura, Prabhat Prakashan, 1954.

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pockct Books,

—. Tr. by Thakurdas Mishra. Allahabad, Kitab Mahal, 1957.

KANNADA

Grihadevi. Tr. by K. N. Parvati. Mysore, Purnima Sahitya Mandir,

Kulavadhu. Tr. by Ramachandra Kottalagi. Dharwar, Samaj Book Depot.

Sativiraja. Tr. by M. Venkatesa. Bangalore, P. T. I. Book Depot., 1945.

MALAYALAM

Birajbahu. Tr. by Mathayil Aravind. Trichur, Current Books,

MARATHI

Viraj Vahini. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1943.

ORIYA

Biraj Bohu. Tr. by Surendra Chandra Mahanti. Cuttack, Kumara Book Depot, 1952.

PUNJABI

Biraj Bahu. Tr. by H. D. Sahirai. Jullundur, Koh-e-noor Pub.

SINDHI

Viraj. Tr. by Nanik Hingorani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1942.

Viraj Bahu. Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1954.

TELUGU

Sushila. Tr. by Jonnalagadda Satyanarayan. Rajahmundry, Addepalli & Co., 1947.

Virajbahu. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons, 1956.

URDU

Biraj Bahu. Delhi, Mashvira Book Depot, 1960.

বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ৩ জুলাই ১৯১৪ (১৯ আষাঢ় ১৩২১)। অন্যান্য গল্প হলো: "রামের সুমতি" ও "পথ-নির্দেশ"। বিন্দুর ছেলের প্রথম প্রকাশ: যমুনা, শ্রাবণ ১৩২০। পরবর্তীকালে ৩-টি গল্পই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ৩-টি গল্পের যে কোন একটির অনুবাদও উল্লেখিত হলো।

ASSAMESE

Pathanirdesh. Tr. by Kailashchandra Sharma and ed. by B. B. Chaudhuri.

GUJARATI

Bindu. Tr. by Manubhai Jodhani. Ahmedabad, Jivanlal & Co., 1939.

Chhotima. Tr. by Pravinchandra Ruparel. Bombay, N.M. Thakkar & Co.

Saradbabuni Tran Vartao. Tr. by Mahadev Desai. Ahmedabad, Navajiban Prakashan Mandir, 1948. Includes also *Ramer Sumati* and *Mejadidi*

HINDI

Bindu ka Beta. Allahabad, Kitab Mahal, 1959. Includes also two other stories.

Bindu ka Ladka. Tr. by Onkar Sharad. Delhi, Prabhat Prakashan,

Bindu ka Lalla. Tr. by Rupnarayan Pandey. Delhi, Bharati Bhasha Bhavan, 1955.

Chhoti Mam. Tr. by Jaykrishna Shukla. Allahabad, Adarsh Hindi Pustakalaya.

—. Tr, by Surendrapal Singh. Allahabad, Pushpi Karyalaya, 1957.

—. Tr. by Vishwanath Mukhopadhyay. Chhapra, Prabhat Prakashan, 1954.

Chhota Bhai (Ramer Sumati.), Delhi, Subodh Pocket Books,

KANNADA

Binduvina Maga. Tr. by S. A. Burli. Dharwar, Samaj Book Depot,

Premapatha. (Pathanirdesh). Tr. by Gurunatha Joshi. Dharwar, Samaj Book Depot, 1960.

Sumati Mattu Anuradha. Tr. by M.A. Kuppamma & Gurunatha Joshi. Dharwar, Lalita Sahityamale, 1944. Trans. of *Ramer Sumati* and *Anuradha.*

Sumati Anuradha. Tr. by S. A. Burli. Dharwar, Samaj Book Depot, Trans. of *Ramer Sumati* and *Anuradha*.

MALAYALAM

Bindur Chele. Tr. by P. A. Thampi. Calicut, P. K. Bros., 1960.

Prem Sagaram, 4 ed. (Bindur Chele). Tr. by K. Surendran. Kottayam, S.P.C.S. Previously published by Sarada Book Depot in 1947.

Hema (Pathanirdesh) Tr. by V. C. Narayanan. Palghat, Udaya Pub. House, 1958,

Sumati (Ramer Sumati). Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1950.

—, 2 ed. Tr. by K. Krishna Ayar, Trichur, Sri Krishna, pr. 1940.

MARATHI

Pathanirdesh. Tr. by B. V. Varerkar, Bombay, Abhinav Prakashan, 1951.

Chotabhai (Ramer Sumati), 2 ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1956, 1st pub. in 1949.

Binduchem Bal. (*In Devdas ani Binduchem Bal*, 2 ed. Tr. by Bhargavram Viththal Varerkar. 1957).

SINDHI

Mamta (Bindur Chhele). Tr. by Chuhermal Hinduja. Karachi. Ratan Sahitya Mandal, 1943.

Nandhi Mau. (Bindur Chele). Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1955.

Gopi jo der. (Ramer Sumati). Tr. by Chetan Sahani. Hyderabad, Bagban Monthly, 1939.

Bhabhi (Ramer Sumati). Tr. by Dayo Sabhani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1942.

Nandho Bhau (Ramer Sumati). Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1954.

TAMIL

Matani (Ramer Sumati). Tr. by A. K. Jayaraman. Madras Navayuga Prasuralayam, 1956.

Anpu Ullam (Ramer Sumati). Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu.

Amulyan (Bindur Chhele). Tr. by T. N. Kumaraswami. Madras, Alliance Co., 1941.

TELUGU

Bindugarabhai (Bindur Chhele). Tr. by Veluri S. Sastri, Vijayawada, Variety Agencies, 1950.

Tiranikorikalu (Pathanirdesh). Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1954.

Sumati (Ramer Sumati). Tr. by Lingam. Rajahmundry, Kalahasti Lanimaravu & sons, 1952.

পরিণীতা। কলকাতা, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১০ আগষ্ট ১৯১৪ (২৫ শ্রাবণ ১৩২১)। প্রথম প্রকাশ স্বরু হয় 'যমুনা' (ফাল্গুন ১৩২০) পত্রিকায়।

Parinita, 2ed. Tr. by Birendrakumar Bhattacharya & ed. by B. B. Chaudhuri, Shillong, Charu Sahitya Kutir, 1955.

GUJARATI

Parinita, 3ed. Tr. by Nagindas Parekh. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1937.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha.

HINDI

Parinita. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

—. Tr. by J. Krishna Shukla. Calcutta, Hindi Book Depot, 1954.

—. Tr. by Kamataprasad Srivastav. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1955.

—. Tr. by Ramachandra Varma. Bombay, Hindi Granth Ratnakar Karyalay.

—. Tr. by Ramachariprasad. Patna Pustak Bhandar, 1957.

—. Tr. by Sunita Agarwal. Mathura, Shyamalal Hiralal, 1956.

—. Tr. by Vedprakash. Mathura, Shyamakashi pr., 1956.

—. Varanasi, Hindi Pracharak,

KANNADA

Parinita, 2ed. Tr. by Gurunatha Joshi. Dharwar, Pratibha Mudrana, 1960. 1st pub. in 1958.

MALAYALAM

Aval Vivahitayanu. Tr. by P. V. Rama Variyar. Calicut, P. K. Bros.

Lalita. Tr. by R. C. Sharma. Paravur, S. J. Ptg. Co, 1938.

—. Tr. by R. Narayan Panikkar. Trivandrum, Subbihiah Reddiar, 1949.

Parinita. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, S. P. C. S., 1955.

MARATHI

Parinita, 2ed. Tr. by B.V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1955. 1st. pub. in 1944.

—. Tr. by Shridhar Rajaram Marathe. Poona, V. G. Tambankar, 1934.

ORIYA

Parinita. Tr. by Seikh Karim. Berhampur, Mahimunnisa Bibi.

SINDHI

Lalta. Tr. by Parumal Kewalramani. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1940.

Parneeta. Tr. by Beharilal Chhabria. Bombay, Bharat Jiban Sahitya Mandal, 1955.

TAMIL

Lalita. 3ed. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Alliance, 1949. 1st pub. in 1944,

TELUGU

Parinita. Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Grantha Mandali, 1954.

—. Tr. by Chakrapani (*pseud.*). Madras, Yuba Book Depot. 1946.

পণ্ডিত মশায়। কলকাতা, রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর অ্যাণ্ড সন্স, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ (২৯ ভাদ্র ১৩২১)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, বৈশাখ ও শ্রাবণ ১৩২১।

GUJARATI

Jibanyatra, 3ed. Tr. by Kishansimh Chavada. Bombay, R.R. Sheth & Co., 1952.

Mahajnani. Tr. by Natavarlal Jani. Ahmedabad, Navachetan Sahitya Mandir, 1956.

Panditji. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, Vora & Co, 1951. (abridged).

Vrindavan. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

HINDI

Panditji. Tr. by Ravishankar. Allahabad, Pushpi Karyalay, 1957.

—. Tr. by Sajalkumar. Varanasi, Chingari Prakashan, 1957.

—. Tr. by Shyamu Sanyasi. Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Rupnarayan Pande. Allahabad, Translator, 1925.

Panditji Tatha Manjhali Bahan. Tr. by Ramachandra Varma. Bombay, Hindi Granth Ratnakar Karyalay. Includes *Mejdidi*.

Khushbu. Tr. by Guljar. Delhi, Hind Pocket Books, (a film script).

KANNADA

Vrindavana. Tr. by Gurunath Joshi. Dharwar, Samaj Book Depot, 1959.

MARATHI

Pandit Mahashay. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1944.

ORIYA

Sikshaka Mahasaya. Tr. by Seikh Karim. Berhampur, Das Bros.

SINDHI

Sada Suhagin. Tr. by Dayo Sabhani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1942.

Chingari. Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Rani Pub., 1954.

TAMIL

Payal Oyantatu. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu, 1959.

URDU

Samaj ka dar. Tr. by Balak Ram Chand. Amritsar, Bharat Pustak Bhandar.

Panditji. Tr. by Gopal Mittal. Lahore, Lajpat Ray & Sons, 1942.

মেজদিদি। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১২ ডিসেম্বর ১৯১৫ (২৬ অগ্রহায়ণ ১৩২২)। মোট ৩-টি গল্পের সমষ্টি : মেজদিদি, দর্পচূর্ণ এবং আঁধারে আলো। প্রথম প্রকাশ : যথাক্রমে 'ভারতবর্ষ' (১৩২১) পত্রিকায় কার্তিক, মাঘ ও ভাদ্র সংখ্যায়। উল্লেখিত যে কোন একটি গল্পের অনুবাদও দেওয়া হয়েছে।

HINDI

Majhali Didi. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1953.

Majhali Didi. *Badi Didi*. Tr. by Shyamu Sanyasi. Delhi Pocket Books, Includes also '*Bara Didi*'.

Abhimanini (Darpachurna). Tr. by Iswariprasad. Calcutta, Haridas & Co.

KANNADA

Hemangini (Mejadidi). Tr. by Madhvesha and D. V. K. Mysore, Murti Agencies, 1949.

Darpachurna. Tr. by C.K. Nagaraj Rao. Bangalore, Sarat Agencies, 1943.

Garvabhanga (Darpachurna). Tr. by S.A. Burli. Dharwar, Samaj Book Depot,

Cancala (Andhare Alo). Tr. by H.K. Vedavyasacharya. Mysore, D. V. K. Murti Agencies, 1952.

MALAYALAM

Kisu (Mejadidi). Tr. by Vatsala Ramachandran. Thuravoor, Narasimha Vilasam,

Darpachurnnam. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1956.

Ente Bharttavu (Darpachurna). Tr. by M. R. Narayana Pillai. Quilon, M. S. Book Depot, 1956.

PUNJABI

Manjhali Didi. Tr. by H. S. Sahirai. Jullundur, Punjab Kitabghar,

RUSSIAN

Svet vo tme (Andhare Alo). Tr. by N. Yakoleva.

SINDHI

Vicheen Dadi (Mejadidi). Tr. by Wali Mohmed Bhutto. Karachi, Hindu Daily, 1940.

—. Tr. by Lachhman Sathi. Bombay, Rani Pub., 1954.

TAMIL

Hemangini (Mejadidi). Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Jyoti Nilayam, 1943.

—. Tr. by S. Gurusvami. Madras, Alliance, 1943

Hema (Mejadidi & Anuradha). Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu, 1959.

TELUGU

Chinnakka (Mejadidi). Tr. by Karumuri Vaikuntharao. Madras, Vavilla Ramasvami Sastrulu & Sons, 1949.

Garvabhangamu (Darpachurna). Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1955.

পল্লী-সমাজ। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৫ জানুয়ারী ১৯১৬ (১ মাঘ ১৩২২)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২২। নাট্যরূপ : রমা (৪ আগস্ট ১৯২৮ । শ্রাবণ ১৩৩৫) ।

CEYLONESE

Gami Samajaya. Tr. by U. Siri Saranankara Thero. Colombo, M. D. Gunasena,

GUJARATI

Andhapo Athava Gamadiyo Samaj. Tr. by Kishansimh Chavada. Baroda, Nav-Gujarat pr., 1933.

Pallisamaj, 3ed. Tr. by Nagindas Parekh. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1946.

—. Tr. by Shrikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha, 1960.

Rama. Tr. by Maneklal Joshi. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1942.

Rama Ramesh. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, Vora & Co, 1950.

HINDI

Dehati Duniya. Tr. by Nagarjun (*pseud*). Allahabad, Kitab Mahal, 1956.

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pockct Books, 1966.

Dehati Samaj, 8ed. Allahabad, Indian pr., 1952.

—. Tr. by Adarsh Kumari. Lucknow, Nava yug Pustak Bhandar, 1956.

—, 3ed, Tr. by Kamalaprasad. Mathura, Prabhat Prakashan. 1955.

—. Tr. by Narayan Chandra Bharati, Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

Gramin Samaj. Tr. by Ramachandra Varma. Bombay, Hindi Granth Ratnakar Karyalay.

Rama. New Delhi, Archana Prakashan.

Samaj ka Atyachar, 6 ed. Delhi, Narayan Datta Sahagal & Sons.

KANNADA

Halliya Jivana. Tr. by Ramachandra Kottalagi. Dharwar, Samaj Book Depot,

Visvesvara. Tr. by C. K. Nagaraja Rao. Bangalore, Sarat Sahitya, 1955.

Halliya Samaj. Tr. by H. K. Vedavyasacharya. Mysore, Murti Agency, 1948.

Halliya Samaj Atthan Rama. Tr. by Ahobal Sankar. Mysore, Kavyalay, Includes also *Ramer Sumati.*

MALAYALAM

Gramasamajam, 2 ed. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N.B.S., 1958. 1st pub. in 1955.

MARATHI

Gramvaganga. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Nava-Bharat Prakashan Samstha, 1941.

SINDHI

Gothani Samaj. Tr. by Jethanand Lalwani. Hyderabad, Bharat Jiban Sahitya Mandal, 1942.

Rama. Tr. by Jethanand Lalwani. Bombay, 1955.

TAMIL

Grama Samajam. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Jyoti Nilayam, 1955.

Rama, 2ed. Tr. by R. Sanmukhsundaram. Coimbatore, Putumalar Nilayam, 1957. 1st pub. in 1943.

TELUGU

Palliyulu. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons.

—. Tr. by Chakrapani (*pseud*). Madras, Yuba Book Depot.

URDU

Dehati Samaj. Tr. by Yazdani Jallandhari, Lahore, Narayandatta Sahgal, 1942.

চন্দ্রনাথ। কলকাতা, রায় এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১২ মার্চ ১৯১৬ (২৯শে ফাল্গুন ১৩২২)। প্রথম প্রকাশ: যমুনা, বৈশাখ—আশ্বিন ১৩২০।

ASSAMESE

Chandranath. Tr.by Kailash Chandra Sharma and ed. by B. B. Chaudhuri. Shillong, Charu Sahitya Kutir. 1957.

ENGLISH

Queen's Gambit. Tr. by Sachindralal Ghosh. Bombay, Jaico,

GUJARATI

Anupam. Tr. from Hindi by Amir Malik. Nadiad, Gulzar Karyalay, 1926.

Chandranath, 3ed. Tr. by Nagindas Parekh. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1945,

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha, 1955.

Chandmukh. Tr. by Ramanlal Pitambardas Soni. Bombay, N. M. Thakkar & Co. 1941.

HINDI

Chandranath. Tr. by Dhanyakumar Jain. Delhi, Hind Pocket Books,

—, 2ed. Tr. by Ramachandra Varma. Bombay, Hindi Grantharatnakar Karyalay, 1936.

—, 2ed. Tr. by Srikrishna Hasarat. Varanasi, Navin Prakashan Mandir, 1954.

Chandranatha va Anya Kahaniyan. Mathura, Prabhat Prakashan, 1954. Includes also *Mahesha & Abhagika Svarga*.

KANNADA

Chandranatha. Tr. by Gurunatha Joshi. Hubli, Sahitya Bhandar, 1960.

—, Tr. by H. K. Vedavyasacharya. Mysore, Murti Agencies, 1949.

MALAYALAM

Chandranathan, 2ed. Tr. by R. Narayana Panikkar. Trivandrum, Anantha Rama Varma, [Printers], 1933, 1st pub in 1926.

MARATHI

Chandranath, 2ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1944. 1st pub. in 1938.

SINDHI

Shartranj jo Khel. Tr. by Jagat Advani. Hyderabad, Kahani Sahitya Mandir, 1940.

Chandernath. Rev. by Beharilal Chhabria. Karachi, Zindagi Pub., 1947

TAMIL

Chandranath, 2ed. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Inba Nilayam, 1957. 1st pub. in 1940.

TELUGU

Chandranath. Tr. by Gadde Lingayya, Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1954.

বৈকুন্ঠের উইল। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২৮ আগষ্ট ১৯১৬ (১২ ভাদ্র ১৩২৩)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ ১৩২৩।

GUJARATI

Pitano Varaso. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, Vora & Co, 1950.

Savaki Ma. 2ed. Tr. by Ramanlal Soni & Bhogilal Gandhi. Bombay, N. M. Thakkar & Co, 1946. Includes also *Anupama and Bamuner Meye*.

Vaikunthanu Will. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

Vimata. Tr. by Kissansingh Chauda. Rajkot, Navayug Pustak.

KANNADA

Vaikunthan Mrityupatra. 2ed. Tr. by Mehndi Mallari. Dharwar, Pratibha Mudran, 1959. 1st pub. in 1944.

MALAYALAM

Achante Osyathu. Tr. by T. K. Raman Menon. Palghat, C. P. K. Bros., 1955.

Vaikunthente Maranapatram. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1956.

NEPALI

Baikunthko Danapatra. Tr. by Kharagman Malla.

SINDHI

Wasiat. Tr. by Daulat Tahilramani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1942.

Wado Bhau. Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1955.

TAMIL

Vaikuntan Uyil. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Inba Nilayam, 1952.

অরক্ষণীয়া। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২০ নভেম্বর ১৯১৬ (৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৩)। প্রথম প্রকাশ: ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৩।

GUJARATI

Arakshaniya. Tr. by Kishansimha Chhavada. Ahmedabad, Nav-yug Pustak Bhandar, 1932.

Durga. Tr. by Bachubhai Shukla. Bombay, R. R. Sheth & Co, 1940. Includes *Navabidhan & Mejadidi*.

Jnanada, 3ed. Tr. by Kishansimha Chhavada. Bombay, N. M. Thakkar & Co, 1946. Includes & *Navabidhan, Mejadidi*. 1st pub. in 1940.

—, Tr. by Shrikant Trivedi, Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha.

HINDI

Arakshaniya. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

—, Tr. by Nagarjun. Allahabad, Kitab Mahal, 1957 (?)

—, Tr. by Narayanchandra Bharati. Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

—, Tr. by Rupanarayan Pandey. Allahabad, Indian pr, 1927.

Kusam. Tr. by Satyanarayan Vyasa. Allahabad, Adarsh Pustak Mandir.

KANNADA

Arakshaneeya. Tr. by C. K. Nagaraja Rao. Bangalore, Sarat Sahitya, 1954.

Arakshita. Tr. by Ramachandra Kottalagi. Dharwar, Samaj Book Depot.

MARATHI

Arakshaniya. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1947.

SINDHI

Bhagal Chooryoon. Tr. by Kodanmal Hinduja. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1942.

TELUGU

Arakshaniya. Tr. by Sahadev Suryaprakash Rao. Rajahmundry, Addepalli & Co., 1929.

URDU

Gharib ki Duniya. Tr. by Yazdani Jallandhari. Lahore, Kitab Mahal, 1944.

শ্রীকান্ত [১—৪ পর্ব]। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯১৭—১৯৩৩।

১ম পর্ব : ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ (৩০ মাঘ ১৩২৩)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, মাঘ—চৈত্র ১৩২২ এবং বৈশাখ—মাঘ ১৩২৩।

২য় পর্ব : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ (৭ আশ্বিন ১৩২৫)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, আষাঢ়—ভাদ্র, অগ্রহায়ণ—চৈত্র ১৩২৪ এবং বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন ১৩২৫।

৩য় পর্ব : ১৮ এপ্রিল ১৯২৭ (৫ বৈশাখ ১৩৩৪)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, পৌষ, ফাল্গুন ১৩২৭ এবং বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র—আশ্বিন, পৌষ ১৩২৮। আংশিক প্রকাশিত।

৪র্থ পর্ব : ১৩ মার্চ ১৯৩৩ (২৯ ফাল্গুন ১৩৩৯)। প্রথম প্রকাশ : বিচিত্রা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৮ ও বৈশাখ—মাঘ ১৩৩৯।

ENGLISH

Srikanta. *The autobiography of a wanderer* [V. I, Tr. by Kshitish Chandra Sen. Varanasi, Indian Pub., 1945.

Srikanta. Tr. by K. C. Sen & Theodosia Thompson. Intrd. by E. J. Thompson. London, O. U. P., 1922.

—. Bombay, Jaico.

FRENCH

Srikanta. Tr. by J. G. Delamin. Introd. by E. J. Thompson.

GUJARATI

Shrikant. V. 1—2 : Tr. by Ramanlal Soni & V. 3-4 : Tr. by Bhimji Harijivan Parekh. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1936-'37.

—' V 4. Tr. by Shrikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha, 1955-'56,

HINDI

Shrikanta. Delhi, Bharati Bhasha Bhavan,

—. Lucknow, Hindi Pracharak Mandal,

—. New Delhi, Sanmarg Prakashan,

—. Tr. by Hemachandra Modi, Dhanyakumar Jain & Kamal Joshi. Bombay, Hindi Granth Ratnakar Karyalay, 1937.

—. Tr. by Kamal [pseud.]. Varanasi, Dirga Pr., 1953.

—. Abridged ed., Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Rupanarayan Pandey, Allahabad, Indian Pr., 1947

—. Tr. by Hansakumar Tewari. Delhi, Prabhat Prakashan .

ITALIAN

Srikanta. Tr. by Ferdinando Belloni Filippi. Villa Franca near Verona (North Italy), 1925. Incomplete.

Srikanta, di Saratchandra Chatterji. Roma, De Carlo, 1942.

KANNADA

Srikanta 2ed, Tr. by Gurunath Joshi. Dharwar, Samaj Book Depot, 1958, 1st pub. in 1946. Complete in 8 V.

Rajalakshni. Tr. by Gurunath Josi. Dharwar, B. V. Ghanekar, 1944.

MALAYALAM

Srikantan. Tr. by T. C. Bhaskaran Mussat. Trichur, Current Books,

Pyari. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1956

Vikriti. 2ed Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1960. 1st pub. in 1954.

MARATHI

Shrikanta. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navaprabhat Prakashan, 1939-56. 4 V.

RUSSIAN

Shrikanto. Tr. by Helen Alekseeva & S. Cyrin. Pref. by E. Payevskaya. Moscow, Goslitizdat, 1960.

SINDHI

Shrikant. Tr. by Chuhermal Hinduja and Parumal Kewalramani. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1946.

—. Rev. & Abridged ed. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1956.

TAMIL

Srikantan. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Tamil Chudar Nilayam, 1959. 4 V.

TELUGU

Srikanta. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons,

দেবদাস। কলকাতা. গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ৩০ জুন ১৯১৭ (১৬ আষাঢ় ১৩২৪)। প্রথম প্রকাশ: ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২৩ এবং বৈশাখ—আষাঢ় ১৩২৪।

ASSAMESE

Devdas. 2ed. Tr. by Tarinikanta Sharma & ed, by B. B. Chaudhuri. Shillong, Charu Sahitya Kutir,

CEYLONESE

Devadasa. Tr. by Dharmadasa Gunawardena. Colombo, M. D. Gunasena,

GUJARATI

Devdas. 3ed. Tr. by Balabhai Virchand Desai & Ratilal Dipchand Desai. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1947.

—. Tr. by Bhogilal Gandhi. Ahmedabad, Prasthan Karyalay, 1935.

—. Tr. by Sivshankar Joshi. 1959.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

—. Tr. by Vrajalal Thakkar. Bombay, Jayshankar Dvevedi, 1925.

—. Tr. by Jyabhikhhu. 1957.

HINDI

Devdas. Tr. by Dhanprakash Agarwal. Allahabad, Hindi Sahitya Bhandar.

—. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar, 1957.

—. Tr. by Hansakumar Tiwari. Delhi, Hind Pocket Books, 1960,

—. Tr. by Kamalaprasad Sharma. Allahabad, 1945.

—. Tr. by Krishnavallabh. Allahabad, Kitab Mahal.

—. Tr. by Prakashchandra Srivastav. Delhi, Prabhat Prakashan,

—. Tr. by Kamalaprasad Rai Sharma. Varanasi, Hindi Pustakalay, 1941,

—. Tr. by Ramachandra Varma

KANNADA

Devadasa. 4ed. Tr. by Gurunath Josi. Dharwar, Samaj Book Depot, 1958. 1st pub. in 1939.

MALAYALAM

Devadas. Tr. by T. C. Bhaskaran. Palghat, Vellinezhi Pub. House, 1949.

Devadasan. Tr. by N. V. Krishna Variyar. Calicut, P. K. Bros.,

MARATHI

Devdas. Tr. by V. S. Gurjar. Poona, N. S. Bhide, 1st. pub. in 1937.

—. 2ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1957.

Devdas ani Binduchem Bal. 2ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1957. 1st pub. in 1946.

NEPALI

Devdas. Tr. by Sushri Sabitri Silyal. Kathmandu, Rajakiya Prajna Pratisthan.

—. Tr. by Sriprasad Sharma. Darjeeling, Shyam Bros.

ORIYA

Devdas. Tr. by Bipracharan Das. Takrada (Dt. Ganjam), Raghumani Das,

SINDHI

Devdas. Tr. by Sanwal Chelani. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1940.

—. Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1954.

—. Tr. by B. A. Sanbhal. Karachi, Ajit Printing Pr.

TAMIL

Devdas. Tr. by Dinakaran. Madras, Alliance, 1945.

—. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Nav-yug, Karyalay 1950.

Tevtasa. Tr. by *Mrs*. Jayaraman. Madras, Rani Muthu,

TELUGU

Devadasu. Tr. by Lavanya. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1955.

—. Tr. by B. Shivaramakrishna. Vijayawada, Desikavit Mandali, 1953.

Devadass. Tr. by Gadde Lingayya.

Devdas (Drama). Tr. by K. V. J. Ramarao.

URDU

Devdas. Tr. by Durgashankar Bharadwaj. Delhi, Star Pub., 1960.

—. Tr. by Yazdani Jalandhari.

নিষ্কৃতি। কলকাতা, রায় এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১জুলাই ১৯১৭ (১৭ আষাঢ় ১৩২৪)। প্রথম প্রকাশ : যমুনা, বৈশাখ ১৩২১ ('ঘর-ভাঙ্গা' নামে প্রথম অংশ) এবং পরে সমগ্র অংশ প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষের' ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ ১৩২৩ সংখ্যাগুলিতে।

ENGLISH

The Deliverance. Tr. by Dilipkumar Ray ; rev. by Sri Aurobindo and Pref. by Rabindranath Tagore. Bombay, N. M. Tripathi, 1944.

Mothers and Sons (Nishkriti and *Ramer Sumati)*. Tr. by Dilipkumar Roy. Bombay, Parel Publications,

GUJARATI

Chhutakaro. Tr. by Kisansimh Chavada. Bombay, Swastik Granthamala Karyalay, 1934.

Nani Vahu. Tr. by Pravinchandra Ruparel. Bombay, N. M. Thakkar & Co,

HINDI

Chhutakara. Allahabad, Indian Pr., 1932.

—. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar, 1953.

—. 2ed. Tr. by Kamalaprasad Srivastav. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1952.

—. Tr. by Shashiprabha Agarwal. Allahabad, Surendra & Co., 1956.

Nishkriti. Tr. by Dhanyakumar Jain. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

Uddhar. Bombay, Bora & Co.

KANNADA

Nishkriti. Tr. by S. Anant Narayan. Bangalore, H. S. Doraiswami, 1946.

MALAYALAM

Taravattamma, 4ed. Tr. by A. Madhavan. Trichur, Mangalodoyam,

Madhuri. Tr. by R. Narayana Panikkar. Attingal, Kalabhivarddhini Book Depot, 1947.

MARATHI

Nishkriti. Tr. by B. V. Varerkar.

SANSKRIT

Nishkriti and other stories. Tr. by Kshitish Chandra Chatterjee. (In '*Manjusa*' in several of its issues between December 1949 and Sept. 1950.)

SINDHI

Harjeet. Tr. by Mellaram Vasvani. Karachi, Sunder Sahitya, 1943.

TAMIL

Tuva Ullam. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore Mallika Veliyeedu,

TELUGU

Nishkriti. Tr. by Sivaramakrishna. Vijayawada, Hamsa Prachuranalu, 1957.

Nishkruti. Tr. by K. V. J. Ramarao.

URDU

Shikast. Tr. by Rashid Gilani. Rawalpindi Laxman, Roy, 1942.

কাশীনাথ। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ (১৬ ভাদ্র ১৩২৪)। গল্পগুলির নাম এবং প্রথম প্রকাশ: ১. কাশীনাথ (পূর্বনাম—বামুন ঠাকুর)—সাহিত্য, ফাল্গুন-চৈত্র্য ১৩১৯। ২. আলো ও ছায়া—যমুনা, আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০। ৩. মন্দির—কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯। ৪. বোঝা—যমুনা, কার্তিক-পৌষ ১৩১৯। ৫. অনুপমার প্রেম—সাহিত্য, চৈত্র ১৩২০। ৬. বাল্যস্মৃতি—সাহিত্য, মাঘ ১৩১০। ৭. হরিচরণ—সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২১।

GUJARATI

Kashinath. 3ed. Tr. by Ramanlal Soni & Bhogilal Gandhi. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1943.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha, 1955.

HINDI

Kashinath. Tr. by Narayanchandra Bhartai. Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books, Also included *Vaikuntha ka Vasiyatnama and Ram ki Sumati*.

Bachapan ki Kahaniyan. 4ed (Balyasmriti). Tr. by Mahadev Saha. Delhi, Raja Kamal Prakashan,

—. 2ed. Varanasi, Chaudhuri & Sons, 1955.

KANNADA

Kashinath. Tr. by C. K. Nagaraja Rao. Bangalore, Sarat Agencies, 1946.

Anupameya Prema (Anupamar Prem). Tr by S. A. Burali. Dharwar, Samaj Pustakalay,

—. Tr. by H. K. Vedavyasacharya. 1947.

Mandira (Mandir). Tr. by M. Kuppayamma & Gurunath Joshi, Dharwar, Samaj Pustakalay, 1960.

—. Tr. by Gangeya. 1946.

MALAYALAM

Kashinathan. Tr. by N. V. Krishna Variyar. Calicut, Deccan Pub. House, 1947. 2ed. pub, by P. K. Bros.,1958.

MARATHI

Kashinath, 2ed. Tr. by P. B. Kulkarni. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1949.

—. Tr. by B. V. Varerkar.

Balyasmriti Tr. by Jesabant Tendulkar.

Haricharan. Tr. by Jesabant Tendulkar.

NEPALI

Kashinath. (In *Sarad Granthavali Namma Sankalit*. Tr. by Khargman Malla. Kathmandu, Nepali Bhasha Prakashani. Samiti, 1947.)

SINDHI

Kashinath. Tr. by Vimal Kumari. Karachi, Vimal Sahitya Mandal, 1939.

—. Tr. by Lachhman Sathi. Rani Pub., 1954.

TAMIL

Kasinathan. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Alliance, 1952.

Anupama (Anupamar Prem). Tr. by A.K. Jayaraman, Madras, Alliance, 1942.

—. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu, 1959. Includes also *Alo O Chaya.*

Koyel (Mandir). Tr. by A.K. Jayaraman. Madras, Jyoti Nilayam, 1958.

TELUGU

Kashinath. Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Granthamandalli, 1954.

—. Tr. by Bondalpati Sivaramakrishna. Vijayawada, Deshikavit Mandali, 1951.

Balyasmriti. Tr. by Gadde Lingayya. 1956.

চরিত্রহীন। কলকাতা, রায় এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১১ নভেম্বর ১৯১৭ (২৫ কার্তিক ১৩২৪)। প্রথম প্রকাশ: যমুনা কার্তিক-চৈত্র ১৩২০ এবং ১৩২১ সনে আংশিক প্রকাশিত হয়। ৫ম সংস্করণে যথাসাধ্য লেখক কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল।

ENGLISH

Charitraheen. Tr. by Benoylal Chatterjee. Bombay, Jaico,

GUJARATI

Charitrahin, 3ed. Tr. by Ramanlal Gandhi. Surat, Harihar Pustakalay,

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

—. Tr. by Bhogilal Gandhi. Bombay, R. R. Sethni Co, 1939.

Kiranamayi. Tr. & Abridged by Bhogilal Gandhi. Bombay, Chetan Prakashan Griha, 1952.

HINDI

Charitrahin. Tr. by Kamal [pseud.]. Balia, Rajendra Kumar & Bros. 1951.

—. Delhi Asok Pocket Books.

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Ramendra Bandyopadhyay. Delhi, Prabhat Prakashan,

—. Tr. by Rupanarayn Pandey. Bombay, Hindi Granth Ratnakar Karyalay.

KANNADA

Charitrahina. Tr. by K. Virabhadra. Mysore, D. V. K. Murti Agencies, 1949.

—. Tr. by M. K. Bharatiramanacar. Bangalore, Anand Bros., 1953.

—. Gurunath Josi. Dharwar, S. J. Kulkarni.

MALAYALAM

Satisachandran. Tr. by R. Narayana Panikkar. Trivandrum, Reddiar Pr., 1948. 2 V.

Savitri. Tr. by P. K. Kumaran Nayar. Calicut, P. K. Bros.

MARATHI

Charitrahin. Tr. by V. S. Gurjar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1948-'49, 2 V.

—. Tr. by V. B. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1949.

NEPALI

Charitrahin. Tr. by Subba Riddhi Bahadur Malla. Kathmandu, Jore Ganesh Pr., 1951.

ORIYA

Charitrahina. Tr. by Gorachand Misra. Cuttack, Translator,

PUNJABI

Avara. Tr. by Giean Singh Giani. Amritsar, Punjabi Book Shop.

RUSSIAN

[*Charitrahin*] Tr. by B. Karpushkin. (In *Sozheny Dom. Povesti y Ramany.* Moscow, Goslitizdat)

SINDHI

Chartirhen. Tr. by Dayo Sabhani. Saroj Sabhani & Krishin Hemrajani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1946.

TAMIL

Savitri. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Tamil Chudar Nilayam, 1959.

TELUGU

Charitrahinulu. Tr. by Nilakantham. Rajahmundry, Kondapalli Vinavenkayya & Sons, 1956. 2 V.

Tr. by Bondalpati Sivaramakrishna. Vijayawada, Desikavit Mandali, 1950.

URDU

Avarah. Tr. by Yazdani Jallandhari. Lahore, Narayandatta Sahgal, 1944.

স্বামী। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ (৬ ফাল্গুন ১৩২৪)। প্রথম প্রকাশ : ১. স্বামী—নারায়ণ, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪। ২. একাদশী বৈরাগী—ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৪।

GUJARATI

Svami. Tr. by Ramanlal Soni. Ahmedabad, Gurjar Grantharatna Karyalay, 1934.

—, Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan, 1958.

HINDI

Patidev. Tr. by Kamalaprasad Sharma. Varanasi, Nutan Prakashan. 1960.

—, Tr. by Narayan Chandra Bharati. Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

—, Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

—, Tr. by Rupanarayan Pandey. Allahabad, Indian Pr.

Vairagi. Delhi, Prabhat Prakashan, 1955.

—, Tr. by Narayanchandra Bharati. Delhi, Bal Sahitya Prakashan,

—, Tr. by Prakashchandra Srivastav. Mathura, Prabhat Prakashan, 1954.

KANNADA

Svami. Tr. by S. Anantanarayana. Bangalore, Madhava Sons, 1946.

—, Tr. by B. G. Manohara. Dharwar, Samaj Book Depot,

Ekadasi Bairagi Mattu Gurucarana. Tr. by Mevundi Mallari. Dharwar, Samaj Book Depot, 1952.

MALAYALAM

Sauda. Tr. by T. K. Raman Menon. Calicut, P. K. Bros., 1953.

MARATHI

Saudamini. Tr. by Shankar Balaji Shastri. Bombay, M. N. Kulkarni, 1927.

Savmi. Tr. by B. V. Varerkar.

SINDHI

Savami. Tr. by Doulat Tahilramani. Karachi, Runder Sahitya, 1942.

—, Tr. by P. Kevalramani. 1939.

Saudamini. Tr. by Doulat Tahilramani. Poona, Nargis Pub., 1955.

TAMIL

Saudamini. Tr. by T. N. Kumarasvami. Madras, Alliance, 1949.

TELUGU

Svami. Tr. by Bondalpali Sivaramakrishna. Vijayawada, Desikavit Mandali, 1952.

URDU

Saperan. Tr. by Munsi Premchand. Lahore, Hindustani Kitab Ghar.

Sowami. Tr. by Yazdani Jallandhari. Lahore, Kitab-i-Stani Urdu.

দত্তা। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ (১৬ ভাদ্র ১৩২৫)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, পৌষ—চৈত্র ১৩২৪ ও বৈশাখ—ভাদ্র ১৩২৫। উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া' প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪।

ASSAMESE

Dutta. Tr. by Kamaleswar Chaliha & ed. by B. B. Chaudhuri Shillong, Charu Sahitya Kutir,

ENGLISH

The Betrothed. Tr. by Sachindralal Ghosh. Calcutta, Silpi Samstha Prakashani,

Vijaya. Tr. by Chandra Auluck. New Delhi, Varma Bros.,

GUJARATI

Datta. Tr. by Bhogilal Gandhi. Bombay, R. R. Sethni & Co, 1937.

—. Tr. by Maneklal Joshi. Ahmedabad, Navachetan Sahitya Mandir, 1938 [?]

—. Tr. by Shrikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

—. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, Vora & Co, 1950.

Srimati Vijaya. Tr. by Krishnaprasad Shastri, Ahmedabad, Lalit Vangamay Granthamala, 1921.

Vijaya. Tr. by Ravikant Bhatt. Bombay, Cinema Bulletin Karyalay, 1936.

HINDI

Datta. Tr. by Balbhadra Thakur. Allahabad, Kitab Mahal, 1947.

—. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

—. 3 ed. Tr. by Sundarlal Tripathi. Bombay, Hindi Granth Ratnakar.

Vijaya. Tr. by Hansakumar Tiwari. Delhi, Prabhat Prakashan,

—. Tr. by Rupanarayan Pandey. Lucknow, Ganga Granthagar 1951.

KANNADA

Datta. Tr. by H. K. Vedavyasacarya. Mysore, Murti Agencies; 1948.

Vijaya. Tr. by M. G. Sethy. Dharwar, Samaj Pustakalay,

MALAYALAM

Narendrababu. Tr. by T. K. Raman Menon. Trichur, B.V. Book Depot, 1937.

Vijaya. Tr. by T. C. Bhashkaran Mussat. Palghat, Educational Supplies Depot, 1948.

MARATHI

Vijaya. 2 ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1951 1st pub. in 1943.

—. Tr. by Prabhakar Bhase. Bombay, P.S. Mose, 1920.

ORIYA

Dutta. Tr. by Gorachand Misra. Cuttack, Orissa Book Store,

SANSKRIT

Datta. (In *Journal of the Sanskrit Sahitya Parishad*, Calcutta. Tr. by Kshitish Ch. Chatterjee & Upendramohan Sankhyatirtha).

SINDHI

Akhrin Iltaja. Tr. by Jagat Advani. Hyderabad, Karachi Sahitya Mandir, 1940.

Vijaya. Tr. by Srichand Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya Mandir, 1952.

TAMIL

Palli Natpu. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mallika Veliyeedu,

TELUGU

Vijaya. Tr. by S. Gurusvami. Madras, Alliance, 1945.

ছবি। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৬ জানুয়ারী ১৯২০ (২ মাঘ ১৩২৬)। প্রথম প্রকাশ: ১. ছবি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী', পূজাবার্ষিকী, ১৩১৬; ২. বিলাসী—ভারতী, বৈশাখ ১৩২৫; এবং ৩. মামলার ফল—পার্বণী, বার্ষিকী, আশ্বিন ১৩২৫।

ENGLISH

The Portrait. (In *The Drought and other stories*, Tr. by Sasadhar Sinha. New Delhi, Sahitya Akademi)

The Snakecharmer's Drought (In The Drought and other stories). Translation of *Vilashi.*

GUJARATI

Chabi. 2 ed. Tr. by Gopaldas Patel. Ahmedabad, Gurjar Granthâratna Karyalay, 1940,

—. Tr. by Srikant Trivedi, Ahmedabad, Visva-Sahitya Prakashan Griha, 1957.

HINDI

Vilasi. Tr. by Rajes Diksita,

KANNADA

Bhavachitra (Chhabi). Tr. by H. K. Ve avyasacarya. Mysore, Murti Agencies, 1950.

Chitra. Tr. by......Dharwar, Samaj Book Depot.

MARATHI

Bilasini. Tr. by Jasabant Tendulkar.

TELUGU

Vilasini. Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Grantha Mandali, 1956.

গৃহদাহ। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২০ মার্চ ১৯২০ (৭ চৈত্র ১৩২৬)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, মাঘ—চৈত্র ১৩২৩ ; বৈশাখ—আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন ১৩২৪ ; পৌষ—চৈত্র ১৩২৫ ; আষাঢ়—মাঘ ১৩২৬।

ENGLISH

The Fire. Tr. by Sachindralal Ghosh. Calcutta, Shilpi Samstha Prakashani,

GUJARATI

Grihadah. Tr. by Bachubhai Shukla. Jamnagar, Gunvantaray Acharya, 1947.

—. Tr. by Bhogilal Gandhi. Modasa, Sharad Karyalay; Bombay, N. M. Thakkar & Co., 1939.

—. Tr. by Ratnesvar B. Vakil. Ahmedabad, K. M. Shastri, 1926.

—. Tr. by Srikant Trivedi, Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

Manjhil. Tr. & abridged by Bhogilal Gandhi. Bombay, Chetan Prakashan Griha, 1953.

HINDI

Grihdaha. Tr. by Balabhadra Thakur and rev. by Satyanarayan Vyasa. Allahabad. Kitab Mahal, 1947.

—. Tr. by Dhanyakumar Jain, Bombay, Hindi Granthratnakar Karyalaya,

—. 3 ed. Tr. byRamagovind Mishra. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1953.

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Hamsakumar Tivari. Delhi, Prabhat Prakashan,

Griha-daha. Tr. by Narayan ChandraChatterjee. Allahabad. Sarat Granthavali, 1932.

KANNADA

Araginamane 2 ed. Tr. by Mevundi Mallari. Dharwar, Samaj Book Depot, 1960, 1st pub in 1950.

Grihadaha. Tr. by Kundani Satyan. Mysore, Shri Surabhi Prakashan,

LITHUANIAN

Sudeginti Namai. Tr. by M. Subataviciene. Vilnius, Goslitizdat,

MARATHI

Grihadaha—Purvardha. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan. 1941.

RUSSIAN

Sozheny dom. Tr. by S. Tsyrin. Moscow, Goslitizdat, 1958.

SINDHI

Jwala. Tr. by Chuhermal Hinduja, Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1940.

—. Rev. by Beharilal Chhabria. Bombay, Sargam Sahitya, 1955.

TAMIL

Achala. Tr. by R. Sanmukhsundaram. Madras, Sakti Karyalayam, 1941.

Grihadaham, 2 ed. Tr. by A.K. Jayaraman. Mrdras, Navayug Pracharalayam, 1950, 1st pub. in 1940.

TELUGU

Gruhadahanam. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons, 1956.

Grihadahanamu. Tr. by Pilaka Ganapatisastri. Rajahmundry, Addeypalli & Co., 1947.

URDU

Khanuman Barbad. Tr. by Mail Malihabadi. Delhi, Royal Educational Book Depot, 1944.

Manzil. Tr. by Yazdani Jallandhari and Ramasaran Bharadvaj. Lahore, Punjab Literature Co.

বামুনের মেয়ে। কলকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, অক্টোবর ১৯২০ (আশ্বিন ১৩২৭)। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি।

GUJARATI

Bamanani Dikari. Tr. by Srikant Trivedi. Ahamedabad, Ravani Prakashan Griha, 1960.

Viprakanya 2 ed. Tr. by Natavarlal Jani. Ahmedabad, Navachetan Sahitya Mandir, 1955.

HINDI

Brahman ki Beti. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Upendranath Jha (Vyasa). Patna, Dwijendrakumar Jha,

KANNADA

Brahmanara Hudugi, 2 ed. Tr. by H. K. Vedavyasacharya. Mysore, D.V.K. Murti, 1959. 1st pub. in 1951.

Brahman Kanye. Tr. by Ramachandra Kottalagi. Dharwar, Samaj Pustakalay,

MALAYALAM

Brahmanaputri. Tr. by P. V. Rama Variyar. Calicut, P. K. Bros., 1958.

MARATHI

Brahmanachi Mulgi. Tr. by P. S. Desai. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1944.

SINDHI

Brahman Kanya. Tr. by Jethanand Lalwani. Hyderabad, Bharat Jiban Sahitya Mandal, 1947.

TAMIL

Chandiya. Tr. by Sanmukhasundaram. Coimbatore, Mercury Book Co.

Sandya. 3 ed. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Jyoti Nilayam, 1958.

TELUGU

Brahmanapilla. Tr. by Nilakantham. Vijayawada, Adarsagrantha Mandali, 1955.

URDU

Brahman ki Beti. Tr. by Mail Malihabadi. Lucknow, Nasin Book Depot,

দেনা-পাওনা। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৪ আগস্ট ১৯২৩ (২৯ শ্রাবণ ১৩৩০)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, আষাঢ়—আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র ১৩২৭ ; জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র ১৩২৮ ; বৈশাখ—শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, মাঘ ও চৈত্র ১৩২৯ এবং বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩০। নাট্যরূপ : ষোড়শী, ১৩ আগস্ট ১৯২৭ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৪)।

GUJARATI

Alaka. Tr. by Maneklal Joshi. Bombay, N.M. Thakkar & Co, 1940. 2 ed pub. by Gurjar Grantharatna Karyalaya, 1950.

Bhairavi. Tr. by Kishansimh Chavada. Bombay, R. R. Seth & Co, 1935.

HINDI

Len-den. Tr. by Dhanprakash Agarwal. Delhi, Prabhat Prakashan,

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

Dena-paona. Tr. by Rupnarayan Pandey. Bombay, Hindi Granthratnalay, 1960.

—. Tr. by Kamalaprasad Ray.

KANNADA

Sodasi. Tr. by Gurunatha Joshi. Dharwar, Pratibha Granthamale, 1945.

Bhairavi. Tr. by Meondi Mallari. Bangalore, N. Ananthamurti & Pandaveswar Subbarao, 1945.

MALAYALAM

Bhairavi. Tr. by Vasudevan Mussat. Trichur, V. Sudarayyar & Sons, 1952. 2 ed. pub. by Current Books (Trichur).

MARATHI

Bairavi, 2 ed. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1942.

SINDHI

Lenden. Tr. by Narayan Bharati. Bombay, Bharat Jivan Sahitya Mandal, 1952.

TAMIL

Bhairavi, 2 ed. Tr. by T. N. Kumarasvami. Madras, Kalaimagal Karyalayam, 1951. 1st pub. in 1940.

—. 2 ed. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Inba Nilayam,

Tunai (Sodasi). Tr. by Sauri [pseud.]. Madras, Mallikai Padippagam,

URDU

Aurat (Sodasi). Tr. by Premchand. Lahore, Sudesh Kumar.

নারীর মূল্য। কলকাতা, রায় এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৮ মার্চ ১৯২৪ * (চৈত্র ১৩৩০)। প্রথম প্রকাশ : যমুনা, বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২০ ('শ্রীমতী অনিলাদেবী'র ছদ্মনামে)।

*তারিখটি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত।

GUJARATI

Narir Mulya. (In *Sharad Granthavali*; V. 4. Tr. by Ramanlal Soni & ors. Bombay, Vora & Co., 1957.)

HINDI

Nari ka Mulya. Varanasi, Chaudhuri & Sons.

—. 2 ed. Tr. by Ramachandra Varmā. Bombay, Hemachandra Modi Pustakamala Trust, 1955.

KANNADA

Hennia Sthana Mana. Tr. by Siddhalinga Pattanestti. Dharwar, Samaj Pustakalay,

SINDHI

Istri jo Mulh. Tr. by Shyam Jaisinghani.

নব-বিধান। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, অক্টোবর ১৯২৪ (আশ্বিন ১৩৩১)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, মাঘ—ফাল্গুন ১৩৩০ এবং বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্তিক ১৩৩১।

GUJARATI

Navavidhan. Tr. by Kishansimh Chavada. Ahmedabad, Navyug Pustak Bhandar, 1931.

Savaki Ma. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

Vimata. Tr. by Kishansimh Chavada. Rajkot, Navyug Pustak Bhandar. Includes *Mejadidi* and *Arakshaniya.*

Sauki Ma. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashani,

Navabidhan. (In *Sharad Granthavali*, V. 3. Tr. by Ramanlal Soni & ors. Bombay, Vora & Co, 1957.)

HINDI

Naya Vidhan. Tr. by Mahendrakumar Varma. Allahabad, Gautam Pustakalay.

Navavidhan. Tr. by Rupanarayan Pandey. Allahabad, Sarad Granthavali, 1926.

KANNADA

Hosa Baduku. Tr. by Ramachandra Kottalagi. Dharwar, Samaj Book Depot,

Navabidhana. Tr. by Mahavalesvara. Hubli, Sahitya Bhandara, 1954.

MARATHI

Navavidhan. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1948.

SINDHI

Grahsit Ashram. Tr. by Dayo Sabhani. Karachi, Asha Sahit Mandal, 1943.

TAMIL

Usha. Tr. by A. K. Jayaraman and V. S. Venkatesan. Madras, Jyoti Nilayam, 1943.

হরিলক্ষ্মী। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৩ মার্চ ১৯২৬ (২৯ ফাল্গুন ১৩৩২)। তিনটি গল্পের সংকলন : ১. হরিলক্ষ্মী—মাসিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৩২ ; ২. মহেশ—বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩২৯ ; ৩. অভাগীর স্বর্গ—বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩২৯।

ENGLISH

The Drought and other stories. Tr. by Sasadhar Sinha. New Delhi, Sahitya Akademi, Includes *Andhare Alo*, *Abhagir Swarga*, *Bilasi*, *Chhabi*, *Mahesh* and *Ramer Sumati*.

GUJARATI

Abhagir Svarga. (In *Sharad Granthavali*, v. 5. Tr. by Ramanlal Soni and ors. Bombay, Vora & Co. 1957.)

HINDI

Abhagi ka Svarga. Tr. by Rajesh Dikshit. Delhi, Prabhat Prakashan, 1951. Collection of seven stories.

Harilakshmi. 4 ed. Tr. by Nihalchandra Varma. Varanasi, Hindi Pracharak Pustakalay,

KANNADA

Abhaginiya Svargarohana. Tr. by Mevundi Mallari. Dharwar, Samaj Book Depot, 1951.

Abhaginiya Svargarohana. (Abhagir Svarga). Tr. by H. V. Narayan Rao.

Rajalakshmi (Harilakshmi). Tr. by Gurunath Joshi. Dharwar Pratibha Granthamale, 1950.

Mahesha. Tr. by Gurunath Joshi. Dharwar, Samaj Book Depot.

MALAYALAM

Harilakshmi. Tr. by Karur Narayanam. Kottayam, N. B. S., 1955.

MARATHI

Harilakshmi. Abhagicha Svarga, Mahesh ; 2 ed. Tr. by B.V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakshan, 1953,

NORWEGIAN

Tφrke (Mahesh). Oslo. Indiske Noveller, Det Norske Samlaget,

RUSSIAN

Zasuha (Mahesh). Tr. by N. Guseva. (In the periodical *Zvezda Vostoka*, Tashkent, 1951).

—. Tr. by P. Ohrimenko. (In *Indiyskiye rasskazy Skazki*, Moscow, Voyenizdat, 1954.)

Mahes. Tr. by I. Tovstyh. (In *Rasskazy Indiyskih Pisatelei.* Moscow, Goslitizdat, 1959,)

TAMIL

Harilakshmi, Tr. by K. P. Rajagopalan. (In *Anuradha—Harilakshmi*). Madras, Jyoti Nilayam.

TELUGU

Harilakshmi. Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa. Granthamandali, 1955.

UKRAINIAN

Abhagir Svarga. Tr. by L. Strizhevskaya & ors. (In *Vsesvit*, Sept.)

URDU

Haridasi. Tr. by Sayyid Nurul Huda ; ed. by Begum Siddiq Ansari. Calcutta, Abdul Ahad Osmani, 1931,

পথের দাবী। কলকাতা, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩১ আগষ্ট ১৯২৬ (১৪ ভাদ্র ১৩৩৩। প্রকাশকের মতে ১৭ই ভাদ্র)। প্রথম প্রকাশ বঙ্গবাণী ; ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৯ ; বৈশাখ, আষাঢ় —ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩০ ; জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন—কার্তিক, পৌষ—মাঘ ১৩৩১ ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক ও ফাল্গুন ১৩৩২ এবং বৈশাখ ১৩৩৩। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর ৪ জানুয়ারী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে Preaching of sedition এর অজুহাতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা (Under Section 124A of the Indian Penal Code,) জারী হয়। ১৯৩৯-র মার্চ মাসে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় (Gazette notification of

the Govt. of Bengal, dt. March 1, 1939.)।
রাজরোষ মুক্তির পর বইটীর প্রথম নাট্যাভিনয় স্বরু হয় ১৩ মে ১৯৩৯। কিন্তু বিদ্রোহের সহায়তা করছে, এই অজুহাতে লীগ মন্ত্রীসভা Dramatic Performance Act আরোপিত করেন ৯ মে ১৯৪০। স্বাধীনতা লাভের পর 'রঙমহলে' প্রথম 'পথের দাবী' মঞ্চস্থ হয়।

ENGLISH

Father Dabi. Dramatised by Ramen Bhattacharya. (In *Saratchândra Chatterjee Centenary number*; pub. by Saratchandra Chatterjee Centenary Program Committee, Sept, New York.)

GUJARATI

Apurva-Bharati, 2 ed. Tr. by Bachubhai Shukla. Bombay, R. R. Seth & Co., 1953, 2v.

Pather Dabi, 2 ed. Tr. by Dayashankar Kavi. Bombay, N. M. Thakkar & Co., 1946. 2v.

—. Tr. by Ramanlal Pitambardas Shoni. 1946.

—. (In *Sharad Granthavali*, v.3. Tr. by Ramanlal Shoni & ors. Bombay, Vora & Co., 1957.)

HINDI

Path Ke Davedar. Baila, Rajendrakumar and Bros., 1957.

—. Delhi, Archana Prakashan.

—. Varanasi, Hindi Pracharak Pustakalay.

—. Tr. by Dhnayakumar Jain. Bombay, Hindi Granthratnakar Karyalay.

—. Tr. by Manmathanath Gupta. Allahabad, Kitab Mahal, 1958

—. Tr. by Yajnadatta Sharma. Varanasi, Rajendrakumar & Bros., 1952.

KANNADA

Adhikara. Tr. by H. K. Vedavyasacharya. Mysore. Murti Agencies, 1947.

Bharati, abridged ed. Tr. by S. B. Pattansetbi. Dharwar, Samaj Pustakalay,

MARATHI

Bharati, 2 ed. Tr. by P. B. Kulkarni. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1946.

Savyasachi. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1948.

ORIYA

Chalapathar' Dabi. Tr. by Madanmohan Misra. Cuttack, Grantha Mandira,
Pathar Dabi. Tr. by Kalindicharan Panigrahi. Calculta, Shilpi Samstha,

SINDHI

Azadi ka Upasak. Tr. by Chuhermal Hinduja. Karachi, Ratan Sahitya Mandal, 1940.

Rahgir. Tr. by Notan Gopalani. Bombay, Bharat Jivan Sahitya Mandal, 1952,

TAMIL

Bharati. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Pazaniyappa,

—. Tr. by T. N. Kumarasvami. Madras, Kalaimagal Karyálayam, 1951.

TELUGU

Bharati. Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli. Viravenkayya & Sons, 1956. 2 ed. pub in 1667.

শেষপ্রশ্ন। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ২ মে ১৯৩১ (১৯ বৈশাখ ১৩৩৮)। প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র ১৩৩৪ ; জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ও ফাল্গুন ১৩৩৫, বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৬ ; চৈত্র ১৩৩৭ এবং বৈশাখ, ১৩৩৮। কিন্তু পত্রিকায়

প্রকাশিত উপন্যাসের সাথে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছে।

GUJARATI

Navina Athava Sheshprashna. Tr. by Ramanlal Soni. Modasa, Translator, 1948.

Seshprashna. Tr. by Ramanlal Gandhi. Surat, Harihar Pustakalay, 1956.

— . (In Sharad Granthavali, V.I. Tr. by Ramanlal Soni & ors. Bombay, Vora and Co., 1957.

—. Tr. by Madhavrao B. Karnik, 1938.

HINDI

Sheshprashna. Balia, Rajendrakumar & Bros., 1957.

—. Delhi, Prabhat Prakashan.

—. Lucknow, Hindi Pracharak Mandal.

—. Tr. by Dhanyakumar Jain Delhi, Hind Pocket Books,

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books.

—. 2 ed. Tr. by Yajnadatta Sharma. Varanasi, Rajendra kumar & Bros., 1952.

—. Tr. by Ramchandra Varma.

—. Tr. by Rupanarayan Pandey. 1956.

KANNADA

Sesaprasna. Tr. by H.K. Vedavyasacharya. Mysore, Murti Agencies, 1948. 2nd ed. pub. in 1960.

Seshaprashne, abridgeded. Tr. by S. B. Pattansetti. Dharwar, Samaj Pustakalay,

MALAYALAM

Tattiddharikkappettaval. Tr. by P.M. Kumaran Nayar. Calicut, P.K. Bros.

MARATHI

Seshprashna. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1949.

NEPALI

Seshprashna. Tr. by Riddhi Bahadur Malla. Kathmandu.

ORIYA

Seshaprasna. Tr. by Madanmohan Misra. Cuttack, Das Bros.

SINDHI

Suawal. Tr. by Beharilal Chhabria. Karachi, Zindagi Pub., 1946.

TAMIL

Kamala. Tr. by T. N. Senapati. Madras, Alliance, 1953.

TELUGU

Seshaprasna. Tr. by Nannapanneni Subbarao. Vijayawada. Adarsa Granthamandali, 1954.

—. Tr. by Bondalpati Sivaramkrishna. Vijayawada, Deshikavit Mandali, 1952.

—. Tr. by A. V. S. Ramarao.

URDU

Saval. Tr. by Mani Ramji Divana. Lahore, Narayandatta. Sahgal, 1944.

স্বদেশ ও সাহিত্য। ময়মনসিংহ, আর্য পাবলিশিং কোং, আগস্ট ১৯৩২ (ভাদ্র ১৩৩৯)। প্রথম প্রকাশ : ১. আমার কথা—প্রবর্তক, শ্রাবণ ১৩২৯ ; ২. স্বরাজ সাধনায় নারী—নব্যভারত, পৌষ ১৩২৮ ; ৩. শিক্ষার বিরোধ—নারায়ণ, অগ্রহায়ণ—পৌষ ১৩২৮ ; ৪. স্মৃতিকথা—মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩২ ; ৫. অভিনন্দন—১৯২৮-র জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

কারামুক্তির পর তাঁর উদ্দেশ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে পঠিত অভিনন্দন। ৬. ভবিষ্যৎ বঙ্গ সাহিত্য —১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ; ৭. গুরু-শিষ্য সংবাদ—যমুনা, ফাল্গুন ১৩২০; ৮. সাহিত্য ও নীতি—বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩৩১; ৯. সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি—মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩১; ১০. ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩১; ১১. আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ—বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩০; ১২. সাহিত্যের রীতি ও নীতি—বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩৪; ১৩. অভিভাষণ—কালিকলম, আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪. অভিভাষণ—বাতায়ন, ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮; ১৫. শেষপ্রশ্ন (লিখিত পত্র)—বিজলী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা; ১৬. রবীন্দ্রনাথ—জয়ন্তী উৎসর্গ, পৌষ ১৩৩৮ (রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে পঠিত)।

GUJARATI

Sarad-Vani. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, N. M. Thakkar and Co., 1942.

HINDI

Svadesh aura Sahitya. Tr. by Mahadeva Saha. Varanasi, Hindi Pracharak Pustakalay, 1954.

TELUGU

Saratvyasalu. Tr. by Lavanya. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1954. V. I. includes: 1. *Rabindranath*, 2. *Swaraj Sandhaney Nari*, 3. *Sahitye Art O Durniti*...*etc*.

অনুরাধা, সতী ও পরেশ। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৮ মার্চ ১৯৩৪ (৪ চৈত্র ১৩৪০)। প্রথম প্রকাশ: ১. অনুরাধা—ভারতবর্ষ, চৈত্র

১৩৪০ ; ২. সতী—বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩৪ ; ৩. পরেশ—'শরতের ফুল' (শারদীয়া পূজা বার্ষিকী)-ভাদ্র ১৩৩২ ।

GUJARATI

Anuradha. Tr. by Dayashankar Kavi. Bombay, N. M. Thakkar & Co., 1946.

—. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, R.R. Sheth & Co., 1933.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

HINDI

Anuradha. Tr. by G. S. Varma. Lucknow, Navayug Pustak Bhandar.

—. Tr. by Nihal Chandra Varma.

Sati. Tr. by Rajesh Dikshit. Delhi, Prabhat Prakashan,

KANNADA

Anuradha. Tr. by H. K. Vedavyasacharya.

—. Tr. by Gurunath Joshi and M. A. Kuppama. 1944.

—. Tr. by S. A. Burli.

Paresha. Tr. by H. K. Vedavyasacharya. Mysore, Murti Agencies, 1949.

Mahasati. Tr. by Mevundi Mallari. Dharwar, Samaj Book Depot.

MALAYALAM

Anuradha. Tr. by Karur Narayanan. Kottayam, N. B. S., 1956.

—. Tr. by R. Narayana Panikkar. Trivandrum, Sridhar Printers, 1946.

MARATHI

Anuradha Sati Paresh. Tr. by Bhargavram Viththal Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1947.

TAMIL

***Anuradha-Harilakshmi*. Tr. by K. P. Rajagopalan. Madras, Jyoti Nilayam.**

Anuradha. **(In *Hema*. Tr. by R. Sanmukhasundaram. Madras, Mallika Pub., 1959.)**

TELUGU

Anuradha. **Tr. by Gadde Lingayya. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1954.**

—. **Tr. by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons, 1956.**

—. **Tr. by Bondalapati Sivaramakrishna. 1952.**

বিপ্রদাস। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ (১৮ মাঘ ১৩৪১)। প্রথম প্রকাশ : বেণু, ১৩৩৬-১৩৩৮ এবং বিচিত্রা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৯ ; বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন—ফাল্গুন ১৩৪০ ও বৈশাখ, শ্রাবণ—ভাদ্র, কার্তিক-মাঘ ১৩৪১। লেখক জীবিত থাকাকালীন প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস।

GUJARATI

Vipradas. Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, N. M. Thakkar & Co.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan Griha,

—. (In *Sharad Granthavali*, V. I. Tr. by R. Soni, N. Parekh & B. Gandhi. Bombay, Vora & Co., 1957.)

HINDI

Vipradas. Balia, Rajendrakumar & Bros., 1953.

—. Delhi, Prabhat Prakashan.

—. Tr. by Mahadev Saha. Delhi, Sanmarga Prakashan.

—. Tr. by Dhanprakash Agarwal. Allahabad, Hindi Sahitya Bhandar.

—. Tr. by Dhanyakumar Jain. Bombay, Hindi Granthratnakar Karyalaya.

—. Tr. by Kamalaprasad Sharma. Varanasi, 1946.

—. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

KANNADA

Vipradas. Tr. by M. K. Bharatiramancarya. Mysore, Sahitya Mandir, 1947. 2ed. pub. in 1952.

—. Tr. by P. M. Rudraswami. Dharwar, Samaj Pustakalay,

MALAYALAM

Premaparinamam athava Vipradas . Tr. by M.K. Nampyar. Calicut, P. K. Bros., 1955.

MARATHI

Vipradas. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Navabharat Prakashan Samstha, 1944.

SINDHI

Vipradas. Tr. by Chander Khubchandani. Karachi, Zindagi Pub., 1947.

TAMIL

Vipradas. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Pari Nilayam, 1955.

TELUGU

Vipradasu. Tr. by Puranam Kumararaghava Shastri. Vijayawada, Uma Publishers, 1956,

শুভদা। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ৫ জুন ১৯৩৮ (২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫)। রচনাকাল: ২০ জুন থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ৫ মাস পরে।

GUJARATI

Shubhada. Tr. by Ramanlal Soni. Baroda, Translator, 1939.

—. Tr. by Srikant Trivedi. Ahmedabad, Ravani Prakashan, 1958.

—. (Pt. I & II.) Tr. by Shantilal Shah. 1938.

—. (In *Sharad Granthavali*, v. 4. Tr. by R. Soni & ors. Bombay, Vora & Co., 1957.)

HINDI

Shubhada. Allahabad, Indian Press.

—. Delhi, Hind Pocket Books.

—. Lucknow, Hindi Pracharak Mandal.

—. New Delhi, Sanmarga Prakashan.

—. Varanasi, Gandhi Granthagar, 1953.

—. Tr. by Dhanprakash Agarwal. Allahabad, Yogendra Pustakalay.

—. Tr. by Sumangal Prakash. Calcutta, Pustak-Mandir, 1940.

KANNADA

Shubhada. Tr. by Ahobala Sankara. Mysore, Kavyalaya,

MARATHI

Shubhada. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan, 1947.

SINDHI

Subhada. Tr. by Devdat Sharma. Ajmer, Bharat Jivan Sahitya Mandal, 1949.

TAMIL

Malati. Tr. by A. K. Jayaraman. Madras, Star Pub., 1958.

TELUGU

Subhada. Tr, by Nilkantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons, 1956

—. **Tr. by Ravi. Vijayawada, Adarsa Granthamandali, 1956.**

—. **Tr. by C. S. Shastri.**

শেষের পরিচয়। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ৭ জুন ১৯৩৯ (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) । প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩৯ ; বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ; আষাঢ়-শ্রাবণ কার্তিক ও ফাল্গুন ১৩৪১ এবং বৈশাখ ১৩৪২। শরৎচন্দ্র উপন্যাসটির ১৫শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখেন এবং পরে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী তা সমাপ্ত করেন।

GUJARATI

Navi Vahu. Tr. by Bachubhai Shukla. Bombay, R. R. Sheth & Co., 1940.

Remuni Ma. Tr. by Dayashankar Kavi. Surat, Harihar Pustakalay,

Shesh Parichay. (In *Sharad Granthavali*, v. 5. Tr. by R. Soni & ors. Bombay, Vora & Co., 1957.)

HINDI

Antim Parichaya. Tr. by Ramanath 'Suman'. Delhi, Hind Pocket Books,

Savita. Balia, Rajendrakumar Bros., 1953.

—. Tr. by Dhanyaprakash Agarwal. Allahabad, Adarsh Hindi Pustakalay.

Savita athava Shesh ka Parichaya. Delhi, Bharati Bhasha Prakashan.

Shesh ka Parichaya. Tr. by Kamalaprasad R. Sharma. Varanasi, Adhunik Pustakmandir, 1946.

—. **Varanasi, Subhas Pustakmandir.**

—. **Tr. by Rupanarayan Pandey. Bombay, Hindi Granthratnakar Karyalay, 1956.**

MARATHI

Akherchi Olakh. Tr. by B. V. Varerkar. Bombay, Abhinav Prakashan Samstha, 1949.

SINDHI

Suweeta. Tr. by Lachhman Sathi. Bombay, Bharat Jivan Sahitya Mandal, 1955.

TELUGU

Savita. Tr. by Ahalya Ramakrishna (pseud.). Tenali, Brindavan Publishing House,

—. Tr. by Nilakantham. Rajahmundry, Kondapalli Viravenkayya & Sons, 1956.

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত রচনা-সংগ্রহ, প্রবন্ধ-সংগ্রহ, ইত্যাদির (যেগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট বাংলা মূল গ্রন্থের অনুবাদ নয়) নির্বাচিত একটি তালিকা ভাষানুযায়ী নীচে দেওয়া হলো :

ENGLISH

The Eldest Sister and other stories. Tr. by V. Naravane. 1950.

The Drought and other stories. Tr. by Sasadhar Sinha. New Delhi, Sahitya Akademi,

GUJARATI

Sharad Granthavali. Tr. by Ramanlal Soni, Nagindas Parekh and Bhogilal Gandhi. Bombay, Vora & Co., 1957. 5 v.

Sharad Sahityanu Goras. Edited and Tr. by Ramanlal Soni. Bombay, N. M. Thakkar & Co, 1960. (Only quotations).

HINDI

Aprakashita Tin Upanyas. Varanasi, Chaudhuri & Sons, 1956,

Sarat Sahitya. Tr. by Dhanyakumar Jain, Hemchandra Modi and Ramachandra Varma. Bombay,

Hindi Grantha Ratnakar Karyalay, 1936–1940. 17 vols.

Sarat Ki Sarvashrestha Kahaniyan. Tr. by Savita Bandyopadhyay. Delhi, Subodh Prakashan, 1957.

Samaj Dharma Rajaniti. Varanasi, Chaudhuri & Sons, 1956. (Essays).

Bhugol Ke Bhautik Adhar. Tr. by Dipanarayan Singh and Ramachandralal Asthana. Allahabad, Ramanarayanlal, 1955,

MARATHI

Prapancha Katha. Tr. by Shankar Balaji Shastri. Bombay, Bharat Gaurav Granthamala, 1927. 2v.(6 stories).

NEPALI

Sarad Granthavali Namma Sankalit. Tr. by Khargman Malla. Kathmandu, Nepali Bhasha Prakashani Samiti, 1947.

RUSSIAN

Sozheny dom. Povesti Y ramany. Tr. by S. Tsyrin and B. Karpushkin. Preface by E. Komarov. Moscow, Goslitizdat, (Trans. of *Grihadaha*, *Arakshaniya*, *Charitrahin* and *Palli Samaj*.)

TELUGU

Mundutaralu. Tr. by K. Ramesh. Rajahmundry, Addepalli & Co., 1960. (Stories)

Saratvyasalu. Tr. by Lavanya, (*pseud.*) Vijayawada, Adarsa Grantha Mandali, 1954. (Essays).

Sarat Sahityam. Tr. by Bondalapati Sivaramakrishna and others. Vijayawada, Desi Prachuranalu, 1953. 14 vols.

* এই নির্বাচিত তালিকাটি প্রণয়নে বেশ কিছু গ্রন্থ এবং গ্রন্থপঞ্জির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। স্থানাভাবে সেই সব গ্রন্থের তালিকা উল্লেখ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।